লোকসমাজ ও পশুকথা

দিব্যজ্যোতি মজুমদার

লোকলৌকিক প্রকাশনী
কলকাতা ৭০০০৪৭

প্রকাশক :
সুব্রত চক্রবর্তী
লোকলৌকিক প্রকাশনী
আই/২৪এ বাঘাযতীন
কলকাতা-৭০০ ০৪৭

মুদ্রাকর :
ইটারনিটি প্রিন্টার্স
৮ ডঃ আশুতোষ শাস্ত্রী রোড
কলকাতা-৭০০ ০১০

প্রচ্ছদপট :
গৌতম বসু

ক্ষেত-খামারে মাঠ-ময়দানে
বুলবুলিকে তাড়ায় যারা

সূচিপত্র

প্রস্তাবনা

১৯২২ সালে ছাত্রাবস্থায় বিহারের বেনিয়াডি-তে বেড়াতে গিয়েছিলাম। গিরিডি থেকে মাইল তিনেক দূরে বেনিয়াডি। কয়লাখনি এলাকা, খুব পুরনো কোক-ওভেন রয়েছে। বেনিয়াডি থেকে বরাকর নদী পর্যন্ত যে-সব গ্রাম রয়েছে, সেখানকার গ্রামবাসীরাই মূলত খাদে এবং ওভেনে শ্রমিকের কাজ করেন। গ্রামবাসীদের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। সেখানে একজন বৃদ্ধ গ্রামবাসীর মুখে অনেক লোককথা শুনেছি। তাঁর নাম শ্রীদশরথ মাঝি। তাঁর বাবা পশ্চিমবঙ্গের ঝাড়গ্রাম এলাকা থেকে খাদের শ্রমিক হয়ে এখানে আসেন। দশরথও কিশোর বয়স থেকে খাদে কাজ করে ভগ্নস্বাস্থ্যে অবসর নিয়েছেন। তাঁর মেয়ে তুলসী কোক ওভেনে কামিনের কাজ করেন। ওখানেই তাঁদের স্থায়ী বাসস্থান গড়ে উঠেছে। দশরথ মাতৃভাষা সাঁওতালী ছাড়াও ভাঙা বাংলা ও স্থানীয় হিন্দী ভাষায় কথা বলতে পারেন।

সেই সময় একদিন তাঁদের নিজস্ব লোককথা শোনাতে বললে তিনি আমাকে 'কুকুর ও শেয়াল'-এর গল্পটি শোনান। গল্প বলবার সময় তাঁর চোখ ও মুখের যে পরিবর্তন লক্ষ্য করি তা ভুলবার নয়। কুকুরের ক্ষুধা ও অপমান যেন তিনি তাঁর হৃদয়ের সমস্ত বেদনা ও ক্ষোভ দিয়ে প্রকাশ করছেন। খুব বিস্মিত হয়েছিলাম সেদিন। নিছক একটি পশুকথার মধ্যে একজন ব্যক্তি নিজেকে কিভাবে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ফেলতে পারেন, তা না দেখলে, না শুনলে উপলব্ধি করা যাবে না।

তারপরে বহুবার বেনিয়াডিতে গিয়েছি, কোক ওভেনে কর্মরত এক আত্মীয়ের সহৃদয়তার সুবাদে। বহু লোককথা-লোকসঙ্গীত শুনেছি বৃদ্ধ সাঁওতালের কাছে। সামাজিক অবিচার-বেদনা-অত্যাচার যেসব গল্পে রয়েছে, তা বলবার সময় একই রকম অভিব্যক্তি তাঁর মধ্যে বারবার লক্ষ্য করেছি। মনে হয়েছে, এই গল্পগুলি শুধুমাত্র আনন্দের প্রকাশ নয়, এর মধ্যে লোকসমাজের বেদনাময় সংগ্রামশীল রূঢ় বাস্তবের ঐতিহাসিক রূপটি লুকোনো রয়েছে। দারিদ্র্য বঞ্চনা উৎপীড়ন ও জীবনযুদ্ধের জ্বালা লোকসমাজের সর্বক্ষণের সঙ্গী। এগুলো তারই বহিঃপ্রকাশ, রূপকের আড়ালে জীবনের কথা। বিভিন্ন গ্রাম এলাকায় লোকসমাজের মধ্যে লোকসংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ ও সমীক্ষার সময়ে এই একই অভিব্যক্তি লক্ষ্য করেছি বারবার। এ অভিজ্ঞতা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়।

এই গ্রন্থের সূচনা হয় শ্রীমাঝির মুখে-শোনা 'কুকুর ও শেয়াল' গল্পটি থেকে। তারপর দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে পৃথিবীর নানান দেশের ভিন্ন ভিন্ন লোকসমাজের পাঁচশো লোককথা সংগ্রহ করে ব্যাখ্যা করি। এই ধরনের ব্যাখ্যা কতদূর বিজ্ঞানসম্মত তা যাচাই করবার জন্য কয়েকজন বিশিষ্ট লোক-সংস্কৃতিবিদের কাছে সেগুলো মতামতের জন্য রাখি। দু-একজন ছাড়া প্রত্যেকেই এ ধরনের ব্যাখ্যাকে স্বীকার করতে দ্বিধা প্রকাশ করেছেন। লোককথাকে বিশ্লেষণ করবার নানা পদ্ধতি রয়েছে, সেগুলো দীর্ঘদিনের আয়াসলব্ধ বৈজ্ঞানিক গবেষণা। সেসব বিশ্লেষণ অনন্য। কিন্তু এই ধরনের বিশ্লেষণ বড় একটা চোখে পড়ে নি বলে সংকোচে ও সমালোচকদের নিস্পৃহ মনোভাবে আমিও দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ি। প্রকাশের উৎসাহেও ভাটা পড়ে।

লোককথাগুলির বিশ্লেষণের ব্যাপারে দুই বন্ধু তপন চক্রবর্তী ও স্বজন সেনের সঙ্গে অনেক আলাপ-আলোচনা হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। তারাই প্রকাশের জন্য উৎসাহ দিতে থাকেন। তপন চক্রবর্তী বহু গল্পের ব্যাখ্যায় গরমিল দেখিয়ে শুধরে দেন। শেষ পর্যন্ত শুধুমাত্র ২২টি পশুকথা ও তার অভিপ্রায় নিয়ে গ্রন্থটি প্রকাশের সব দায়িত্ব নেন তপন। এই দুজন বন্ধুকে কোনো ভাষাতেই এবং কোনোভাবেই কৃতজ্ঞতা জানানো সম্ভব নয়। শুধু বলতে পারি, তারা আমার বন্ধু। গ্রন্থটি প্রাথমিক অবস্থায় 'লোক লৌকিক' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ রয়েছি।

গ্রন্থটিতে মুদ্রণ-সম্পর্কিত কিছু বিভ্রাট ঘটবার জন্য লজ্জিত। মুদ্রণ-শিল্পে ধর্মঘট, বিদ্যুৎ-সংকট থেকে শুরু করে অনেক প্রতিকূলতাই ঘটেছে. তবু অপরাধ এড়িয়ে যেতে পারি না। 'শূয়োর' বানানটি নানাস্থানে অসহযোগিতা করেছে। 'পুয়েবলো ইণ্ডিয়ান' এক জায়গায় 'পাবলো ভারতীয়' ছাপা হয়েছে। ইউরোপ মহাদেশের নরওয়ে দেশের পশুকথাটির নাম পড়তে হবে 'খরগোশের বৌ'।

সামাজিক ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে পশুকথাগুলিকে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছি। এ বিষয়ে পূর্বসূরীদের কাছ থেকে চিন্তাগতভাবে তেমন কোনো সহায়তা পাইনি। সীমাবদ্ধ ক্ষমতায় অভিপ্রায় বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছি মাত্র। পাঠকবর্গ বিচার করবেন এ ধরনের অভিপ্রায় বিশ্লেষণ কতটা যুক্তিগ্রাহ্য এবং ইতিহাস ও বিজ্ঞানসম্মত। তাঁদের বিচারই সর্বোৎকৃষ্ট এবং গ্রহণীয়। তাঁদের মতামতের মূল্য আমার কাছে সবচেয়ে বেশি।

১. ১. ১৯৫৮

১৭/২৮, কে. পি. রায় লেন — দিব্যজ্যোতি মজুমদার

কলকাতা-৭০০ ০৩১

উৎস

আজ আমরা সভ্যতার এমন একটি স্তরে এসে উপস্থিত হয়েছি যেখান থেকে আমাদের পুরনো চেহারাটা স্বীকার করতে অনেকেই লজ্জা পাবেন। কিন্তু বিজ্ঞান-ভিত্তিক দৃষ্টি নিয়ে তাকালে সেই বিবর্তনের জীবনকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। তবু আজকের এই পরিবেশে বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা করলে বড় বিস্ময় লাগে। গাছের অনিশ্চিত বাসা ছেড়ে সমতলের অনেকাংশে নিশ্চিত বাসায় যেদিন আদিম মানুষ এসে দাঁড়াল, সেই যুগ থেকে ক্রমবিকাশের সিঁড়িগুলোর ধাপ খুব মসৃণ ও সহজ ছিল না। যুগ যুগ ধরে কেটেছে মানুষের বন্য দশা, হাজার হাজার বছর ধরে কেটেছে মানুষের বর্বর দশা, তারপরে অনেককাল কেটে গেল—এল সভ্য দশা। অর্থাৎ সমাজ কোনোদিন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল না, খুব সামান্যভাবে হলেও তার পরিবর্তন ঘটেছে। মানুষের ইতিহাসের গোড়ার দিকে আলাদা সুস্পষ্ট জনগোষ্ঠী রাষ্ট্র বা এইধরনের কোনো কিছুর বিশেষ অস্তিত্ব ছিল না, থাকা সম্ভবও নয় স্বাভাবিক কারণেই। মানুষ ছোট ছোট দলে বাস করত। এক সময়ের সমাজ ভেঙেছে প্রয়োজন ও পরিবেশের তাগিদে, নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। আদিম মানুষের মধ্যে যে ধরনের সমাজই পৃথিবীর আনাচে-কানাচে থাকুক না কেন, তুলনামূলকভাবে তাদের সমাজে অসম-বিকাশ ঘটলেও, যেহেতু উন্নত মস্তিক ও দক্ষ দশটি আঙুলের তারা অধিকারী ছিল, তাই তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কতকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল। চিন্তার জগতে যে বিকাশ ঘটেছিল, সেই বিকাশের ধারাই এই সমতা এনেছিল। আজও পৃথিবীর নানা অংশে বন-পাহাড়-দ্বীপের আদিবাসী

মানুষদের সংস্কৃতি ও জীবনচর্যা খুঁটিয়ে দেখলে সেই সিদ্ধান্তেই আসতে হয়। প্রাচীন-কালের সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয়ও পাওয়া যাবে আশেপাশের এইসব আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবন অনুধাবন করলে।[১]

উদ্ভিদ্ অর্থাৎ প্রকৃতি থেকে মানুষের জন্ম, প্রতিকূল প্রকৃতির মধ্যেই মানব-সমাজের বিকাশ। মানুষ দূর আকাশ থেকে খসে-পড়া কোনো বিচ্ছিন্ন সৃষ্টি নয়, স্বর্গের কোনো অভিশপ্ত জীব নয়, কারও সৃষ্টির আনন্দের অভিব্যক্তিতে তার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয় নি—একমাত্র প্রকৃতির সঙ্গেই তার ঘনিষ্ঠ ও আত্মিক সম্পর্ক। আদিম মানুষ উপকারী ও বীভৎস প্রকৃতির বুকে চোখ মেলেছে। আর তাই চারপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশ বনে-সেরা মানুষের জীবন ও ভাবনাকে সর্বাংশে প্রভাবিত করেছে। উন্নত জটিল মস্তিষ্ক হাত ভাষার অধিকারী সামাজিক যৌথ মানুষ অল্পে অল্পে প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করলেও প্রথমদিকে দুর্জয় প্রকৃতির হাতে তারা ছিল বড় অসহায়, প্রকৃতির উপর বড়ই নির্ভরশীল। তাদের চিন্তা ছিল সীমাবদ্ধ, দৃষ্টি আবৃত, সুতরাং পারিপার্শ্বিক বস্তুর গণ্ডি অতিক্রম করে বৃহৎ কিছুর কল্পনা করা সহজ ছিল না। সীমাহীন ভয় ও বিপুল বিস্ময় নিয়ে সে চারপাশের ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করেছে এবং তার উৎপত্তির কারণ জানতে না পেরে বিহ্বল ও হতবাক হয়েছে। বন্যা তাদের স্থানচ্যুত করেছে, দাবানল তাদের বিধ্বস্ত করেছে, অসহনীয় শীত তাদের কম্পিত করেছে, মধ্যদিনের সূর্য তাপিত করেছে, ঝড়-ঝঞ্ঝা তাদের উন্মূলিত করেছে, শিকারের সময় পাহাড় থেকে হঠাৎ-গড়ানো পাথর তাদের আহত করেছে। তারা তাদের সীমিত বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা নিয়ে এইসব উপদ্রবের কথা অনেক ভেবেছে, কিন্তু কোনো সমাধানে আসতে পারে নি। কারণ আদিম মানুষ অচেতন প্রাণহীন পৃথিবীর কল্পনা করতে পারে নি, ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সূত্র আবিষ্কার করতে পারে নি—আর বিকাশের সেই প্রাথমিক স্তরে সেই উন্নত চিন্তা আশা করা যায় না। তাই সকল প্রতিকূলতা ও প্রচণ্ড বিরূপতার পিছনে উপলব্ধি করেছে বিভিন্ন অদৃশ্য পরাক্রমশালী শক্তির। এইসব শক্তি কিন্তু নিরাকার নয়, নানা আকারবিশিষ্ট। বিমূর্ত চৈতন্য কোনো কালে কোনো মানুষ চিন্তা করতে পারে না, বস্তুকে কেন্দ্র করেই মানুষের চৈতন্য জন্মলাভ করে। তাই বস্তুকে কেন্দ্র করেই তাদেরও চিন্তাভাবনা গড়ে উঠেছিল। অসংখ্য দেবতা, পক্ষিরাজ ঘোড়া কিংবা সোনার হরিণও বস্তুচিন্তার ঊর্ধ্বে নয়। দেবতাদের অবয়ব হয় মানুষ কিংবা পশুর রূপ পেয়েছে, পাখির ডানা ও বাস্তবের ঘোড়া মিলে হয়েছে পক্ষিরাজ, সোনার বর্ণ এবং হরিণের অবয়ব মিলে সোনার হরিণ। বাস্তবের সংস্রবমুক্ত কোনো কল্পনা হতে পারে না, শুধুমাত্র বিচ্ছিন্ন চৈতন্য অসম্ভব। আদিম মানবের অকর্ষিত গণ্ডিবদ্ধ মন সূত্র

ধরে ভেবেছে যে অদেখা শক্তি নিশ্চয়ই সক্রিয় হয়ে উঠেছে, আর তার প্রকোপেই এই অঘটন। নিশ্চয়ই সমাজের কোনো গর্হিত কাজের দরুন এই ঝড়-বন্যা-পাহাড়-আকাশ-বনের দেবতা ক্ষুব্ধ হয়েছে। এইসব হঠাৎ-আসা উপদ্রব থামাবার জন্য আকুল আবেদন জানিয়েছে তারা। কিন্তু এও বুঝেছে কোনো বস্তু ভেট না দিলে খালি পেটে সেই শক্তি কেন তাদের উপকার করবে? সন্তুষ্ট করার পথ তো কোনো বস্তু উপহার দেওয়া। তাই মানুষ ও পশুর রক্ত ঝরিয়ে ভিক্ষা চেয়েছে অসন্তুষ্ট শক্তির কাছে। এই ভীতি ও সরল বিশ্বাস থেকেই, পর্যুদস্ত জীবন থেকে বাঁচার আকাঙ্খা থেকেই প্রাথমিকভাবে সহজ ধর্ম এবং ঈশ্বরের জন্ম দিয়েছে মানুষ।[২]

আদিমকালের এইসব দেবতা কখনও পশুর রূপে, কখনও-বা বৃক্ষ ও পাহাড়ের রূপে পূজিত হয়েছে। দুর্যোগের প্রতিনিধি হিসাবে আদিম মানুষ দাঁড় করিয়েছে কোনো গাছ, কোনো শক্তিশালী শিকারী পশু কিংবা কোনো দুরতিক্রম্য পাহাড়কে। এই তো স্বাভাবিক, কেননা বনে-ঘেরা সাহসী সরল অল্পবুদ্ধি মানুষেরা বন-জঙ্গল-পশু-পাখি-গিরিগুহাকে ঘিরেই ঘর বেঁধেছে, নিত্যকর্ম তাদের নিয়েই। প্রয়োজনের তাগিদে সমাজে এইসব চেনা-জানা চিন্তা-ভাবনা-কর্মপদ্ধতি এসেছে—তাই এই বাস্তব সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাসই মানুষের সঠিক ইতিহাস। এবং দ্বিধাহীনভাবে বলা যায় গোষ্ঠীভুক্ত সমাজের সাহিত্য-শিল্পও এই সংহত সমাজ ও সংস্কৃতির নিগড়ে বাঁধা। উভয়ের আলোচনা তাই একই সঙ্গে করতে হবে।

লোকসাহিত্য এক বিশাল ও গভীর খনিবিশেষ। তার নানা বিভাগে রয়েছে ছড়া গান গীতিকা ধাঁধা প্রবাদ রূপকথা ব্রতকথা নীতিকথা বীরকথা পুরাকথা (মিথ) ইতিকথা (লিজেণ্ড)। লোকসাহিত্যের নানা শাখা-উপশাখার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ও মুখ্য জায়গা জুড়ে রয়েছে পশু এবং পাখি। কৌতুকরসমিশ্রিত অনিন্দ্যসুন্দর গল্পকথা গড়ে উঠেছে নানা জাতের পশুপাখিকে ঘিরে, মুখে মুখে প্রচারিত হয়েছে দিক থেকে দিকে। আদিম মানুষ পশুপাখিকে নায়ক-নায়িকা করে ক্লান্তিহীন-ভাবে গল্প বেঁধেছে। পশুপাখির স্বভাব চরিত্র তারা নানা অভিজ্ঞতায় জেনেছে সত্য, কিন্তু স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে এদের নিয়ে গল্প রচনায় তাদের এত শ্রান্তিহীন উৎসাহ কেন? এ উদ্দীপনা তারা কোথা থেকে পেল? এসব প্রশ্নের সমাধানের জন্য আমাদের অনুসন্ধান করতে হবে মানুষের আদিম সমাজব্যবস্থা ও তার অবশেষের মধ্যে। সামাজিক অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনে পশুপাখির প্রভাব, অতি-সাধারণ জীবের স্তর থেকে এরা কোন্ স্তরে কেমন করে উঠেছে, মানুষ এদের কি মর্যাদা দিয়েছে, এদের কথাবার্তা (কাল্পনিক), চালচলন, ভাবভঙ্গি ও আচার-আচরণ কোন্ সব চরিত্রকে কিভাবে আলোকিত করেছে—পশুপাখির এই সর্বব্যাপী প্রভাবের কথা অনুসন্ধান

করলেই বোঝা যাবে কেন প্রতি দেশে অসংখ্য বিচিত্র পশুকথার উৎসার ঘটেছে। এগুলো শুধুই তাদের মনের বিলাস বা অবসর যাপন কিংবা নাতি-নাতনীর মনোরঞ্জনের জন্য সৃষ্টি হয় নি, প্রয়োজনের স্থূল তাগিদে এগুলো তাদের জীবনধারণ ও চিন্তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে রয়েছে। লোকজীবনের সামাজিক আচরণ, ব্যথা-বেদনা, শোষণ-নিপীড়ন, শ্রেণী-ঘৃণা, রীতিনীতি, ধ্যান-ধারনা, আশা-আকাঙ্খা এবং অবুঝ সংস্কার পশুকথার দেহে পরোক্ষে ও প্রত্যক্ষে অবস্থান করছে।

যে মুহূর্তে আদিম মানুষ নিজের ও চারপাশের পৃথিবী সম্পর্কে অর্ধ-সচেতনতার ভাব নিয়ে অবহিত হল, চোখ মেলে সবুজ বন্য প্রকৃতি ও সুনীল আকাশকে দেখবার অবকাশ পেল, উপলব্ধি করল নির্বাক মাটির উপরে নিজের অসহায় অবস্থিতি—সেই দিন থেকে সে মুক্ত মনে স্বীকার করে নিল পশুপাখি ও গাছের সঙ্গে নিজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও সগর্বে ঘোষণা করল ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের উপর তাদের গভীর ও ব্যাপক প্রভাবের কথা। এই মনোভাব প্রকাশের মাধ্যম হল এইসব মৌখিক পশুকথা। এই অপরিহার্য ও অবিচ্ছিন্ন প্রভাব থাকার ফলেই পশুপাখি তাদের কাছে আকৃতিতে ভিন্ন হলেও প্রকৃতিতে ছিল অভিন্ন, মানবিক। সে দেখেছে পশুর সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, নিবিড় বোধশক্তি, গভীর প্রজ্ঞা, অসীম দৈহিক শক্তি এবং সবার উপরে তুলনাহীন চতুরত, ধূর্ত স্বভাব। গোষ্ঠীমানুষ তাদের কাছে পাঠ নিয়েছে, শিকার সহজে পাওয়ার নাচের মধ্যে ও উল্লাস প্রকাশের সময় পশুর ঢংকে অনুকরণ করেছে, পশুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছে, তাকে ভয় করেছে, ভালবেসেছে, পুজো করেছে, দেবতার সর্বোচ্চ আসনে বসিয়েছে, বিপদের পূর্বাভাস জেনে নিয়েছে—মৃত ও জীবিত উভয় পশুই এইভাবে তাদের চলমান জীবনকে চালনা করেছে, প্রভাব ফেলেছে প্রতি আচরণে।

পশুপাখি দেবতার সুদৃঢ় আসন দখল করেছে। আজকের এগিয়ে-থাকা মানুষের কাছে আদিম মানুষের পশুপূজা ব্যাপারটা কিছু অদ্ভুত লাগতে পারে কিন্তু বর্তমান কালের মানুষের মধ্যেও যে এর রেশ রয়ে গিয়েছে অভ্যাসবশত তা আমরা খেয়াল করি না। সেইকালে উন্নত চিন্তার অভাবে নিরাকার বা উন্নত-দেহী দেবতার কল্পনা করা অসম্ভব ছিল, তাই পরিপূর্ণ একটি পরিচিত মূর্তিকে যতক্ষণ না তারা কোনো শক্তির প্রতিভূরূপে দাঁড় করাতে পারছে ততক্ষণ তাদের ভীরু মন শান্ত হত না। কখনও পশু অবিকৃতভাবে আবার কখনও রঙ-চঙ চড়িয়ে সামান্য অন্যভাবে পূজিত হত। ভিন্ন ভিন্ন সমাজে ভিন্ন ভিন্ন পশুপূজার প্রচলন ছিল। যে এলাকায় যে পশু পাওয়া যায় না সেই পশুর কোনো ধারণা না থাকার ফলেই সেরকম কোনো পশু সেখানে দেবতা হয়ে ওঠেনি। বস্তুর উপরেই যে চিন্তা নির্ভর করে এটা তারই প্রকাশ। সিংহ ভালুক হাতি নেকড়ে নেউল বেড়াল সাপ সোনালি-রঙের-পাখি তোতাপাখি ঈগল

প্রভৃতি পশুদেবতার স্তরে উঠেছে। বিশেষ বিশেষ সময়ে বা পার্বণে তাদের প্রতি দেবত্ব আরোপ করা হয়, আবার অনেক সমাজে এরা সবসময়েই দেবতা। মিশর সুমের ভারতবর্ষ গ্রীস প্রভৃতি দেশে অনেক দেবতাই অর্ধেক পশু, অর্ধেক মানুষ।* মনে হয়, দেবতার বাহনরূপে যেসব পশুর আবির্ভাব সেটাও মিশ্র-সংস্কৃতির প্রভাব। আদিম সমাজের পশুদেবতা বিবর্তনের ধারায় কিছুটা মর্যাদা হারিয়ে বাহন হয়ে উঠল, কিন্তু সেও প্রায় সমান ভক্তি আদায় করে নিচ্ছে পূজার সময়। অবশ্য পশুর উপরে মানুষের আধিপত্য এবং এক টোটেমের মানুষের কাছে অন্য টোটেমধারী মানুষের পরাভব স্বীকারের স্মৃতিচিহ্নও এর মধ্যে রয়ে যেতে পারে। আজও পশু কি কম পুজো পায়? সারা বাংলাদেশ জুড়ে চৈত্র-সংক্রান্তিতে গরু-পুজো স্মরণ করা যেতে পারে। গরুর পায়ে জল ঢেলে সিঁদুর পরিয়ে তাকে বরণ করা হয়। আজও বিড়াল কিংবা গরু অপঘাতে মারা গেলে তার মালিককে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। হাতি ও গরুর দেহ স্পর্শ করে অনেককেই প্রণাম করতে দেখা যাবে। পশুবলির সময় তার প্রতিটি অঙ্গ উৎসর্গের মধ্যে শুধুই যে আহারের স্থূলতা হ্রাস পায় তাই নয়, আদিম লোক-সমাজের সংস্কারও এখানে সুস্পষ্ট। আদিম মানুষের কাছে কতকগুলো ক্ষমতা খুব জরুরী ছিল। অথচ তার জীবনে ছিল সেগুলোর খুব অভাব। তাই সেইসব গুণ ও ক্ষমতা যার মধ্যে রয়েছে তাকে পুজো দিয়ে সন্তুষ্ট করে সে সেগুলো আয়ত্ত করতে চেয়েছে। পাখির উড়বার ক্ষমতা ও চকিত গতি, সিংহ ও হাতির অসীম শক্তি, সাপের নিঃশব্দ তৎপরতা, নেকড়ের চতুরতা, গরুর সহনশীলতা—এ সবই ছিল মানুষের কাম্য, বিশেষ করে শিকার জীবনে। আর তাই এইসব অ-মানুষী ক্ষমতার অধিকারী সে হতে চেয়েছে। পশুকে দেবতার আসনে বসিয়ে পুজো দেবার এই প্রবণতা গড়ে উঠবার কারণ এটাই।

সেই আদিম সমাজের গোষ্ঠীগুলো তাদের পরিচয় দিয়েছে পশু বা গাছের নামে। এ হল তাদের টোটেম বিশ্বাস। পশু ও গাছকে কতটা গুরুত্ব দিলে তবেই তাদের নামে নিজেদের পরিচয় দেওয়া যায় একথা বলে বোঝাতে হবে না। তারা বিশ্বাস করত সমাজের সকলেই এক আদি পিতা ও আদি মাতার সন্তান এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা পশু বা গাছপালার নামেই গোটা উত্তরপুরুষের নামকরণ করেছে। প্রতি সমাজেই এই বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। গোত্রদেবতাও স্থির হয়েছে এই পশু বা গাছ থেকেই। এ দৃঢ় টোটেম বিশ্বাস থেকে তারা সমাজে দুটি জিনিস খুব কঠোরভাবে পালন করেছে, প্রথমত টোটেম-আহার নিষিদ্ধ, দ্বিতীয়ত একই টোটেমের মধ্যে ছেলে-মেয়ের বিয়ে দেওয়া নিষিদ্ধ। ভারতীয় সাঁওতাল আদিবাসীদের মধ্যে যারা হাঁসদা কুলের মানুষ, তারা হাঁসকে গোত্রদেবতা বলে মানেন বলেই হাঁস কখনও হত্যা

করেন না ও খান না। এই গোত্র-নাম আবার নামের শেষেও ব্যবহার করা হয়। হিন্দুদের মধ্যে এক গোত্রে বিয়ে প্রথাবিরুদ্ধ, সেটাও এই আদিম ঐতিহ্যের সূত্র হিসাবেই। কাশ্যপ (কচ্ছপ) ভরদ্বাজ (পাখি) প্রভৃতি গোত্র টোটেম ঐতিহ্যকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। গোত্রদেবতাকে শ্রদ্ধা জানাতে এরা পরোক্ষভাবে পশুকেই শ্রদ্ধা জানিয়ে থাকে। কলম্বিয়ার নিস্‌কা ভারতীয়দের মধ্যে চারটি প্রধান ক্ল্যান আছে—কাক নেকড়ে ঈগল ও ভালুক। রেড ইণ্ডিয়ানদের সেনেকা আদিবাসীদের ক্ল্যানগুলোর নাম কচ্ছপ ইঁদুর নেকড়ে ও ভালুক। টোটেমের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নাম পাওয়া যায় ভালুক নেকড়ে ও কচ্ছপের।

সেই অবস্থায় রোগের তো অন্ত ছিল না। আবার রোগ সারাবার কোনো পথই আদিম মানুষের জানা ছিল না। তাই এখানেও নির্ভর করতে হয়েছে পশুর উপরেই। রোগনিবারক হিসাবে পশুর ভূমিকা ছিল অসাধারণ। তখনও গাছ-গাছড়ার গুণাগুণ সম্পর্কে মানুষ তেমন অবহিত ছিল না। অনুন্নত সেই বন্য সমাজে ব্যাধি যেহেতু ছিল নিত্য-সহচর, তাই দৈবের উপর আস্থা রেখেও তারই প্রতিনিধি পশুর উপর বড় বেশি নির্ভর করতে হয়েছে। এরা বিশ্বাস করত কতকগুলো পশুর রোগ-নিবারণের অত্যাশ্চর্য ও অলৌকিক ক্ষমতা রয়েছে। এই ব্যাপারে তারা সাধারণত নির্বাচন করত শিকারী পশুকে, অবশ্য অন্য পশুও একেবারে বাদ পড়ে নি। প্রায় প্রতি আদিম সমাজেই ভালুক সিংহ নেকড়ে ঈগল বড়-ইঁদুর বাদুর প্রভৃতি রোগ-নিবারক বলে বিবেচিত হত। সমাজে যে পশুটি বেশি পরিচিত তার উপরেই আস্থা থাকত বেশি। সবচেয়ে শক্তিশালী ও জাগ্রত বৈদ্য হল ভালুক। অনেক সমাজে বিশ্বাস রয়েছে, নেউল ও বিষধর সাপ এক অনন্য চেতনার অধিকারী, যার ফলে তাদের 'কর্মশক্তি' সহজে ক্রিয়াশীল হয়। তারা তাই খুব কার্যকর বৈদ্য। অনেক সময় উৎসব করেও এদের আশিস্‌ চাওয়া হয়। এইসব বিশ্বাস থেকে গর্ভবতী নারী নিশাচর প্রাণীর থাবা সঙ্গে রাখে কিংবা বিছানায় রেখে দেয় যাতে সুষ্ঠুভাবে প্রসব হয় এবং সুস্থ সন্তান জন্মায়। হোপী আদিবাসী মেয়েরা বিশেষ বিশেষ পশুর চর্বি চামড়া ও মাংসকে অতি পবিত্র জ্ঞান করে দেহে ধারণ করে, নানা দুর্বিপাক ও রোগ থেকে মুক্তির সহায়ক এগুলো। আজকেও সামাজিক অসহায়ত্বের ফলে এসব বিশ্বাস খুব প্রবলভাবে রয়েছে। যারা ভালুক খেলা দেখাতে আসেন তাদের কাজ থেকে অনেকেই ভালুকের লোম কেনেন, রুগ্ন শিশুর দেহে কবচ করে পরিয়ে দিলে রোগ সেরে যাবে এই বিশ্বাসে। বাংলাদেশে একটি বিশ্বাস রয়েছে, মঙ্গলবারে উড়ন্ত পায়রার দেহ থেকে খসে-পড়া কোনো পালক যদি মাটিতে পড়ার আগেই লুফে নিয়ে বন্ধ্যা নারীর দেহ স্পর্শ করা যায় তবে সে সন্তানবতী হবে। পশুরা যে সবসময়

রোগ সারিয়ে তোলে তাই নয়, অনেকসময়ে কিছু কিছু রোগের উদ্ভবে পশুর প্রভাব। এইসব রোগ সচরাচর ভয়জনিত। এই বিশ্বাস কমবেশি সব সমাজে প্রচলিত থাকলেও সবচেয়ে বেশি দেখা যায় হোপী, পাবলো-ভারতীয় কুনি, কাফিরি হাউসা প্রভৃতি আদিবাসীদের মধ্যে।

আদিম সমাজে পশু মানুষের পরিচালক, অভিভাবক। এই দুই দায়িত্বপদ নিয়ে তারা মানুষকে রক্ষা করেছে চরম দুর্দিনে ও উদ্ধার করেছে প্রতিকূল বিপদ থেকে। যখন অরণ্যচারী মানুষ প্রয়োজনের একান্ত তাগিদে দুর্গম পাহাড়ে ও প্রায়-অভেদ্য জঙ্গলে শিকারে বেরিয়েছে, তখন পথ দেখিয়েছে এবং শিকারের সন্ধান দিয়েছে সদা সচেতন তীক্ষ্ণবুদ্ধি কুকুর। আজও আদিবাসী সমাজে শিকারের প্রথম ও সবচেয়ে বলিষ্ঠ হাতিয়ার হল অগ্রবর্তী বিশ্বস্ত কুকুর। লাতিন-আমেরিকা আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসী সমাজে প্রচলন রয়েছে, শিকার যাত্রার সময়ে অথবা নির্জন পথে একা চলবার সময়ে তারা সঙ্গে রাখে কোনো ছোট পশুর প্রতিমূর্তি। হোপীরা এ নিয়ম কখনও লঙ্ঘন করে না। পথে যদি অতি পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ে তবে বিপদের সঠিক মুহূর্তে তাকে জাগ্রত করে দেবে এই 'সচেতন' প্রতিমূর্তি। পরিবারের রক্ষাকর্তা হিসাবে পূজাবেদীতে এইরকম মূর্তি রাখবার রীতি রয়েছে। গ্রামীণ ওঝা বা পুরোহিত তার রোগীকে এইরকম মন্ত্রপূত ছোট মূর্তি দেয় রক্ষাকবচের আকারে যা রোগীকে বাঁচাবে কুৎসিত ডাকিনীদের অশুভ দৃষ্টি থেকে। হিন্দু সমাজে বিশেষ ধরনের সামুদ্রিক শঙ্খ পূজা-বেদীতে রাখা হয় জীবনে ও সংসারে নানা জটিলতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। মৃত্যুর পরেও পশু মানুষের পথ প্রদর্শক হয়েছে। সাঁওতাল আদিবাসীরা মৃতদেহ দাহ করবার সময়ে মৃতের চিতার কাঠের সঙ্গে একটা ছোট্ট মুরগীকে ভালভাবে বেঁধে দেন। মৃতের সঙ্গে মুরগীও ভস্মীভূত হয়। তাদের বিশ্বাস, মুরগীটি স্বর্গের পথ জানে, তাই অপরিচিত পথে মানুষটিকে স্বর্গের পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবে পথ-জানা সেই মুরগীখানা। নীলগিরি পাহাড়ের টোডা আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলন রয়েছে, মৃতদেহ দাহ করবার সময় জীবিতকালে তার ব্যবহৃত বস্ত্র গহনা প্রভৃতি পাশে রেখে দেওয়া হয়। এই সময়ে দুটো মোষ বলি দেওয়া হয়। তাদের বিশ্বাস মৃত্যুর পরে পশুদুটি তাকে নানাভাবে সেবাযত্ন করবে, তার অসুবিধা দূর করবে। আজও হিন্দুরা বিশ্বাস করে মৈথুন-রত অবস্থায় (শঙ্খ ধরা) যদি কোনো সর্প-মিথুনের কাছে কোনো বস্ত্রখণ্ড ফেলে দেওয়া হয় এবং তারা যদি সেটি স্পর্শ করে, তবে সেই বস্ত্রখণ্ড সঙ্গে রাখলে মানুষ কখনও কোনো কাজে ব্যর্থ হবে না। মিশরে মমিদের আশেপাশে অনেক পশুমূর্তি পাওয়া গিয়েছে। দু'দিনের এই কষ্টের জীবনের পরে যে

অনন্ত সুখের কাল সেখানে এই পশু তাকে নানাভাবে সাহায্য করবে, এই বিশ্বাসেই সেগুলো রাখা হত।

পশু হয়েছে ধাত্রী, কখনও মানুষের জন্মদায়িনী। পশু যখন ধাত্রীরূপে গণ্য হয়, তখন কিন্তু পালিত সন্তানদের প্রতি তার কোনো হিংস্রতা থাকে না, তখন সে পুরোপুরি মানবিক আচরণ করে। কোনো বিচিত্র পথে একটি বা যমজ সন্তান পশুর কাছে গিয়ে পড়ে এবং অতি শিশুকাল থেকেই বেড়ে ওঠে তাদের বুকের দুধে, স্নেহে-যত্নে। এই পশুপালিত সন্তানদের সাধারণত একটি বৈশিষ্ট্য থাকে, তারাই পরে জাতীয় বীর হন। রেমুস্ ও রোমুলাসের বিচিত্র কাহিনী খুব পরিচিত। এরা দুজনে যমজ ভাই, চিরকুমারী সিলভিয়ার সন্তান। এদের মাকে জীবন্ত কবর দিয়ে যমজ দুই ভাইকে নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। কিন্তু তারা ডুবে মারা যায় না। একটা স্ত্রী নেকড়ে তাদের রক্ষা করে ও সন্তানের মত বড় করে তোলে। পরে এরা জাতীয় বীর হিসাবে রোম নগরীর পত্তন করে। ভারতীয় পুরাণে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির কাহিনী রয়েছে। উর্বশীকে দেখে পিতা বিভাণ্ডক যৌন-উত্তেজনা অনুভব করেন, ফলে তার বীর্যপাত ঘটে। এক হরিণী জলের সঙ্গে তা পান করলে তার গর্ভে ঋষ্যশৃঙ্গ জন্মগ্রহণ করে। এখানে পশু গর্ভধারিনী। এইসব ধাত্রীরা সচরাচর নেকড়ে গরু ছাগল ঘোড়া প্রভৃতি স্তন্যপায়ী পশুই হয়ে থাকে।[8] কিন্তু অবাক ব্যতিক্রমও দেখা যায়, কয়েকটি সমাজে সাপ ও হাঁসকেও এই ধাত্রীরূপে দেখা গিয়েছে।

আদিবাসী সমাজে বিয়ের সময়ে পশুর গুরুত্ব খুব বেশি। তারা গাছ বা পশুকে প্রথমে বিয়ে করে। বিয়ে করার পরে বারবার যদি কারও স্ত্রী মারা যায়, তবে সে প্রথমে কোনো পায়রা বা কলাগাছ বিয়ে করে, তারপরে তার আসল স্ত্রীকে গ্রহণ করে। তাদের বিশ্বাস বারবার স্ত্রী মারা যাওয়ার পেছনে নিশ্চয়ই কোনো অশুভ শক্তি সক্রিয় রয়েছে, তাই অতর্কিতে যদি আবার সে বিপদ এসেই পড়ে, তাহলে তার আঘাতটা গাছ বা পশুর উপর দিয়েই যাবে, স্ত্রীকে স্পর্শ করবে না।

পশুকে খুব কাছ থেকে ভালভাবে লক্ষ্য করে মানুষ তাদের বুদ্ধিকে তারিফ না করে পারেনি। নিজের চেয়ে পশুর বুদ্ধি যে বহু অংশে প্রখর তা সে বারবার স্বীকার করেছে। মানুষ ভাবত বুদ্ধির জোরেই পশুপাখি সব দুর্যোগের খবর আগে থেকে পেয়ে যায়। তাই কোনও রকমে যদি পশুর ভাষাটি আয়ত্তে আনা যায় তবে হয়তো বহু বিপদ থেকে আগে থেকেই সাবধান হওয়া যাবে ও দুর্বিপাক থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে। পশুর ভাষা জানার আগ্রহ তাই মানুষের তীব্র ছিল। তারা এও বিশ্বাস করে তাদের সমাজের অনেকেই পুরাকালে এ ভাষা বুঝত। তাই এখন যদি তারা চেষ্টা করে তবে তারাও হয়তো বুঝতে পারবে। মরুবাসী প্রাচীন আরবীয়রা বিশ্বাস

করত সাপের হৃদপিণ্ড ও যকৃৎ খেলে মানুষ এক অলৌকিক শক্তির অধিকারী হতে পারে, যার ফলে সে পাখিদের ভাষা বুঝতে সক্ষম হবে, তাই পাখিদের কাছে অনেক বিপদের পূর্বাভাস জেনে ফেলতে পারবে। এইসব পশুপাখির ভাষা যারা বোঝে, সমাজে তাদের স্থান দেবতার পাশেই। পশু যদি নিজে কৃপা করে এ ভাষা না শেখায় তবে মানুষ শত চেষ্টা করলেও তা আয়ত্ত করতে পারবে না। সাদা সাপের মাংস খেলে পশুপাখির ভাষা শেখা যায় বলেও অনেকের বিশ্বাস রয়েছে। পশুপাখির ভাষা বুঝত এমন রাজার গল্প এশিয়া ও ইউরোপে খুব জনপ্রিয়।

চাকার ব্যবহার যেমন মানব সভ্যতায় যুগান্তর আনল, তেমনি মানুষ যেদিন আগুনের ব্যবহার জানল তার জীবনচর্যাতেও এল বিরাট পরিবর্তন। খাদ্যকে ঝলসিয়ে খাওয়ার পদ্ধতি আবিষ্কার করার দিন থেকেই পশুর সঙ্গে তার সত্যকার ব্যবধান সূচিত হল। আগুনের কাছে মানুষের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। প্রতিমুহূর্তে আগুন অপরিহার্য। খাদ্য ঝলসাতে, অন্ধকার দূর করতে, গুহার মুখ থেকে হিংস্র পশু তাড়াতে, দেহ গরম রাখতে আগুন ছাড়া তাদের কি-ই বা ছিল। কিন্তু বস্তুটি এল কোথা থেকে? দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার বারংডামা লোককথায় আছে, মানুষের আগুন ছিল না, ছিল সিংহদের কাছে। একজন মানুষ একদিন সিংহদের শহরে বেড়াতে গেল। এক সিংহ পরিবার অতিথিকে আদর করে বসিয়ে খাওয়াল। মানুষটি দেখল গুহার সামনে আগুন জ্বলছে। সে ভাবল এটা নিয়ে গেলে তো শীত থেকে বেশ বাঁচা যাবে। গল্প-গুজবের ফাঁকে সেই অকৃতজ্ঞ মানুষটি সিংহের একটা বাচ্চাকে আগুনে ফেলে দিয়েই জ্বলন্ত এক টুকরো কাঠ নিয়ে দৌড় দিল। সিংহরা পিছে ধাওয়া করল, কিন্তু বাচ্চাটাকে আগুন থেকে আগে বাঁচিয়ে তবে তারা মানুষটার পেছনে ধাওয়া করেছিল। দেরি হয়ে যাওয়াতে লোকটা নদী পেরিয়ে গেল। অপূর্ব সুন্দর উপহারটি সে তুলে দিল মানুষের হাতে। উত্তর আমেরিকার আদি-বাসীদের একটি পশুকথায় রয়েছে, অনেক দূরের অজানা দেশ থেকে ছোট্ট রবীন পাখি ঠোঁটে করে আগুন নিয়ে এল। সারাদিন উড়ে ক্লান্ত হয়ে আগুনের ফুলকি বুকের তলায় রেখে রাত্তিরে সে ঘুমিয়ে পড়ল। ভোর হতেই আবার ঠোঁটে আগুন নিয়ে সে উড়ে চলল নিজের দেশের দিকে। শুকনো গাছে আগুন রেখে সে সবাইকে আগুন দিয়ে গেল। সে আগুন এনেছিল ঠোঁটে, আগুন লুকিয়ে রেখেছিল বুকের তলায়, তাই তার ছোট্ট ঠোঁট ও বুক রাঙা হল আর সবাইকে অন্ধকার থেকে মুক্ত করল। অপূর্ব আত্মত্যাগের কাহিনী। মানুষ আগুন পেয়েছে পশুর কাছ থেকেই।

মানুষের গল্পের যে অফুরন্ত ভাণ্ডার সেটাও একদিন পশুর দখলেই ছিল। আফ্রিকার ইকোই গল্পে আছে, এক খুদে ইঁদুর সব জায়গায় ঘুরে বেড়াত। ধনীর

প্রাসাদ থেকে বিত্তহীনের জীর্ণ কুটির, কোথাও তার যাওয়ার বাধা ছিল না। রাতের অন্ধকারে তার ছোট্ট কিন্তু তৎপর উজ্জ্বল চোখে সে সব দেখে নিত, সতর্ক কান খাড়া করে সব গোপন কথা শুনে নিত। অনেক দূরে গাছের গুঁড়িতে সরু গর্ত করে তার মধ্যে সে থাকত আর এইসব গল্প নিয়েই সে তার গল্পের ছেলেমেয়ে তৈরি করল। গল্পগুলোই তার কাচ্চাবাচ্চা। সেই ইঁদুর এই গল্পগুলোকে সাদা কালো নীল লাল জামা পরিয়ে বিচিত্র করে তুলল। ইঁদুরের ভয়, হয়তো এরা খোলা দরজা দিয়ে হাওয়ার সঙ্গে বেরিয়ে যাবে কোন্ ফাঁকে। তাই কাঠের দরজা সে সবসময় ভালভাবে এঁটে রাখত। দিন যায় রাত যায়, এমনি করে কেটে গেল বহুকাল—সব গল্প বন্দী হয়ে রইল তার কাছে। একদিন সেই বনের অন্য প্রান্তে এক ভেড়ার সঙ্গে এক চিতাবাঘের তুমুল বচসা হল। শেষকালে ভীষণ রেগে গিয়ে চিতাবাঘ তাড়া করল সেই ভেড়াকে। তাড়া খেয়ে প্রাণের ভয়ে প্রাণপণে ছুটল সেই ভেড়া। আশ্রয় না পেয়ে সে শুধুই ছুটছে। অনেকক্ষণ ছোটার পর সে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ইঁদুরের দরজায়। অনেকদিনের পুরনো দরজা, আঘাত সহ্য করতে না পেরে দরজা গেল ভেঙে। বাইরের আলো ঢুকলো ইঁদুরের অলিগলি বাসার মধ্যে আর এই সুযোগে গল্পগুলো বেরিয়ে পড়ল মুক্ত বনের পথে। চারিদিকে আলো ফুল মিঠে-হাওয়া ঝরনার ডাক—আর ফিরল না গল্পগুলো। ছড়িয়ে পড়ল পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত। এমনি করে সেদিন থেকে মানুষ সব গল্প শুনতে পেল।

আত্মায় বিশ্বাস সুপ্রাচীনকালের। কিন্তু আদিম মানুষ শুধু নিজের দেহের অভ্যন্তরের আত্মাতেই সন্তুষ্ট ছিল না। দেহের বাইরেও এক আত্মা রয়েছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই আত্মার আবাস কোনো পশুর দেহে। নিজের ভেতরের আত্মার সঙ্গে এই আত্মার অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। একের শুভাশুভ অন্যের শুভাশুভের উপরে নির্ভর করছে, একের মৃত্যুতে অন্যেরও মৃত্যু ঘটবে। এইসব বাইরের আত্মার মধ্যে আবার সবল ও দুর্বল আত্মার ভাগ রয়েছে। ঈগল, ভালুক প্রভৃতি সবল আত্মা, কুকুর হল দুর্বল আত্মা। রাক্ষসীর আত্মা আমাদের খুব পরিচিত, তার প্রাণ রয়েছে গভীর কুয়োর মধ্যে কৌটোতে বন্দী এক ভোমরার মধ্যে। তার মৃত্যুতেই রাক্ষসী শুধু মরবে। লোকসমাজের অধিকাংশ সম্পর্কই সামগ্রিক চিন্তা ও সৃষ্টির প্রকাশ, ব্যক্তি সেখানে গৌণ, সমষ্টিই সেখানে মুখ্য। কিন্তু আত্মার সঙ্গে এই যে সম্পর্ক সেটা কিন্তু সব সময় ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত নয়। শুধু তাই নয়, তাদের সমাজে ব্যক্তির কোনো কিছু গোপনীয় থাকবার রীতি নেই, কিন্তু এই আত্মার খবর অন্য কেউ জানতে পারবে না। দুর্বল মুহূর্তে যদি কখনও সে এটা প্রকাশ করে ফেলে, তবে বিপদ আসবে তার কাছ থেকেই। ক্যামেরুনের ইয়োকো ও কঙ্গোর ওশেবো আদিবাসীদের বিশ্বাস, প্রতি

মানুষের অনেকগুলো করে আত্মা আছে, একটি নিজের ও অন্যগুলো পশুর। এইসব পশুর হল হাতি শূয়র চিতাবাঘ প্রভৃতি। নানা পশুর উল্লেখ থাকলেও একটি বৈশিষ্ট্য হল, সচরাচর এইসব পশু গৃহপালিত হয় না।

চিত্রশিল্পের প্রথম নিদর্শন আমরা পাই গুহা মানুষের দেওয়াল চিত্রন্ এবং দাঁত ও হাড়ের উপরে আঁকা ছবির মাধ্যমে। এর অধিকাংশ পশুর চিত্র। এই ছবিগুলোর মধ্যে শিল্পীর অনিন্দ্য শিল্পমনের পরিচয় রয়েছে। কিন্তু এগুলো সে এঁকেছিল প্রাণের তাগিদে, জীবনের স্থূল প্রয়োজনের চাহিদায়। বনের পশু-শিকার তো সহজ ছিল না, কেননা বন্য পশু তৎপর হিংস্র ও দ্রুতগামী, অন্যদিকে শিকারের অস্ত্র পাথর তীর-ধনুক। তাই পশু শকারের জীবনপাত পরিশ্রম তাকে যাদুবিশ্বাসে নির্ভরশীল করেছিল। দেওয়ালের গায়ে পশুর ছবি এঁকে, কখনও তার পাশে তীর-ধনুক হাতে মানুষের ছবি এঁকে সে ছবির সামনে দাঁড়িয়ে শিকারের অভিনয় করত, বিশ্বাস এতে শিকার করার সুবিধা হবে। এই যাদুবিশ্বাস তার আদিম সংস্কৃতি-চর্চার প্রথম স্তর। এইসব ছবি খোদাই করার একমাত্র উপকরণ ছিল শক্ত পাথরের ধারালো ছুরি। গুহার মধ্যে যেসব দেহ সে খোদাই করেছে তার মধ্যে রয়েছে বুনো শূয়র, বৃষ, খাওয়ায় ব্যস্ত হাতি, হরিণকে আক্রমণরত একটি মানুষ, হাস্যকর একটি মানুষের মুখ, ম্যামথ, ধাবমান বল্গা হরিণ, ঘোড়া, বাইসন, মানুষ ও পশুর মিছিল, ভালুক, ছাগল, প্রস্তর যুগের সৈনিকবৃন্দ। হাড় দাঁত হাতির-দাঁত শিঙ প্রভৃতির উপরও তারা ছবি খোদাই করেছে। অনেক সময় ছবির উপরে ছবি খোদাইয়ের নিদর্শন রয়েছে। এসব ছবি বাস্তবের পশুগুলোর দেহের সমান সমান। যাইহোক, মানুষের ছবি খুবই নগণ্য এখানে, দেওয়াল ভরে উঠেছে পশুর বিচিত্র ভঙ্গির ছবিতে। ছ'হাজার বছর আগে নরফোকে পাথরের ছুরির গায়েই একটি ছবি খোদাই করা হয়েছিল, তা হল এল্ক-এর, সবচেয়ে বড় জাতের হরিণ। দৈনিক জীবনে পশুর যে প্রভাব ও প্রয়োজন তার স্বাভাবিক সহজ সুন্দর প্রকাশ এই সব পশু-ছবিতে রূপ পেল। প্রতিটি পশুর ছবিতে রয়েছে গতিময়তা, শিকারের সময়ে পশুর গতি শিল্পীর রেখা-চিত্রণে অমর হয়ে রইল।

দিন মাস বছর রাশিচক্র এসব অনেক উন্নত সমাজের দান। কিন্তু সেখানেও পশু তার ঐতিহ্যকে হারিয়ে ফেলে নি। সিকিমের লেপচারা প্রত্যেকটি বারো বছরকে একটি চক্রের সঙ্গে তুলনা করেন, চক্রের বারোটি অংশের নাম হল ইঁদুর বৃষ ঈগল উজ্জ্বল-জ্যোতি সাপ টাট্টু-ঘোড়া মেষশাবক বানর শেয়াল কুকুর এবং শূয়র। এগারোটিই পশুর নামে। প্রতিটি পশু অতি পরিচিত। এই পশুগুলোর স্বভাবের প্রতীক এই অংশগুলো। যেমন, ইঁদুর সঞ্চয়ী, ঈগল উচ্চাকাঙ্ক্ষী, বৃষ শান্ত, বাঘ উগ্র,

সাপ নীচ, টাট্টু-ঘোড়া কর্মঠ, কুকুর সজাগ, শূয়র অলস প্রভৃতি। রাশিগুলোর নামেও পশুর পরিচয় রয়েছে, যেমন—বৃষ সিংহ মেষ কর্কট বৃশ্চিক মকর মীন।

সমস্ত পৃথিবীকে ধারণ করে রেখেছে তাইকোমল ও তিনটি পশু। ভূমিকম্পের কারণও তারাই, তারা যখন মাঝে-মধ্যে দেহ নাড়া দেয় তখনই পৃথিবী থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে। সূর্য ও চন্দ্রকে পশুই গ্রাস করে, আর তাই পৃথিবীর আলো নিভে যায়।

পশুর এই যে সার্বিক প্রভাব, কর্মে-চিন্তায় আচারে এই যে পশুর প্রাধান্য, তাকে কোনো সময়েই কর্মী ও রসজ্ঞ মানুষ অস্বীকার করতে পারে নি। তারা নিপুণভাবে পশুকে দেখেছে ও তার প্রভাবকে নির্বিবাদে জীবনে স্বীকার করে নিয়েছে। তাই সে যখন গল্প বলতে বসল, স্বাভাবিকভাবেই অবচেতন অবস্থায় পশুই হল তার গল্পের প্রথম বিষয়বস্তু। পশুকে অস্বীকার ও উপেক্ষা করবার কোনো উপায়ই সে সমাজে ছিল না। তাই লোকসাহিত্যের আদি সৃষ্টি হল পশুকথা, তার সংস্কৃতিকে আদিম মানুষ প্রথম রসসিক্ত আকারে প্রকাশ করল এইসব পশুকথার মাধ্যমেই। পশুকথার বক্তব্য ও উদ্দেশ্য অন্য রকম নিশ্চয়ই কিন্তু মাধ্যম হয়েছে বিচিত্র ধরণের পরিচিত পশু। সমাজ ও পরিবেশ সাহিত্যে প্রতিফলিত হবেই, এই মৌখিক পশুকথা রচনার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। জীবনকে যারা ঘিরে ছিল, গল্পেও তারা মিছিল করে এল।

সামাজিক অভিজ্ঞতা

একেবারে সেই আদ্যিকালে অন্য কেউ ছিল না, ছিল শুধু মুলুঙগু আর তার লোকজন, অনেক পশুপাখি। কোনো দুঃখ-কষ্ট সেদিন ছিল না, খুব সুখে-শান্তিতে তারা দিন কাটাচ্ছিল।

একদিন এক বহুরূপী গিরগিটির ফাঁদে এক জোড়া অদ্ভুত প্রাণী ধরা পড়ল। এই ধরনের আজব প্রাণী সে আগে কোনোদিন দেখে নি, সে অবাক হয়ে গেল। হতভম্ব হয়ে সে ছুটল মুলুঙগুর কাছে, সব তাকে জানাল। মুলুঙগু বললেন, "আমরা দূরে লুকিয়ে থাকি, আর দেখি ওরা কি করে।"

সেই প্রাণী দুটি আগুন জ্বালল। তারা বনে আগুন লাগিয়ে দিল, ঝোপ-ঝাড় থেকে পশুরা পালাতে লাগাল। তারপর তারা ফাঁদ পেতে মুলুঙগুর মানুষজনকে ধরে ধরে হত্যা করতে লাগল। শেষকালে মুলুঙগুকেও পৃথিবী ছাড়তে বাধ্য হতে হল, সেও যে মারা পড়ে। কিন্তু মুলুঙগু তো গাছে চড়তে পারে না। সে তাই মাকড়সাকে ডাকল।

মাকড়সা জাল বুনতে বুনতে আকাশে চলে গেল, তারপর জাল বেয়ে নেমে এল। ফিরে এসে বলল, "মুলুঙগু, আমি অনেক উঁচুতে সুন্দর জাল বুনে এসেছি, তুমি এখন

পালিয়ে যাও সেই জাল বেয়ে।" মৃত্যুঞ্জ জাল বেয়ে দূরের আকাশে উঠে গেল। আর কোনোদিন ফিরল না। ফাঁদে পড়া ঐ এক জোড়া প্রাণীব শয়তানী থেকে সে চিরকালের জন্য বাঁচতে চায়।

ঐ জোড়া প্রাণীদুটি িল দুজন মানুষ।

এই লোককথাটি আফ্রিকার ইয়াও আদিবাসীদের। নিশ্চয়ই নিছক গল্প এর মধ্যে নেই। রয়েছে এক গভীর সামাজিক অভিজ্ঞতা, এক অবিচাবের হৃদয়-নিঙরানো জ্বালা। মানুষ মানুষের সবচেয়ে বড় বন্ধু, মানুষ মানুষের সবচেয়ে বীভৎস শত্রু। আদিম সাম্য-বাদী সমাজ ভেঙ্গে যাওয়ার পবে যখন গোষ্ঠীর মধ্যে বৈষম্য এল, একজন কৌশলে ফসলের বেশি অংশ অন্যকে বঞ্চিত করে সঞ্চয় করতে লাগল, সেইদিন থেকে এক শ্রেণীর মানুষের শয়তানী হৃদয়হীনতা মানুষে মানুষে বিভেদ ডেকে আনল। শ্রেণীভিত্তিক সমাজ গড়ে উঠল। সুবিধাবাদী সেই শ্রেণীর অবিচার সাধারণ মানুষ অভিজ্ঞতায় উপলব্ধি করল, আর তখনই সৃষ্টি হল এই ধবনেব রূপক গল্পের।

এইসব অসংখ্য সামাজিক অভিজ্ঞতা মানুষ পশুকথার মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছে। পশুকথাগুলো বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাব, সমস্ত অভিজ্ঞতাই প্রকাশ করেছে সাধারণ খেটে-খাওয়া অত্যাচারিত শোষিত মানুষ। বিশেব করে প্রাচীনতম গল্পগুলো, আদিবাসীদের গল্পগুলো সবই নিপীড়িত মানুষের জীবন-দলিল। সুবিধাভোগী শ্রেণ রা তাদের শ্রেণীস্বার্থে বহু গল্প তৈবি কবেে পরবর্তীকালে, সেগুলো অধিকাংশই লিখিত-রূপে পাওয়া যাবে। সাধারণ মানুষকে আদর্শ-ধর্ম-পরাজয় প্রভৃতির মোহে ডুবিয়ে রাখবার কৌশলী প্রচেষ্টাই তার মধ্যে রূপলাভ করেছে। কিন্তু অশিক্ষিত বন-ঘেরা খেটে-খাওয়া মানুষের মৌখিক লোকগল্পগুলোর মধ্যে তার কোনো পরিচয় নেই। মানুষকে জোর করে সেসব গল্প শেখানো হলেও সেগুলো তারা ভুলে যেতে চেয়েছে কিংবা স্মৃতিতে থাকলেও দায়ে না পড়লে সেগুলো সে কখনও প্রকাশ করেনি। শ্রেণীভাবনাকে প্রকাশ করাই তো স্বাভাবিক।

পশুকথার নায়ক-নায়িকা পশুপাখি, কিন্তু তারা দেহে পশু হলেও আচার-আচরণ-চিন্তা ও মনস্তাত্ত্বিক ভাবপ্রকাশে মানুষের ভূমিকাই গ্রহণ করে এবং করে বলেই সমাজের অনেক বেদনা-ক্ষোভ-দুঃখ-আনন্দ ও গোপন খবর তার মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। ক্ষণিকের জন্য পশু এবং পাখি তাদেব স্বধর্ম হারায়—আর এরই ফাঁকে আপাত-অবাস্তব কাহিনীর মধ্যে সমাজমানুষের নির্ভুল অভিজ্ঞতার বাস্তব প্রকাশ ঘটে। আদিম মানুষের সামাজিক অভিজ্ঞতা আজকের দিনেও আমাদের বিস্মিত করে দেয়। মানুষের কূটবুদ্ধি, অন্যের সারল্যের সুযোগে নিজের স্বার্থকে বড় করে দেখা, ধূর্ত মনোভাব, অন্যের মৃত্যুতে উল্লাস, সমষ্টিগত চেতনার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির প্রবণতা,

প্রবলের অত্যাচার ও দুরভিসন্ধি, অতি সাধারণ অক্ষমের প্রতি করুণা—কি নেই এইসব পশুকথার রূপকের আড়ালে !

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, সামাজিক অভিজ্ঞতা প্রকাশের জন্য তারা এ পথ বেছে নিল কেন ? মহাভারতে জ্ঞানী ভীষ্মের উপদেশের মধ্যে মানবচরিত্রের এমন দিক খুব কমই আছে যা উদ্‌ঘাটিত হয় নি। সমাজ বিবর্তনে আমরা অনেকদূর এগিয়েছি, কিন্তু শ্রেণীবিভক্ত সমাজে মানুষের মানসিক উৎকর্ষ বোধহয় তেমন উন্নত হয় নি। কারণ সমাজ বদলালে বা শোষণের পদ্ধতি পাল্‌টালেও মূল যে শোষণভিত্তিক সমাজ তা তো অধিকাংশ দেশে একই রয়েছে। পশুকথাতেও ভীষ্মের উপদেশের মতই ব্যাপক ও গভীর অভিজ্ঞতার সন্ধান মিলবে। আদিম মানুষ প্রত্যক্ষভাবে অত্যাচারীর স্বরূপ প্রকাশ করতে পারত না, সভ্যতার পথে বহুদূর এগিয়ে এসেও তার মনের বেদনা তার বিপুল অভিজ্ঞতা সে জানাতে পারে নি। ভূস্বামী-পুরোহিতের নোংরা মৈত্রী সাধারণ মানুষের রক্ত ঝরাবে, স্পষ্টবাদীকে সে সমাজে রাখবে না। সমষ্টিগতভাবে পরিকল্পিত প্রতিবাদ তখন প্রায় অসম্ভব ছিল। আবার একেবারে যে বিক্ষোভ হয় নি তাও নয়, ভূস্বামী বা গিল্ডকর্তাকে প্রাণও দিতে হয়েছে সেক্ষেত্রে। কিন্তু তার জায়গা দখল করেছে অন্য ভূস্বামী। তাই দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় তার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতাকে প্রকাশের জন্যই রূপকের আশ্রয় নিতে হয়েছে। এই আবরণে শ্রেণীশত্রু আসল বক্তব্যটি বুঝতে পারত না। পারত না বলেই সাধারণ মানুষ তার তীব্র ঘৃণাকে এইভাবে প্রকাশ করেছে। বাস্তবে অত্যাচারীকে আঘাত করতে না পেরে গল্পের মধ্যে তার প্রতিশোধ নিয়েছে। প্রায় সব পশুকথাতেই, যেখানে অত্যাচারীকে বর্ণনা করা হয়েছে, শেষকালে তার মৃত্যু দেখানো হয়েছে। এবং সে মৃত্যু বর্ণনায় সামান্যতম বেদনার আভাস নেই।

আবার এমন পশুকথা অনেক রয়েছে যেখানে প্রতিদিনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাকেই প্রকাশ করা হয়েছে। উপদেশ দেওয়া হয়েছে মানুষ যেন এইসব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে নির্বুদ্ধিতা থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারে। দু-একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। নীলবর্ণ শেয়ালের গল্পে বলা হয়েছে নিজের গোষ্ঠীকে ছেড়ে, নিজের স্বজনকে ঘৃণা করে দূরে সরে যেতে হয় না। তাদের সুখ-দুঃখের ভাগী হয়েই থাকতে হয়. নইলে নিজেরই বিপদ। তোমাকে বাঁচাবে তোমারই স্বজন। খরগোস ও সিংহের গল্পের মধ্যে বলা হল বুদ্ধির কাছে দৈহিক বল পরাজিত হয়। তাই তোমার দেহে শক্তি না থাকুক, তুমি বুদ্ধির চেষ্টায় এগিয়ে যাও। এই ধরনের অসংখ্য সামাজিক অভিজ্ঞতা উপদেশের আকারে উত্তরপুরুষকে তারা দিয়ে গিয়েছে।

একটা নির্মম সামাজিক অভিজ্ঞতা কিভাবে পশুকথায় প্রকাশিত হয়েছে তা একটি কশীয় গল্পে আমরা দেখতে পাই। এ যেন আজকের দিনের সামাজিক দর্পণ। একটা

কাক তার তিনটে বাচ্চা নিয়ে একটা দ্বীপে বাস করত। কিন্তু প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য তাকে সে দ্বীপ ছাড়তে হবে। সমুদ্রের উপর দিয়ে অনেকটা উড়ে গেলে তবে অন্য দ্বীপে যাওয়া যাবে। পায়ের নখে প্রথম বাচ্চাটিকে নিয়ে কাক উড়ে চলল। দেহ ভারি হয়ে আসছে, ডানা আর চলে না। ক্লান্ত দেহে কাক ভাবল, আমি আজ বাচ্চাদের জন্য এত কষ্ট করছি, ওরা কি আমায় বুড়ো বয়সে দেখবে? সে বাচ্চাকে জিজ্ঞেস করল তার মনের কথা। বাচ্চাটি ভাবল, যদি বলি যে বুড়ো বয়সে দেখব না, তাহলে যদি জলে ফেলে দেয়! তাই সে বানিয়ে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ দেখবই তো। তার গলার স্বরে কাকের কেমন যেন বিশ্বাস হল না, সে বাচ্চাকে জলে ফেলে দিল। দ্বিতীয় বাচ্চাটারও একই পরিণতি ঘটল। সবচেয়ে ছোট বাচ্চাটি কিন্তু বলল, তা কেমন করে হবে? বড় হলে আমারও বৌ-বাচ্চা হবে, তাদের তো দেখতে হবে। তখন তোমায় দেখব কেমন করে? তুমি তো আমাদের দেখছ, তোমার মা-বাপকে তো এখন দেখছ না? সত্যি কথা বলাতে ছোট বাচ্চা রক্ষা পেল। মর্মান্তিক হলেও সমাজে এটা সত্য, রূঢ় সত্য। যৌবনে নিজের সংসার দেখতে পিতামাতার প্রতি অবহেলা ঘটে। এটি অবাঞ্ছিত কি বাঞ্ছিত সে প্রশ্ন নয়, কিন্তু যা ঘটছে তারই বাস্তব প্রতিফলন। সামাজিক অভিজ্ঞতার কি অভ্রান্ত প্রকাশ ঘটে গেছে এই পশুকথাটিতে।

একই পশুকথা দেশে দেশে

এক গভীর বনে ভীষণ অত্যাচারী এক সিংহ বাস করত। তার আক্রমণে দিশেহারা হয়ে পশুরা ঠিক করল প্রত্যেকদিন সিংহকে একটা করে পশু ভেট পাঠাবে। সিংহ বিনা পরিশ্রমে গুহায় বসে খাদ্য পাবে এই আশায় রাজি হয়ে গেল। শেষকালে এক শশকের বুদ্ধির কাছে হেরে গিয়ে কুয়োর মধ্যে লাফিয়ে পড়ে প্রাণ হারাল সিংহ।

এই পশুকথাটি আমরা পাচ্ছি ভারতবর্ষ জর্জিয়া ইউক্রেন লিথুয়ানিয়া এবং তিব্বতে। জর্জিয় গল্পে রয়েছে—শশক গিয়ে সিংহকে বলল, মহারাজ, পশুরা দুটো শশক পাঠিয়েছিল, কেননা একটায় তো আপনার পেট ভরবে না। কিন্তু অন্য সিংহ আর একটা শশককে জামিন হিসাবে ধরে রেখেছে। কুয়োর পাশে গিয়ে শশক বলল, মহারাজ, আমার বুক কাঁপছে, আপনি আমাকে থাবায় ধরুন আমি সেই সিংহকে দেখাচ্ছি। সিংহ কুয়োর জলে দেখল, আর একটা সিংহ একটা শশককে ধরে রেখেছে। রাগে কেশর ফুলিয়ে শশককে দূরে ফেলে দিয়ে সে লাফিয়ে পড়ল জলে।

এই পশুকথাটি যেসব দেশে পাওয়া গিয়েছে—ভারত-তিব্বত-জর্জিয়া-ইউক্রেন-লিথুয়ানিয়া—সেখানে একটা সহজ ভৌগোলিক পথরেখা টানা যেতে পারে। তিব্বত থেকে চীনের মধ্য দিয়ে হয়তো এই গল্পটির বিস্তার ঘটেছে। আবার একটি গল্প

রয়েছে, আগে কোনো পশুর লেজ ছিল না, পরে পশুরাণীর দয়ায় তারা এই লেজ পেল। গল্পটি পাওয়া গেছে দক্ষিণ আফ্রিকার পূর্ব-প্রান্তে বাভেন্দা অঞ্চলে, আফ্রিকার একেবারে পশ্চিম-প্রান্ত সেনেগালে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে। এটা খুবই যে বিস্ময়ের তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এমনি করে অসংখ্য পশুকথা দেখানো যাবে যেগুলো বিস্ময়করভাবে ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করেছে। যেমন, চর্মাবৃত গর্দভের গল্পটি ভারতবর্ষ ও গ্রীসে (ভারতে বাঘের এবং গ্রীসে সিংহের), নীলবর্ণ শৃগালের গল্পটি ভারতবর্ষ ও তিব্বতে, ভালুকের লেজ কেন ছোট গল্পটি আইসল্যাণ্ড ও সোভিয়েত ইউনিয়নে, ডাঁশ ও সিংহের গল্পটি গ্রীস, তুরস্ক ও উজবেকিস্তানে পাওয়া যাচ্ছে। উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। কিন্তু কেমন করে ঘটল পশুকথার এই দিকদিগন্তের অভিযান?

পাশ্চাত্ত্য গবেষকগণ এ বিষয়ে দীর্ঘদিন থেকে অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছেন। এক সময় কিছু গবেষক মত প্রকাশ করেছিলেন, লোককথা, বিশেষ করে পশুকথা, আদি জন্মস্থান ভারতবর্ষ থেকেই পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায় ক্রমান্বয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিছুকাল পরে কয়েকজন লোকসংস্কৃতিবিদ বললেন, ভারতবর্ষের এইসব পশুকথার স্রষ্টারা কিন্তু আর্য নন, প্রাক-আর্যযুগে যারা এখানকার আদি অধিবাসী ছিলেন তারাই এগুলোর প্রাথমিক রূপ দিয়েছেন। কেননা এগুলোর মধ্যে এখনও সেই গোষ্ঠীর মানুষের মানসিকতা ও রূপকল্প ছড়িয়ে রয়েছে। ইদানীংকালের অনেক সংগ্রাহক বলেছেন, শুধু ভারতবর্ষই নয়, আফ্রিকার আদিবাসী গোষ্ঠীও স্বতন্ত্রভাবে এইসব পশুকথার স্রষ্টা। অর্থাৎ ভারতবর্ষ এবং আফ্রিকাই এদের উৎসভূমি, তারপর এগুলো ছড়িয়ে পড়ে দশ দিগন্তে। কিন্তু এক দেশ থেকে অন্য দেশে এই পশুকথা 'মাইগ্রেশান'-এর মাধ্যম গুলি কি?

এই ক্ষেত্রে সৈনিকরা এক মস্ত মাধ্যম। শ্রেণীর যখন জন্ম হল, নানা বিরোধ প্রকট হল, পাকাপোক্ত যুদ্ধ শুরু সেদিন থেকেই। কৃষির ক্রমবিকাশের পথে গোষ্ঠীমানুষ বুঝতে পারল যুদ্ধবন্দীকে হত্যা না করে জমিতে তার শ্রমশক্তিকে নিয়োজিত করলে অনেক বেশি ফসল পাওয়া যাবে। সে তো আজকের কথা নয়। তাই মানুষের জীবনে যুদ্ধ বেশ প্রাচীন সঙ্গী। এই যুদ্ধ ঘটেছে শুধুমাত্র আক্রমণ বা উচ্চাশার জন্য নয়, প্রতিরোধের জন্যও যুদ্ধ করতে হয়েছে। যুদ্ধ যখন করতেই হবে তখন বলিষ্ঠ সব যুবকদের নিয়ে গড়ে উঠল সাহসী সৈন্যদল। এদের বীভৎস পশুসুলভ কার্যধারা সত্ত্বেও গল্পকথা প্রচারে এরা সহায়তা করেছে। একটা উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। সুদূর গ্রীসের ম্যাসিডন থেকে বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে আলেকজাণ্ডার দেশ জয় করতে করতে ভারতবর্ষে এলেন। আবার নানা ঘাত-প্রতিঘাতের পরে ব্যাবিলনের পথে

ফিবে চললেন। কিন্তু গ্রীক সেনানী ও সাধাবণ সৈন্য এখানে বযে গেল। যারা থাকলেন তাবা দিনে দিনে সহজ হয়ে উঠলেন ভাবতবাসীব সঙ্গে, হযতো এদেশেব মেযে তাদেব ঘবণী হলেন, তাবা শোনালেন তাদেব দেশেব গল্প। আবাব যেসব সৈন্য ফিবে গেলেন গ্রীসেব পথে, হীবে জহবতেব সঙ্গে হযতো কিছু ভাবতীয গল্পও সঙ্গে নিযে গেলেন। এই আদান-প্রদানে গল্পকথাও দেশেব গণ্ডি পেবিযে যেতে পারে।

পর্যটকগণ আব একটি মাধ্যম হতে পাবেন। ভ্রমণকাবিগণ যে যুগে থেকে জ্ঞান ও দেশেব সীমাবদ্ধ গণ্ডি ছাডিযে বেবিযেছিলেন তাব কোনো ইতিহাস নেই। তবে এই দেশাটন অতি সুপ্রাচীনকালেব। বামাযণ মহাভাবত পুবনো টেস্টামেণ্ট প্রভৃতিতে এই ধবনের পর্যটকেব পবিচয বযেছে। আত্মানুসন্ধান তীর্থদর্শন এসবেব মাধ্যমেও পর্যটনেব পবিচয বয়েছে। এবা যেসব দেশে গেলেন, সেখানে শুনলেন সেদেশেব গল্প, তাদেব শোনালেন নিজেব দেশেব গল্প। এক দেশেব গল্প অন্য দেশে চলে গেল। দীপঙ্কব শ্রীজ্ঞান অতীশ তিব্বতেব সম্রাটেব অনুবোধে বৌদ্ধধর্ম সংস্কাবেব জন্য যান এবং সেখানে দীর্ঘদিন থাকতে বাধ্য হন। ইতালির মার্কো পোলো কুবলাই খানেব আমলে অনেকদিন চীনে ছিলেন। স্বভাবতই ভাবতবর্ষেব গল্পকথা তিব্বতে এবং ইতালিব গল্পকথা চীনে প্রচাবিত হওযা কিছু অসম্ভব নয। আবাব এমনি কবেই নিজেব দেশে অন্য দেশেব গল্পকথা চলে আসা স্বাভারিক।

বণিকবা আব একটি মাধ্যম। ব্যবসা-বাণিজ্য এবং লাভেব আশাতেই তারা মরুভূমি গিবিখাত ও সমুদ্রেব সমস্ত বাধা বিপত্তিকে স্বীকাব কবে নিয়ে দেশান্তরে পাডি জমিযেছেন। প্রযোজনেব জন্য তাদেব অন্য দেশে গিযে বেশ কিছুকাল কাটাতে হযেছে, মিশতে হয়েছে সেইদেশেব কাববারীদেব সঙ্গে। বহু শত বছব আগে ভাবতেব বণিক দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায বাণিজ্য করতে গিযেছিলেন, আবব-পাবস্য-মিশবেব বণিকরা এসেছিলেন ভাবতে, বোমের বণিক গিয়েছেন আফ্রিকায—এইভাবে একদেশের গল্পকথাও অন্য দেশে ছডিয়ে পডতে পাবে।

আলবেরুনিব মত কিছু জ্ঞানান্বেষী এ ব্যাপারে সহাযক হতে পারেন। অন্য দেশেব যা কিছু সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক সম্পদ তা অর্জন কবতেই এবা আসেন। গল্পকথার অপূর্ব রসভাণ্ডার তাদের মুগ্ধ কবতে পারে, নিজেব দেশেব সেই সম্পদ অন্য দেশেব জ্ঞানপিপাসুকে দান করে যেতে পারেন। প্রচাব এভাবেও ঘটতে পারে।

উপরের এই মাধ্যমগুলিব দ্বারা একদেশেব লোককথা অন্য দেশে নিশ্চয়ই ছড়িয়েছে, এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। তবুও বলছি, এর সংখ্যা নগণ্য। বিচারের সময় এই বিষয়টি প্রায় ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না।

এখন প্রশ্ন কেন? আমরা সবাই জানি, লোকসমাজ অত্যন্ত ঐতিহ্যপ্রিয়।

সে যেমন সহজে তার ধর্ম আচার আচরণ চিন্তা ও কর্মপদ্ধতি ত্যাগ করে না, তেমনি নতুন কিছুও সহজে গ্রহণ করে না। উপর থেকে কোনো সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়া তাদের সমাজে প্রায় অসম্ভব। যতক্ষণ না সে অন্তর দিয়ে, তার চিন্তাবোধ-চেতনা দিয়ে কোনো কিছু গ্রহণ করছে, ততক্ষণ তাকে সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত করা যাবে না। যদি বাধ্য হয়েও সে এটা গ্রহণ করে, তবু বেশিদিন তাকে সমাজে জিইয়ে রাখা যাবে না, আরোপিত বস্তুটি শুকিয়ে যাবেই। পৃথিবীর নানা স্থানের অধিবাসীদের জীবনচর্যা আলোচনা করে দেখলে আজও দেখা যাবে, বিকশিত সভ্যতার প্রচণ্ড তরঙ্গাভিঘাতের মধ্যেও তারা কিভাবে তাদের আদিমতম কতকগুলি সংস্কৃতি-চেতনাকে টিকিয়ে রেখেছে, তাদের ঐতিহ্যকে লালন করে চলেছে।

অন্য একটি বাধা হল ভাষা। হয়তো কোনো সমাজের একজন অন্য ভাষা শিখে গল্পটি তার সমাজকে বলল। কিন্তু সমাজের সকলে যখন সেটিকে গ্রহণ করবে অর্থাৎ সেই গল্প যখন সামগ্রিক স্বীকৃতি পাবে তখনই তা তাদের নিজস্ব হয়ে উঠবে। কিন্তু এমন সব প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের ভাষা রয়েছে যার সঙ্গে সেইকালে যোগাযোগ ঘটানো বড় সহজ ছিল না। যেমন, আমাজান নদীর তীরের বাসিন্দা, আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ান, নিউজিল্যাণ্ডের মাউরি, অতলান্তিক সমুদ্রের তীরে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার হটেনটট, সোভিয়েত ইউনিয়নের কসাকরা স্বভাবতই খুবই রক্ষণশীল, অন্যদের তারা তাদের সমাজ-গণ্ডীরে সহজে প্রবেশ করতে দেয় না, তারা বহু প্রাচীন সংস্কৃতির উত্তরাধিকার বহন করে চলেছেন, তারা বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ। অথচ আশ্চর্যের বিষয় একই ধরনের পশুকথা সামান্য হেরফের হয়ে তাদের সমাজ থেকে পাওয়া গিয়েছে। ভাষার এই দুরতিক্রম্য বাধা তাহলে কিভাবে অপসারিত হল? এর ব্যাখ্যা পাওয়া দুরূহ।

আসলে এইসব গল্পকথা নিরপেক্ষভাবেই তাদের লোকসমাজে গড়ে উঠেছে, কোনো প্রভাব বা 'মাইগ্রেশন'-এর প্রয়োজন হয় নি। বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে হলে সমাজ বিবর্তনের সূত্রগুলির দিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

পৃথিবীতে মানব-সভ্যতার অসম বিকাশ ঘটেছে। আজকের অর্থনৈতিক-সামাজিক অবস্থার দিকে তাকালেও তা বোঝা যাবে। এই ভারতবর্ষেই তো অসম বিকাশের নানা অঞ্চল রয়েছে। কিন্তু যে সমাজ যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, বিকাশের নির্দিষ্ট কতকগুলি ধাপ তাকে অতিক্রম করতেই হবে। পশুপালনের স্তর থেকে কৃষিতে আসতে হয়েছে, হয়তো দুটোই দীর্ঘদিন পাশাপাশি ছিল, কিন্তু কৃষির স্তর থেকে আবার পশুপালনে ফিরে গিয়েছে এমন সমাজ হতে পারে না। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে জমির উর্বরতা নষ্ট হলে সে পশুর উপর নির্ভর করতে পারে, কিন্তু কখনই তাকে পশুপালনের স্তর বলা

মাবে না। বিকাশের এইসব স্তরে মানুষ সার্বজনীন কতকগুলি অভিজ্ঞতা অর্জন করে। যেমন, শোষণের নানা পদ্ধতি ও আঞ্চলিক রীতি থাকা সত্ত্বেও সব সমাজেই তারা সামন্ততান্ত্রিক শোষণের অভিজ্ঞতা অর্জন করছে; শ্রমের বিভিন্নতা থাকলেও তারা দেখছে একদল খাটছে, জমিতে ঘাম-রক্ত ঝরাচ্ছে, আর অল্প কয়েকজন কৌশলে বিনা পরিশ্রমে বহাল-তবিয়তে রয়েছে; শাস্তির বৈচিত্র্য থাকতে পারে, কিন্তু তারা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছে প্রতিবাদ করলেই শাস্তি পেতে হয় এবং নির্মম তার পরিণতি, সমাজে একইভাবে বেড়ে উঠলেও কারও বুদ্ধি থাকে বেশি, অনেক কেমন যেন অল্পবুদ্ধি থাকে; একই বাবা-মার সন্তান হওয়া সত্ত্বেও বাবা-মা সবাইকে সমান ভালবাসে না, যে জমিতে বেশি ফসল ফলায় কিংবা বেশি পশু মারতে পারে তার প্রতি পক্ষপাতিত্ব যেন বেশি; সমাজে এক ধরনের লোক রয়েছে যারা কথায়-বুদ্ধিতে অন্যকে ঠকায়, নির্লজ্জের মত ব্যবহার করে, কিন্তু কেন যেন তাকে কিছু করা যায় না, স্বামী রুগ্ন হয়ে অনেকদিন অকর্মণ্য হয়ে পড়ে থাকলে নিজের বৌও আর তেমন দেখে না, রাগ রাগ ভাব দেখায়; সারা দিনমান হাড়ভাঙা খাটুনি খেটেও বৌ ছেলেকে পেট পুরে ভাত দিতে পারে না —ইত্যাদি 'আন্তর্জাতিক' অভিজ্ঞতা সাধারণ মানুষের হয়। আর এই অভিজ্ঞতাকে রূপ দিতে গিয়ে তারা যখন তাদেরই চরিত্রকে পশুকথায় ফুটিয়ে তোলে তখন স্বাভাবিকভাবেই সদৃশ চিন্তা প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। সকলের অভিজ্ঞতাই মূলতঃ এক, তাই অভিজ্ঞতা যখন অবয়ব পাচ্ছে পশুকথার মাধ্যমে তখন একই গল্প বেরিয়ে আসছে। বিচ্ছিন্নভাবে, সম্পর্কহীন অবস্থাতেই এইসব পশুকথা জন্ম লাভ করেছে। পার্থক্য শুধু পশুর নামে। কেননা যে অঞ্চলে যে পশু নেই, যে পশুকে লোকসমাজ চেনে না, তাকে নিয়ে কখনও তারা গল্প বাঁধবে না।

আগেই বলেছি, এইসব পশুকথার জনক এবং পালক নিপীড়িত সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষ। সুবিধাভোগী শ্রেণীর মৌখিক পশুকথার সন্ধান মেলা প্রায় অসম্ভব। তাই সমস্ত পশুকথার মধ্যেই মূর্ত হয়ে উঠেছে ভয়াবহ শোষণের চিহ্ন, নির্মম অত্যাচারের করুণ বর্ণনা, হৃদয়-নিঙরানো কান্নার আর্তনাদ, অন্যায়ের প্রতি সুতীব্র ঘৃণা আর বঞ্চিতের অপূর্ণ কামনা ও কল্পিত প্রতিরোধের কাহিনী। এবং এই অভিজ্ঞতা সর্বকালের সকল অঞ্চলের সমগ্র মানব-সমাজের।

সূত্র নির্দেশ

১ **Ancient Society : Lewis Henry Morgan.**

২, ***The world appears to primitive man neither inanimate nor empty but abun-***

dant with life; and life has individuality, in man or beast or plant, ... Any phenomenon may at any time face him, not as It, but Thou. —Before Philosophy · W. Frankfort.

৩. Goddesses like Sekhmet with the body of a woman and the head of a lioness, or Sobek, who had the body of a crocodile, or Amun, king of all the Gods in Egypt, who, in one of his manifestations, bore the head of a man. —The anvil of civilization . Leonard Cattrell.

৪. Slavonic folk-lore tells of the she-wolf and she-bear that suckled those super-human twins, Waligora, the mountain-roller and Wyrwideb, the all-uprooter, Germany has its legend of Dieterich, called Wolfdieterich from his foster-mother, the she wolf —The origins of culture (Part I). E. B. Tylor.

পশুকথা :

এশিয়া মহাদেশ

ভারতবর্ষ

দেশ পরিচয়

ভারতবর্ষ এক বৈচিত্র্যময় বিশাল দেশ। তিনদিকে সমুদ্র, উত্তরে হিমালয় পর্বতশ্রেণী। দেশের প্রাকৃতিক ও ভৌগলিক পরিবেশ বিচিত্র। গভীর অরণ্যভূমি, বিস্তৃত মরুভূমি, অসংখ্য নদী ও পাহাড় দেশের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে। সর্বাধিক বারিপাতের এলাকা রয়েছে রয়েছে অনুর্বর শুষ্ক অঞ্চল। আর আছে হরেক রকমের পশু পাখি সরীসৃপ এবং জলজ প্রাণী।

ভারতবর্ষের সভ্যতা অত্যন্ত সুপ্রাচীনকালের। বিশেষ করে আর্যপূর্ব যুগে যারা এদেশে বাস করতেন, উত্তরাধিকারসূত্রে তারা এক মহান সংস্কৃতির জন্ম দিয়ে গিয়েছেন। লোকসংস্কৃতির ধারা বেয়ে আজও আদিবাসীদের মধ্যে সেই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বেঁচে রয়েছে। এদেশে যেমন দুটি অনবদ্য মহাকাব্য রয়েছে, তেমনি লোকসংস্কৃতির এক বিরাট ভাণ্ডার ছড়িয়ে আছে নানা জাতি ও গোষ্ঠীর মধ্যে। বহু জাতি ও ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ বাস করেন ভারতবর্ষে। এমন অনেক ভাষা রয়েছে যার কোনো লিপি নেই। বহু হানাহানি রক্তপাত ও সংঘর্ষ ঘটে গেলেও এক বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি আজও বিদ্যমান এখানে। বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয় এই দেশে পাওয়া যাবে। বিভিন্ন রক্তের মিশ্রণ ঘটেছে এদের মধ্যে। এক কথায় সংঘর্ষ এবং সমন্বয়ের মাধ্যমেই ভারতীয় সংহত সমাজ গড়ে উঠেছে। এই কারণে অসংখ্য ধর্মীয় ভাবনা-চিন্তার ও উৎসার ঘটেছে।

বিপুল লিখিত সাহিত্যের পাশে সীমাহীন মৌখিক লোকসাহিত্য গড়ে উঠেছে এদেশে। লোকসাহিত্যের এমন বিশাল ভাণ্ডার আর কোনো একটি দেশে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই মৌখিক সাহিত্য বহু যুগ থেকে লিখিত সাহিত্যকে পুষ্ট করে চলেছে। মহাকাব্য এবং পুরাণগুলির উৎসও লোকমানসের মৌখিক সাহিত্য।

ভারতের এলাকা ১,০৬২,২৭৫ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা প্রায় ৫৫ কোটি। দীর্ঘদিন বিদেশী শাসনে পরাধীন থাকার পর ব্যাপক গণ-আন্দোলনের ফলে দেশ স্বাধীন হয় ১৯৪৭ সালের ১৫-ই আগস্ট।

কুকুর ও শেয়াল

অনেক অনেক দিন আগে এক পাহাড়ী নদীর পাশে থাকত এক শেয়াল আর এক কুকুর। তারা দুজনে ছিল খু ব বন্ধু।

একদিন কুকুর শেয়ালকে নেমন্তন্ন করল। সূর্য ডোবার পরে আবছা অন্ধকারে শেয়াল এল কুকুরেব গুহায়। কুকুর আগেই রান্নাবান্না করে রেখেছিল। অনেক চেষ্টায় কুকুর বেশ কয়েকটা বুনো মুরগী ধরে বেঁধে রেখেছিল আগের দিন দুই বন্ধুতে মিলেমিশে খুব আনন্দ করে সেই খাবাব খেল।

নিজের গুহায় ফিরে আসার সময় শেয়াল কুকুরকে নেমন্তন্ন করল। বলল, 'দেখ বন্ধু, তুমি তো আমার গুহায় যাবে, কিন্তু দুটো শর্ত রয়েছে। তুমি তোমাব গুহা থেকে আমার গুহায় কিন্তু হেঁটে হেঁটে যাবে, একদম দৌড়তে পাববে না। আর সূর্য ডোবার সময়েই তুমি যাবে, তার পরে নয়।'

কুকুব অতশত চিন্তাভাবনা করল না। সে সাদাসিধে প্রাণী। তাই শেয়ালেব শর্তেই রাজি হয়ে গেল। শেয়াল যে তার বন্ধু!

পরের দিন সূর্য ডোবাব বেশ কিছুক্ষণ আগে কুকুর রওনা দিল। মন তাব খুশিতে ভরা। মাথা নিচু করে লেজ নাড়িয়ে সে পথ চলছে। কিছুদূর গিয়ে কিন্তু কুকুর বুঝল যে সে দৌড়চ্ছে। 'বাঃ! খুব ভুল হয়ে গিয়েছে'—মনে মনে একথা বলে সে আবার ফিরে চলল তার গুহার কাছে। সেখানে গিয়ে সে নিজেকে বলল, 'এবাব আর ভুল করা চলবে না।' আবার রওনা দিল কুকুর।

এবারও কিন্তু খানিকটা পথ এসে কুকুর হঠাৎ খেয়াল করল, সে তো হাঁটছে না, দৌড়চ্ছে। মন খারাপ হয়ে গেল তার। মানুষের কাছে তাড়া খেয়ে খেয়ে সুস্থির হয়ে যেন সে হাঁটতেই ভুলে গিয়েছে। সে ফিরে চলল তার গুহার দিকে।

এইভাবে বার কয়েক যাওয়া-আসা করতে করতে কুকুরের বড় দেরি হয়ে গেল। দূর পাহাড়ের কোলে সূর্য ডুবে গিয়েছে অনেকক্ষণ। তবু, বন্ধু শেয়াল যে তাকে নেমন্তন্ন করেছে, না গেলেই নয়!

শেষকালে অনেক পরে কুকুর হাঁপাতে হাঁপাতে শেয়ালের গুহায় পৌছল। ভেতরে ঢুকে দেখে, শেয়ালের খাওয়া-দাওয়া শেষ, শুধু হাড় ক'খানা পড়ে রয়েছে।

শেয়াল বলল, 'বন্ধু, তুমি তো বড্ড দেরি করে ফেললে। নাও, কি আর করা যাবে, হাড় চিবোও।'

কুকুরের নেমন্তন্ন ছিল, দুপুরে সে ভালভাবে তেমন কিছু খায় নি। খিদের জ্বালায় পেট জ্বলছে, বারবার ফিরে ফিরে যাওয়ায় মাথা ঘুরছে, ক্লান্তিতে পা চারটে কাঁপছে। সে হাড়গুলোকে এক জায়গায় করে নিয়ে বসে পড়ল, সামনের দুই পায়ের মাঝখানে হাড় নিয়ে চিবোতে লাগল। এক অদ্ভুত গোঙানি বেরিয়ে আসছে তার মুখ থেকে, আর হাড়-ভাঙার কচ্‌কচ্‌ শব্দ।

হাড়ে যদি একরত্তি মাংস নাও থাকে, তবু কুকুর সেইদিন থেকে শুধু হাড়ই চিবোয়। রস নেই তবু শুকনো হাড় মুখে পুরে চিবোয়। আর সেই সঙ্গে খিদে ও ক্লান্তির যন্ত্রণায় মুখ দিয়ে আর্তনাদের মত গোঙানি বেরোয়।

অভিপ্রায়

মাঠ-ঘাটের সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষ স্বভাবতই খুব সরলপ্রাণ। পরিবারের লোক-জনদের জন্য খাবার যোগাতেই তার দিন কেটে যায়। অথচ এই হাড়ভাঙা খাটুনিতেও ক্ষুধার উপশম হয় না, দিনের পর দিন কাটে অর্ধাহারে অনাহারে। আর যেদিন কাজ থাকে না, সেদিনের সমস্ত চিন্তা অনাহারকে ঘিরেই ঘুরপাক খেতে থাকে। পরের দিনের অনিশ্চয়তাও তাকে বিব্রত করে তোলে। জীবনে অবসর কম। অমানুষিক শ্রমের ফলে দুর্বল দেহে রাত্রে নেমে আসে গভীর ঘুম। একারণে অসৎ চিন্তা বা শয়তানী কুমতলব আঁটবার অনুকূল অবস্থা তাদের জীবনে নেই। আর কতকগুলো মূল্যবোধ ছেলেবেলা থেকে গড়ে ওঠে যাতে অন্যের ইষ্ট কামনা করতেই তারা অভ্যস্ত। সাদামাটা জীবন তাই সরল হতেই বাধ্য।

অন্যপক্ষে যারা অন্যের শ্রমশক্তিকে নিয়োগ করে জীবনে প্রচুর অবসর পায়, স্বাভাবিকভাবেই অন্যকে ঠকানো বা বঞ্চনা করবার নানা চিন্তায় তারা মনোনিবেশ করে। এইসব মুষ্টিমেয় কয়েকজন কুচক্রী ধুরন্ধর মানুষের দ্বারা সমাজের সরল শ্রমজীবী মানুষ আবহমান কাল ধরে নির্যাতিত হয়ে আসছেন। সুযোগসন্ধানী স্বার্থপর এইসব মানুষের জন্য সরলবিশ্বাসী সাধারণ মানুষ অনেক কিছুই করেন, কিন্তু প্রতিদানে পান বঞ্চনা ও উপেক্ষা। সমাজের শাঁসটুকু ভোগ করে অল্প কয়েকজন, আর বেশির ভাগ মানুষ দীর্ঘশ্বাসে দিন কাটান। মাংস খায় একজন, হাড় চিবোয় অন্যে।

শ্রেণীবিভক্ত সমাজে ধনবৈষম্য রয়েছে, তাই সেখানে এ চিত্র প্রতিদিনের, প্রতি

মুহূর্তের। এই স্বার্থান্বেষী মানুষগুলো এমন কুৎসিত মানসিকতার উত্তরাধিকারী হয় যে সামান্য মৌখিক সহানুভূতি প্রকাশ করতেও তারা অনভ্যস্ত হয়ে পড়ে, নির্যাতিত মানুষকে তারা মানুষ হিসাবে গণ্য করতে ভুলে যায়। সুযোগ পেয়ে পেয়ে এদের মনোবৃত্তি এমনভাবেই গড়ে ওঠে যার ফলে অন্যের কষ্টে ও নির্যাতনে এরা বিমল আনন্দ পায়।

পথের কুকুরের হাড় খাওয়ার বিশেষ লোভাতুর ভঙ্গির মধ্যে সরল সাধারণ মানুষ তাদের দিন-যাপনের গ্লানিকেই দেখতে পেয়েছেন। এ যে তাদের নিপীড়িত জীবনেরই বাস্তব প্রতিচ্ছবি। শেয়াল এমন শর্ত আরোপ করেছে যা রাখতে গেলে কুকুরকে অনাহারে থাকতে হবে। সামন্তপ্রভু তো এইভাবেই শর্ত আরোপ করে। তাই ফসল ফলিয়েও অন্নদাতা কৃষক থাকেন অর্ধভুক্ত। নিজের পুষ্টি হলেই শেয়ালরা খুশি থাকে। অন্যের প্রতি সীমাহীন উদাসীনতা উপেক্ষা ও ঘৃণা তাদের জীবনচর্যার বিশেষত্ব। শেয়াল কুকুরকে এমন নির্বিকার-চিত্তে খাওয়া-শেষ-হওয়ার সংবাদ দিল যার মধ্যে শেয়ালের শ্রেণীচরিত্রটি খুব স্পষ্টভাবে প্রকট হয়ে পড়েছে।

চিরবঞ্চিত ক্ষুধিত মানুষ আজও একইভাবে হাড় চিবিয়ে চলেছে আর সামাজিক বিভেদজনিত বঞ্চনার বীভৎসতায় আর্তনাদ করে উঠছে থেকে থেকে, আমাদের চারদিকে সেই আর্তনাদ, সেই গোঙানির শব্দ।

জাপান

দেশ পরিচয়

একদিকে অতি মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ, চেরি ফুল ফোটার এবং সূর্য ওঠার দেশ নিপ্পন। অন্যদিকে টাইফুন ও ভূমিকম্পের আতঙ্ক বুকে নিয়ে জাপান এক সুপ্রাচীন উন্নত সংস্কৃতির দেশ। প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ছোট বড় অনেকগুলো দ্বীপ নিয়ে এই দেশ। হোনসু শিকোকু হোক্কাইদো কিউশিউ কয়েকটি বড় বড় দ্বীপ। কুড়িটি আগ্নেয়গিরি এখনও রয়েছে যারা সুপ্ত থাকলেও যে কোনো মুহূর্তে সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে।

জাপানের মানুষ অসাধারণ কর্মঠ, তাদের সৌজন্য ও সৌন্দর্যবোধ তুলনারহিত। আদি-বাসিন্দারা হলেন আইনো, তারা সংখ্যায় এখন অনেক কম, বাস করেন সাধারণত উত্তর জাপানে। চীন কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়া থেকে নতুন আগতরা এসে জাপানে বহুদিন পূর্বে এক উন্নত মিশ্র-সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছেন। এরা সবাই মোঙ্গল নরগোষ্ঠীর মানুষ।

বিশ শতকের গোড়া থেকেই দেশে ব্যাপক শিল্পোন্নয়ন ঘটেছে, তবু সামাজিক-ভাবে সচেতন ও ঐতিহ্যপ্রিয় জাপানী জনগণ তাদের ঐতিহ্যমণ্ডিত লোকসংস্কৃতিকে রক্ষা করে এসেছেন। বাইরের জগতের দ্বন্দ্ব দীর্ঘদিন তাদের সমাজকে আলোড়িত করতে পারেনি বলেই লোকঐতিহ্য দেশীয় কাঠামোতে সুন্দরভাবে অবিকৃত রয়ে গিয়েছে।

জাপানের এলাকা ১৪৬,৬৯০ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৯৩,৪১৮,৫০১ জন। ১৯৪৭ সালের নতুন সংবিধানে জনগণের সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হয়েছে, জনগণের প্রতি-নিধিরাই দেশ শাসন করেন। দেশে সম্রাট রয়েছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীভৎসতম ঘটনা জাপানের বুকেই ঘটে, তা হল নাগাসাকি ও হিরোসিমার উপরে আনবিক বোমার আক্রমণ।

বানর ও রঙিন পাখি

বানর আর রঙিন পাখির ছিল এক টুকরো ধানের ক্ষেত। ওই ক্ষেতে ছিল দুজনের ভাগ।

চাষের সময় এগিয়ে আসছে। আগাছায় পথঘাট ঢেকে গিয়েছে। তাই পথ বানানো দরকার। রঙিন পাখি বলল, 'বন্ধু, দেখ সবাই কাজে নেমে পড়েছে, ক্ষেতে যাওয়ার পথ পরিষ্কার করছে। আমাদেরও যে কাজে নামতে হয়।'

বানর বলল 'খুব জুত্সই কথা। কিন্তু ভাই, তুমি তো জানো আমার পায়ে কেমন চোট লেগেছে, আমি তো এখন কাজে যেতে পারব না।'

'ঠিক আছে, তার জন্য কি হয়েছে। তুমি ভাই বাড়িতে থেকে বিশ্রাম নিয়ে সেরেসুরে ওঠো, আমি এখন না হয় একাই যাই।' এই কথা বলে রঙিন পাখি ক্ষেতের রাস্তা পরিষ্কার করতে একাই চলে গেল।

এমনি করে কয়েকদিন কেটে গেল। ক্ষেতে মাটি তৈরির সময় এসে গেছে। রঙিন পাখি বানরের কাছে গিয়ে বলল, 'বন্ধু, সবাই ক্ষেতে নেমে পড়েছে, মাটি তৈরি করছে, আমাদের ও যে কাজে নামতে হয়।'

'উঃ, যা মাথা ধরেছে আমার, আমি যে আজ কোনো কাজই করতে পারব না।'

'আচ্ছা, তার জন্য কি আছে।' এই কথা বলে রঙিন পাখি ক্ষেতে চলে গেল, একমনে কাজ করতে লাগল সে।

কয়েকদিন পরে রঙিন পাখি এসে বলল, 'বন্ধু, সবাই ক্ষেতে নেমে পড়েছে, ধানের চারা বুনছে। আমাদেরও যে কাজে নামতে হয়।'

'এখন আমি কি করি? হায়! হায়! দিন তিনেক হল আমার যা কাশি হয়েছে না! এখন তো আমি মোটেই যেতে পারব না।'

'ঠিক আছে।' এই কথা বলে রঙিন পাখি চলে গেল ক্ষেতে চারা বুনতে। তার তো কিছু করার ছিল না, তাকে যে যেতেই হবে।

চারা বোনা হয়ে গেল, নিত্যি সে চারায় জল দেওয়া হল, গাছের গোড়ার ঘাস-আগাছা একটা একটা করে তুলে ফেলতে হল, এমনি করে কষ্টের গরমকাল শেষ হল। এল সুন্দর শরৎকাল। সোনালি ধানের সারি হাওয়ায় মাথা দোলাচ্ছে। এই ফসল যারা ফলিয়েছে তাদের মনেও খুশির দোলা। এবার ফসল কাটার পালা।

রঙিন পাখি বানরের কাছে গিয়ে বলল, 'বন্ধু, সবাই ক্ষেতে নেমে পড়েছে, পাকা ফসল কাটছে। আমাদেরও যে কাজে নামতে হয়।'

'আর কি বলব ভাই। কয়েকটা কারণে আমার পিঠে আঘাত লেগেছে, আমার হাতে-পায়ে ভীষণ ব্যথা করছে, এমন মাথা ধরেছে যেন মাথা ছিঁড়ে পড়বে। আমি আর সহ্য করতে পারছি না।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।' রঙিন পাখি তাড়াতাড়ি বলল, একটাও অনুযোগের কথা মুখে আনল না। ফসল কাটার ধকল তো কম নয়। অনেক খেটেখুটে রঙিন পাখি একাই সব কাজ করল। ধান ঘরে তুলে সে নিজেই ধান ভানলো, ঝাড়াই-মাড়াই করল—শেষকালে সাগরের মুক্তোর মত চালের শস্যদানা বেরিয়ে এল।

সূর্য ডুবু ডুবু। বানর এল রঙিন পাখির ঘরে। মধু-ঢালা মুখে বলল, 'রঙিন পাখি, বন্ধু আমার, এতদিন কত কষ্টে তুমি একাই সব কাজ করলে। আমি তো কিছুই করতে পারলাম না। যাক, এখন এস, আমরা দুজনে মিলে খাওয়ার জন্য কিছু ভাত রাঁধি।'

'খুব ভাল কথা, খুব ভাল কথা'। রঙিন পাখি সায় দিল। আজ সত্যি সে বড় ক্লান্ত, রাক্ষুসে খিদেও পেয়েছে। সে রাজি হল। তারা দুজনে ভাত রাঁধতে লাগল। উনুনে ভাত সেদ্ধ হওয়ার পরে তার একটা পাত্রে ধোঁয়া ওঠা ভাত রাখল, তারপরে সেগুলো চট্‌কে চট্‌কে দলা দলা মতন করল। সুন্দর বাস বেরিয়েছে নতুন চালের রান্নায়।

ভাত দলা দলা করে পাকানো হয়ে গেলে বানর বলল, 'বন্ধু, হাত-মুখ ধোওয়ার জন্য তো জল চাই। তুমি একটু জল নিয়ে এস।'

'ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ'। রঙিন পাখি একথা বলেই একটা পাত্র নিয়ে রান্নাঘরের পেছনে জল আনতে গেল।

যেই না রঙিন পাখি পেছন ফিরেছে, অমনি বানর পাত্র থেকে ভাতের দলাগুলো এক তাল করে, তার মধ্যে একটা লাঠি ঢুকিয়ে, লাঠি কাঁধে ফেলে রওনা দিল। সোজা হেঁটে চলল পাহাড়-পানে।

জল নিয়ে ফিরে এসে রঙিন পাখি দেখে, বানর ঘরে নেই, একরত্তি ভাতও নেই সেই পাত্রে। সব বুঝল রঙিন পাখি। পেটে খিদে, চোখে জল, ধরা গলায় সে বলল, এমন স্বার্থপর বদ্‌ বানর! হায়! হায়! এমন করে ঠকাতে হয়?'

কাঁদতে কাঁদতে রঙিন পাখি চারিদিকে খুঁজে দেখল, এপাশ ওপাশ দেখল, কিন্তু কোথাও বানরের দেখা পেল না। এত কষ্টের পরে, অনেকদিনের আধপেটা খাওয়ার পরে আজ একটু ভালভাবে খাবে ভেবেছিল, তাও হল না। বুক ঠেলে কান্না বেরিয়ে

আসছে রঙিন পাখির। সে ভাবল, 'আমার কপাল মন্দ, এমনি করেই আমাদের দিন যাবে'।

এদিকে মনের আনন্দে সেই লোভী স্বার্থপর বানর জোরে জোরে পা ফেলে পাহাড়ের ঢালু বেয়ে উপরে উঠছে। চোখদুটো চকচক করছে, জিভ দিয়ে তার জল পড়াচ্ছে। এইভাবে চলতে চলতে লাঠির ডগা থেকে কখন যে ভাতের তাল পড়ে গিয়েছে বানর তা খেয়ালই করে নি। শুধু লাঠি কাঁধে বাগিয়ে সে এগিয়েই চলেছে। 'রঙিন পাখি এখন কেমন কাঁদছে'—এই কথা চিন্তা করে মাথা দুপাশে নাড়িয়ে লেজ নাচিয়ে বানর চলেছে। পাহাড়ের একেবারে চূড়োয় এসে সে থামল। একটা চ্যাপ্টা পাথরের উপরে সে লেজ ছড়িয়ে বসল, কাঁধের উপর থেকে লাঠিটা নামিয়ে লোভী চোখে তাকিয়ে বানর আঁতকে উঠল, ভাতের তাল নেই……।

রাগে-দুঃখে চিৎকার করে বানর বলল, 'কোথায় গেল আমার ভাত?' সেই শব্দ পাহাড়ে পাহাড়ে লেগে ফিরে এল বানরের কাছে। কেমন অবাক শোনাল সেই প্রতিধ্বনি। ফিরে চলল বানর সেই পথে যে পথে সে পাহাড়ের চূড়োয় উঠেছিল। খুব তীক্ষ্ণ চোখে নজর রাখল পথের উপরে, পথের দুপাশে। কোমর বেঁকিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে বানর চলছে ছোট ছোট জুলজুলে চোখ মেলে, মুখ থেকে গজরানোর শব্দ শোনা যাচ্ছে।'

ঢালু বেয়ে অনেকটা নেমে আসার পরে বানর দেখল, একটা ঝোপের পাশে বসে রঙিন পাখি ধুলো থেকে ভাত তুলে খাচ্ছে। একমনে সে খেয়ে চলেছে।

'ও, রঙিন পাখি, তাহলে তুমি এখানে বসে আছো? ভাত খেতে কেমন লাগছে?

'ও হো! তুমি এসে গিয়েছো বানর। ধুলো-বালি সরিয়ে তুমি যদি ভাতের দলা মুখে দাও, তবে খেতে যে কি ভালই লাগবে! আহা-হা!'

'তাহলে বন্ধু আমাকে একটুখানি দাও। চেখে দেখি।' ধপ করে জ্বলে উঠল রঙিন পাখির চোখ, নখগুলো খাড়া হয়ে উঠল। সে খুব শান্তভাবে বলল, 'অনেকগুলো দলা এখানে ওখানে পড়ে রয়েছে, তুমি একটা তুলে নিয়ে ধুলোবালি সরিয়ে খেতে পার। আমি নিজে ফুঁ দিয়ে ধুলোবালি পরিষ্কার করছি আর খাচ্ছি।'

'তুমি কি করছো সেটা আমি জানতে চাই নি। আমি তোমার কাছে কিছুটা ভাল ভাত চাইছি বানর বললো।'

'আমি তোমাকে এককণাও দেব না।' অনেক সয়েছে রঙিন পাখি, আর নয়। স্পষ্ট গলায় সে জবাব দেয়।

'এই কথা? ঠিক আছে, ভালভাবে অন্ধকার নেমে আসুক, আমি আবার

ফিরে আসব। তখন দেখাবো তোমার মজা, মনে থাকে যেন।' রাগে গজগজ করতে করতে বানর পাহাড়ের দিকে হাঁটা দিল। আড়চোখে চেয়ে চেয়ে দেখল রঙিন পাখিকে।

বানর তো চলে গেল, এদিকে রঙিন পাখি বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছে। বানর তাকে শাসিয়ে গেল, আড়চোখে তাকিয়ে গেল, আলো চলে যাবার পরে আসবে বলল—এইসব চিন্তা করতে করতে রঙিন পাখির খুব মন খারাপ হয়ে গেল।

কি আর করে! ঘরে ফিরে এসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল 'উঁ উঁ'।

তার কান্না শুনে একটা ডিম গড়াতে-গড়াতে-গড়াতে রঙিন পাখির পাশে এসে থামল। বলল, 'ও রঙিন পাখি, কি হয়েছে ভাই তোমার, এমনি করে কাঁদছ কেন?'

'বানর আমাকে শাসিয়ে গিয়েছে, অন্ধকার নেমে এলেই সে আসবে আর আমার মজা দেখাবে। আমি এখন কি করি, তাই কাঁদছি।'

'কিচ্ছু ভেবো না তুমি, আমি তোমায় সাহায্য করব। কিচ্ছু ভেবো না।' ডিম তাকে বলল।

তবু কাঁদছে রঙিন পাখি। দরজা বন্ধ করার লম্বা লাঠি লম্বা পায়ে এগিয়ে এসে রঙিন পাখিকে বলল, 'ও রঙিন পাখি, কি হয়েছে ভাই তোমার, এমনি করে কাঁদছ কেন?'

'না কেঁদে কি-ই বা করি বল! অন্ধকার হলেই বানর আসবে আর আমার মজা দেখাবে। আমি এখন কি করি, তাই কাঁদছি।'

'আমিও তোমায় সাহায্য করব, তুমি কিচ্ছু ভেবো না। আর কেঁদো না।' দরজা বন্ধ করার লম্বা লাঠি তাকে বলল।

তবুও কাঁদছে রঙিন পাখি। তার কান্না শুনে এগিয়ে এল একটা কেন্নো, একটা ছারপোকা, আর একটা মাদুর-বোনা লম্বা মোটা সূচ। তাদের আসতে দেখে এগিয়ে এল ঘোড়ার খাবার-রাখা পাথরের জালা আর একতাল গোবর। তারা সবাই বলল, 'রঙিন পাখি, রঙিন পাখি, আর তো তোমার কান্নার কিছু নেই। তুমি বিপদে পড়েছো, তাই আমরা সবাই মিলে তোমাকে সাহায্য করব। এটা যে করতেই হবে। তুমি আর কেঁদো না।'

সূর্য ডুবে গেল। তখনও আকাশের এক কোণে আলোর ছটা। সে আলোর ছটাও মিলিয়ে গেল একসময়। চারিদিকে অন্ধকার নেমে এল।

এরা সবাই তৈরি হয়ে নিল। দুষ্টু শত্রুকে মজা দেখাতে হবে। দরজা ভেজিয়ে লম্বা লাঠি পাশে দাঁড়িয়ে রইল, ডিম ঢুকে পড়ল উনুনে, সূচ উনুনের সামনে মুখ উঁচু করে দাঁড়াল, কেন্নো জলের কেতলির মধ্যে ভাসতে লাগল, ছারপোকা সয়াবীনের

নোনতা তরকারির মধ্যে চুপ্‌টি করে বসে রইল, বাগানে যাওয়ার দরজার সামনে গোবর ছড়িয়ে পড়ল আর পাথরের জালা ছাদে উঠে কড়িকাঠে বসে রইল। নিঃশ্বাস বন্ধ করে তারা সবাই বানরের আসার অপেক্ষায় চুপ করে থাকল।

নিকষ কালো অন্ধকার। চারিদিকে কিছুই দেখা যায় না। কোনো শব্দও নেই আশেপাশে।

এমন সময় দূর থেকে তারা বানরের বাজখাঁই গলা শুনতে পেল। 'রঙিন পাখি, আমি ঠিক এসে গিয়েছি, এবার তোর মজা দেখাচ্ছি। রঙিন পাখি, তুই হতচ্ছাড়া কোথায়?'

দরজার কাছে এল বানর। সাড়া নেই শব্দ নেই, অন্ধকার নিঝুম বাড়ি। 'রঙিন পাখি, দোর খোল, আমি সেই বানর, এখন এসে গিয়েছি। আমি তোর হতচ্ছাড়া মজা দেখাচ্ছি।' যত জোরে পারে বানর চিৎকার করতে লাগল।

তবু কেউ সাড়া দিল না। 'তুই নিজেই দোর খুলবি, না আমি দোর ভেঙে ফেলব? যাই কর না কেন, আমি ভেতরে ঢুকে তোকে মজা দেখাব কেউ রুখতে পারবে না।' এই না বলে বানর দড়াম করে মারল এক লাথি। দরজা ভেজানো ছিল, ক্যাঁচ করে শব্দ হয়ে দরজা গেল খুলে। আর খোলা দরজায় যেই না বানর মাথা গলিয়েছে, অমনি লম্বা লাঠি গায়ের জোরে তার মাথার উপরে এসে পড়ল।

'কে? কে? কে আমার মাথায় মারল? উঃ, বড্ড শীত করছে।' বানর তাড়াতাড়ি উনুনের কাছে গেল, নিভন্ত উনুনে ফুঁ দিল। অমনি ডিম গেল ফেটে, গরম কুসুম তার মুখে লেপটে গেল। 'উঃ, পুড়ে গেলাম।' বলেই বানর পেছনে পড়ে গেল। সেখানে সূচ ছিল উঁচিয়ে, ফুটে গেল বানরের পাছায়। 'মুখ পুড়েছে, পাছা কেটে রক্ত ঝরছে- সয়াবীনের ঠাণ্ডা তরকারি লাগালে আরাম লাগত'—এই না বলে বানর সয়াবীনের তরকারি আনতে পাশে গেল। তাড়াতাড়িতে পাছায়-মুখে না লাগিয়ে লোভী বানর তা মুখে পুরে দিল, কামড় বসালো ছারপোকার গায়ে। 'ওঃ, কি বিচ্ছিরি গন্ধ, কি তেতো'—চিৎকার করে মুখে জল দিতে কেতলির কাছে গেল বানর। জল মুখে ঢালতেই সুড়ুৎ করে কেন্নো বেরিয়ে তার মুখে ঢুকে গেল আর বানরের জিব প্রাণপণে কামড়ে দিল।

'হায় হায়! আমি এসেছিলাম রঙিন পাখিকে মজা দেখাব বলে, আর এখন হতচ্ছাড়া রঙিন পাখিই উল্‌টে আমাকে মজা দেখাচ্ছে। এমন তো হওয়ার কথা ছিল না। হায়! হায়!' এ আমার কি হল?, গলা ছেড়ে কাঁদতে লাগল সেই দুষ্টু বানর।

'এখন আর না, পালাতে হবে এখান থেকে।' অবাক হয়ে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে

বানর বাগানের দরজা দিয়ে পালাতে গেল। পথে ছিল লেপটানো গোবর। সড়াৎ করে উল্‌টে পড়ল বানর, চিৎপাত হয়ে দড়াম করে মেঝেতে আছাড় খেল।

'এইবার আমার পালা। এইবার বানরকে উচিত শিক্ষা দেব আমি। লোভী বানরকে শেষ করব আমি।' ভাবি মোটা গলায় চিৎকার করে উঠল কড়িকাঠে বসে-থাকা সেই পাথরের জালা। গড়িয়ে পড়ল সে সেখান থেকে, সোজা এসে পড়ল বানরের শক্ত মাথায়। মাথা গেল কেটে আর একবার নড়েই বানর গেল মরে। বানরকে মজা দেখাবার সব কাজ শেষ হল।

কথা শেষ, বিক্রি শেষ।

অভিপ্রায়

আদিম সাম্যবাদী সমাজ বিবর্তনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভেঙে যাওয়ার পর থেকে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় গ্রামীণ মানুষ বুঝেছেন, 'কেউ মরে বিল ছেঁচে কেউ খায় কই'। যারা দেহের ঘাম-রক্ত ঝরিয়ে ফসল ফলায়, জমি চাষ থেকে শুরু করে সোনালী ফসল কাটা পর্যন্ত হাড়-ভাঙা পরিশ্রম করেন সেই কৃষক পান উচ্ছিষ্ট অন্ন, আর ফসলের আঁটি জমা পড়ে সামন্তপ্রভুর গোলায়। যে মুহূর্তে ফসলে দেশ পূর্ণ সেই মুহূর্ত থেকেই প্রতিটি কৃষকের হাঁড়ি প্রায় শূন্য।

এই পরিশ্রমের করুণ ছবি ফুটে উঠেছে রঙিন পাখির কাজকর্মে আর ফসলের দাবিদার হয়েছে অলস এবং বাক্‌পটু বানর। অলস মানুষ কর্মহীনতার অনেক অজুহাত তোলে কিন্তু পরিশ্রমী কৃষক কাজের মধ্যেই জীবনের সার্থকতা খুঁজে পান। খাওয়ার মুহূর্তেই স্বার্থান্বেষী এইসব মানুষ সাধারণ গরিবের মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে যেমন পটু তেমনি হৃদয়হীন।

এই পর্যন্ত গল্পের একটি অংশ। মনের ক্ষোভ মাঝে মধ্যে ফেটে পড়ে, ক্ষোভের আগুনে সুযোগ-সন্ধানী মানুষ পুড়ে মরে। আর যেখানে বিক্ষোভ প্রকাশ সম্ভব নয়, সেখানে বঞ্চিত মানুষ কল্পনায় গল্পের মধ্যে শ্রেণীশত্রুর বিরুদ্ধে ঘৃণাবশতঃ প্রতিশোধ নেন। এতেও কিছুটা আত্মতৃপ্তি। কিন্তু যেহেতু শত্রু কৌশলী এবং বলশালী, তাই সংগঠিত মিলিত প্রতিরোধের প্রয়োজন হয়েছে। যারা রঙিন পাখিকে সাহায্য করেছেন তারা সকলেই পোড়-খাওয়া অতি সাধারণ তুচ্ছ প্রাণী। প্রাণের তাগিদে এবং একই শোষণে জর্জরিত হয়েই তারা যৌথ আক্রমণ চালাতে বাধ্য হন। সমষ্টির বিন্দু বিন্দু

শক্তিতে বলীয়ান হয়ে তারা বানরকে হত্যা করেছেন। কি প্রচণ্ড ঘৃণা বানরের প্রতি! তাই নিরুত্তাপভাবে তার মৃত্যু দেখানো হয়েছে। কোনো বেদনার অনুভূতি নেই, মৃত্যুতে কোনো চাঞ্চল্য নেই। এইভাবেই সাধারণ মানুষ তার ইচ্ছাকে প্রকাশ করে থাকেন। অত্যাচারীর প্রতি বিদ্বেষ ঘৃণা এবং ক্রোধ প্রকাশের এক আন্তর্জাতিক মানসিকতা এই পশুকথাটিতে রূপ পেয়েছে।

তুরস্ক

দেশ পরিচয়

তুরস্কের অবস্থান খুব বিচিত্র। এই দেশের কিছুটা অংশ ইউরোপে যদিও বেশির ভাগ অংশই এশিয়ায়। ইউরোপের সীমান্তে রয়েছে বালগেরিয়া ও গ্রীস। উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিনদিকে ব্ল্যাক-সি ঈজিয়ান এবং ভূমধ্যসাগর। স্থলপথে পূর্ব ও দক্ষিণে রয়েছে ইরান ইরাক সিরিয়া ও সোভিয়েত ইউনিয়ন। দেশের মধ্যভাগে রয়েছে এক বিরাট মালভূমি। সেখানে গ্রীষ্মে প্রখর তাপ, শীতকালে থাকে বরফ ঢাকা। পূর্বে রয়েছে উঁচু উঁচু পাহাড় এবং উপত্যকা আর সুন্দর সুন্দর পশুচারণ ভূমি।

প্রাকৃতিক কারণেই এখানকার মানুষ অত্যন্ত পরিশ্রমী, স্বভাবে সংগ্রামী। এক-চতুর্থাংশে মাত্র কৃষিকাজ হয়, অধিক অংশে পশুপালনই মূল জীবিকা। বনভূমি রয়েছে, সেখানে রয়েছে জলাভূমি তাই সেখানকার মানুষের জীবনও বৈচিত্র্যে ভরা।

এই সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে অনন্যসুন্দর সমস্ত লোককথার জন্ম দিয়েছেন এখানকার কৃষক পশুপালক এবং নাবিকগণ। দীর্ঘদিন থেকে দূর দূর অংশের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটায় তাদের গল্পসম্ভারে এসেছে বিপুল বৈচিত্র্য। গ্রামীণ সারল্য ও যাযাবর জীবনের টুকরো টুকরো চিত্রে লোককথাগুলি তুরস্কের মানুষের এক অনবদ্য সৃষ্টি, যদিও সংখ্যায় এগুলো বেশ কম। প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি প্রবল আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও তারা নতুন জীবনধারাকে গ্রহণ করে দেশকে সমৃদ্ধশালী করে তুলেছেন। আধুনিক নগর সভ্যতার পাশাপাশি তাই রয়েছে গ্রামীণ সংস্কৃতি। বহু যুদ্ধের সাথী এই জাতি। ১৯২৩ সাল থেকে তুরস্ক একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র। লোকসংখ্যা ২৭, ৮০৯, ৮৩১ জন। দেশের এলাকা ২৯৬,১৮৫ বর্গ মাইল এবং এর মধ্যে ৯,০০০ বর্গ মাইলের সামান্য বেশি ইউরোপ ভূখণ্ডের মধ্যে।

পশুকথা

তিনটি খরগোশ

অনেক অনেক কাল আগের কথা। সেই সময়ে তিনটি বাচ্চা খরগোশ ছিল। গভীর লম্বা সুড়ঙ্গের বাড়িতে তারা তাদের বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকত। যখন তাদের বয়স এক মাস হল, তখন বাবা তাদের তিনজনকেই ডাকল।

বাবা বলল, 'আমার সোনা ছেলেরা, খুব মন দিয়ে শোনো। যা বলছি তা ভালভাবে বুঝতে চেষ্টা কর।'

তিনজনেই লম্বা কান আরও খাড়া করে মন দিয়ে শুনতে লাগল তাদের বাবার কথা।

বাবা খরগোশ পা দিয়ে কান চুলকে, দু'তিনবার ওপরের ঠোঁট ছুঁচলো করে বলল, 'বাছারা, তোমরা এখন বেশ ডাগর-ডাগর হয়েছ। আজ তোমাদের জীবনে এক মাস বয়স পূর্ণ হল। কাল থেকে দ্বিতীয় মাস শুরু হবে। আজ রাতে অথবা কাল-ই তোমাদের নতুন ভাইবোনের জন্ম হবে বুঝতেই পারছ, আমাদের এই গর্তের বাড়িতে তখন সকলে মিলে থাকতে পারব না। এত জায়গা কোথায়। তাই তোমাদের তিনজনকেই এই বাড়ি ছাড়তে হবে। নিজেরা নিজেদের বাড়ি করে সেখানে চলে যাও। এটাই খরগোশ সমাজের রীতি, এটাই আমাদের নিয়ম। যেমন দেখ তোমার মা আর আমি যখন এক মাসের জোয়ান হলাম তখন আমরাও বাবা-মার বাড়ি ছেড়ে নিজের নিজের বাড়ি তৈরি করেছি। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবে। সব সময়-ই মনে রাখবে। আমাদের বাড়ির খুব কাছে কাছে নিজেদের বাড়ি বানাবে। তাতে সব সময় দেখা-শোনা হবে, বিপদে আপদেও একা পড়তে হবে না। সব বুঝে নিয়েছ তো?'

এইসব কথাবার্তা বলে বাবা খরগোশ চলে গেল লাফাতে লাফাতে। বাচ্চা তিনটি একা রইল। কিছুক্ষণ তারা নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করল। শেষকালে বাবা-মাকে বিদায় জানিয়ে গর্ত থেকে বেরিয়ে এল। একটুখানি সেখানে দাঁড়িয়ে তিনজনে চলে গেল তিনদিকে।

বড় বাচ্চাটা নিজে নিজেই বলল, 'নাঃ, আমি বাবা-মার মত ঐ রকম গর্তে থাকতে পারব না। অন্ধকার, আলো নেই ঐ রকম বাড়িতে যদি থাকি তবে একেবারে অসুখ-বিসুখ হয়ে যাবে। এতদিন কোনোরকমে ছিলাম। অনেক হয়েছে, আর না। বাইরে কি সুন্দর হাওয়া, গাছের পাতা নড়ছে, মন খুশিতে ভরে উঠছে। যে জায়গাটা আমার সবচেয়ে বেশি মনে ধরবে সেখানেই আমি একটা সুন্দর ছোট্ট কুটির তৈরি করব। ঘন বনের পাশে ঝোপঝাড়ের মধ্যে, গুচ্ছ গুচ্ছ লতাপাতার আড়ালে আমি এই বাড়ি বানাব। আর সেখানেই আমি থাকব। ভাবতেই আনন্দ লাগছে। যখন আমার খিদে পাবে, বাড়ি থেকে বেরিয়ে পেট ভরে মনের আনন্দে খাব। বাড়ির বারান্দায় বসে থাকব, কখনও জানালা দিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত তাকিয়ে তাকিয়ে দেখব। জীবনকে আনন্দে ভরে তুলব।'

যা ভাবা সেইমত কাজ। খরগোশ পাতা, শুকনো-শেওলা, গাছের ডালপালা

বন ঝোপ, জঙ্গলের ঝাড় ও অন্যান্য নানান দরকারী জিনিসপত্র ঘুরে ঘুরে যোগাড় করল। সব কিছু এক জায়গায় এনে রাখল সে। তারপর মনের মতন করে সুন্দর সাজানো বাড়ি বানাল। বাড়ির মধ্যে গিয়ে তিন-চারবার লাফ দিল, সরু গলায় একটু গান গেয়ে নিল। তিড়বিড়ে খরগোশ খুশিতে অনেকক্ষণ পায়চারি করল, জানালা দিয়ে দূরে তাকাল। এমন সময় পেটের মধ্যে যেন কেমন মোচড় দিয়ে উঠল। সারাদিন খেটেছে, এখন বড়ই খিদে পেয়েছে। তাই বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোথায় খাবার খুঁজবে, ঝোপের পাশে বসে কি খাবে এইসব চিন্তা করছে, এমন সময় অন্য একটা ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল একটা খেঁকশিয়াল।

গলায় মধু মাখিয়ে খেঁকশিয়াল বলল, 'ওঃ তুমি খরগোশ, সুন্দর লোমশ খরগোশ! ভয় পেয়োনা আমায়। আমি তোমার কোনো ক্ষতি করব না। তুমি পালিয়ে যেয়ো না, বরং এসো আমরা দুজনে একটু গল্প-গুজব করি।'

কিন্তু খরগোশ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, 'ওরে দুষ্টু খেঁকশিয়াল, তোর চোখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে তোর মন কি চায়। তুই মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে আমাকে ধরে ফেলবি আর মজা করে খাবি। কিন্তু সেটি হচ্ছে না।'

তিড়িং করে তিন লাফ মেরে সুড়ুৎ করে খরগোশ তার বাড়িতে উঠে পড়ল। বাড়ির মধ্যে ঢুকে সে লুকিয়ে রইল।

খেঁকশিয়াল পিছে ধাওয়া করে খরগোশের বাড়ির নিচে এল। তাকিয়ে দেখল সেই বাহারে বাড়ি, আর এক হ্যাঁচকা টান মারল খুঁটি ধরে। হুড়মুড় করে পড়ে গেল সেই পল্‌কা বাড়ি। আর ছিট্‌কে পড়ল সেই খরগোশ। ঝাঁপিয়ে পড়ল দেঁতো খেঁকশিয়াল, টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে খেল খরগোশের সুস্বাদু নরম মাংস। এইভাবেই বিলাসী অসতর্ক খরগোশের বোকামির শেষ হল।

মেজ খরগোশ পথের পাশে বসে নিজের মনেই বলল, 'কি করতে হবে তা আমি বেশ বুঝি। অন্ধকার গর্তে দিন-রাত থেকে থেকে আমি একেবারে মরে গেছি, কিচ্ছু ভাল লাগে না। আমি গাছের গুঁড়িতে সুন্দর একটা বাসা বানাব।'

যা ভাবা সেইমত কাজ। সে লতাপাতা, খড় শেওলা আর টুক্‌রো টাক্‌রা ডাল নিয়ে এসে গাছের গোড়ায় রাখল। তারপর সেই গাছের গুঁড়িতে সুন্দর একটা বাসা বানাল।

কাজকর্ম শেষ হলে তার খুব খিদে পেল। সে বেড়িয়ে এল বাসা থেকে। গাছের তলায় বসে ভাবল, 'এখন কিছু খাবার খুঁজি'। আর এদিক।ওদিক তাকাতেই সে দেখতে পেল একটা খেঁকশিয়াল তার খুব কাছেই বসে আছে।

গলায় মধু মাখিয়ে চালাক খেঁকশিয়াল বলল, 'ওঃ তুমি খরগোশ, লোমে-ভরা

সুন্দর দেহ তোমার ! তুমি ভয় পেয়ো না, আমাকে দেখে পালিয়ে যেয়ো না। আমি তোমায় কিছু করব না। এসো, একটু গল্প-গুজব করা যাক।'

চিৎকার করে খরগোশ বলল, 'ওরে দুষ্টু খেঁকশিয়াল ! তোকে আমি চিনি না ভাবছিস্ ? তুই কি জন্য এসেছিস্ তাও আমি জানি। তুই ভুলিয়ে-ভালিয়ে আমাকে খেতে চাস্। কিন্তু সেটি হচ্ছে না, আমায় তুই ধরতেই পারবি না।'

এই না বলে তিন লাফে দৌড় দিল সেই খরগোশ, সুড়ুৎ করে ঢুকে পড়লো তার বাসাতে। বাসাতে ঢুকতে দেখেই খেঁকশিয়াল আড় চোখে তাকিয়ে ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করে হাসতে লাগল। এই তার পালাবার জায়গা !

'ওরে বোকা খরগোশ, তোর মজা দেখাচ্ছি। আমি তোকে একেবারে গিলে ফেলব।' খেঁকশিয়াল গুটি গুটি এগিয়ে আসছে, হেলে-দুলে আসছে।

একটু পরেই গাছের নিচু গুঁড়িতে সামনের দু'পা তুলে দিল সেই খেঁকশিয়াল, টান মারল খড়, শেওলা, লতাপাতা। ঝুরঝুর করে ভেঙে পড়ল সেই বাড়ি। মাঝখানে বসে কাঁপছে সেই খরগোশ। এক থাবায় তাকে মাটিতে ফেলে দিল খেঁকশিয়াল। নরম তুলতুলে মাংস খেয়ে সে লম্বা জিভ বের করে চাটতে লাগল।

হায় খরগোশ ! বোকা খরগোশ একবারও ভাবল না, যে সব বাসা পাখির জন্য ভাল, তা খরগোশের কোনো কাজে লাগে না। পাখির বাঁচার যে পথ আছে, খরগোশের তা নেই।

ছোট্ট খরগোশ নিজের মনে বলল, 'বাবা-মার বাড়ির কাছেই গর্ত খুঁড়ে আমার বাসা বানাব। কিন্তু আমার সুড়ঙ্গ হবে আরও গভীর, আরও লম্বা—অনেকদূর পর্যন্ত যাতে ঢুকে যেতে পারি। সেখানে থাকলে আমার কোনো বিপদ-আপদ হবে না, শত্রুর হাত থেকে বাঁচতেও সুবিধে হবে।'

যা ভাবা সেইমত কাজ। ছোট্ট খরগোশ নিজের কাজে লেগে গেল। দিনরাত সে খাটছে। একটু জিরিয়ে নেয়, আবার কাজে লাগে। বেশ কয়েকদিন পরে তার বাড়ি বানানো শেষ হল। এ বাড়ি মাটির নিচে অনেক গভীরে এঁকে বেঁকে অনেকদূর গিয়েছে। কোনো ভয় নেই, খুব নিরাপদ তার বাড়ি। বাড়ির সুড়ঙ্গে বসে খুব নিশ্চিন্ত হল ছোট্ট খরগোশ।

কয়েকদিনের খাটাখাটুনিতে আজ সত্যিই তার খুব খিদে পেয়েছে। গর্ত থেকে বেরিয়ে সে পাশের ফসল-ক্ষেতে গেল। কুট্-কুট্ খাচ্ছে আর এদিক-ওদিক চাইছে খরগোশ।

এমন সময় দেখে কিছুদূরে দাঁড়িয়ে এক খেঁকশিয়াল। চালাক খেঁকশিয়াল গলায় মধু মাখিয়ে বলল, 'ওঃ খরগোশ ! কি সুন্দর লোমে-ঢাকা তোমার নরম দেহ !

তোমায় আমি কিছু করব না। ভয় পেয়ো না। এসো, একটু গল্প-গুজব করা যাক।'

ছোট্ট খবগোশ তার দাদাদের চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান। দৌড দেওয়ার ভঙ্গিতে তৈরি হয়ে সে বলল, 'তুই দুষ্টু শয়তান খেঁকশিয়াল। চোখা-নাক খেঁকশিয়াল। তোব সব কায়দা-কানুন আমি জানি। তুই কি ভাবিস্ আমি কিছু খবর রাখি না? কালকেই তুই আমার এক দাদাকে মেবে খেযেছিস্। হতচ্ছাড়া, তাই বলে তুই ভাবিস্ না আমাকেও ধরতে পাববি। আমি তোকে ধবা দেব না।'

কথা শেষ হতেই ছোট্ট লেজ নাড়িয়ে, কান খাড়া কবে দে-দৌড সেই খরগোশ। একবাবও পেছনে তাকালো না সে। পাছে সময় নষ্ট হয়, দৌড কমে যায়। লাফিয়ে-দৌড়ে বিদ্যুতের মত সে ঢুকে পড়ল তার গর্তে। আঁকাবাঁকা পথ ধবে অনেকক্ষণ চলে খরগোশ পৌঁছে গেল তাব বাড়ির শেষ প্রান্তে। এখন ভয় নেই। জোরে জোরে নিঃশ্বাস পডছে কিন্তু বিপদ কেটে গিয়েছে। নিশ্চিন্তে বিশ্রাম কবতে লাগল ছোট্ট খরগোশ।

তাড়া করে খেঁকশিয়ালও এল তার বাড়ির মুখে। কিন্তু গর্ত ছোট, সে ঢুকতে পাবল না। অনেকক্ষণ বসে রইল গর্তেব মুখে, যদি ভুল করে বোকামি করে বেরিয়ে আসে খবগোশ। কি আব কবে? খেঁকশিযাল অন্য জায়গায় চলে গেল খাবার খুঁজতে। বুঝল, এ খবগোশকে ধরা যাবে না।

ছোট্ট খবগোশ কিন্তু তাদেব নিজেদেব মত কবে বাড়ি বানিয়েছিল। তাই খেঁকশিয়াল, কুকুর আব অন্য শত্রুদের এড়িযে মনের সুখে নিশ্চিন্তে সে দিন কাটাতে লাগল।

অভিপ্রায়

মানুষ প্রাকৃতিক ও সামাজিক নানা প্রতিকূলতাব মধ্যে বাস করে। আবার এইসব প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করবার অভিজ্ঞতাও তারা সঞ্চয় কবেছে। পুরুষানুক্রমে অর্জিত এই অভিজ্ঞতাকে উত্তরপুরুষে সঞ্চারিত করে যায় তারা। এবং এই অভিজ্ঞতা জীবনে বেঁচে থাকবার ক্ষেত্রে অত্যন্ত মূল্যবান। যারা এই অভিজ্ঞতাকে বর্জন করে, তাদের সমূহ বিপদ। আবার প্রত্যেক গোষ্ঠীরই নিজস্ব প্রতিরোধ-ব্যবস্থা রয়েছে, ধূর্ত মানুষের হাত থেকে এই ব্যবস্থা তাকে রক্ষা কবে চলে।

বাবা-মার সংসার বড় হয়ে গেলে কিংবা ছেলে-মেয়ে বড হলে সাধারণ নিয়মেই তাদের আলাদা সংসার করতে হয়। এটা সামাজিক নিয়ম। অতি সুন্দরভাবে

এই চিত্রটিই ফুটে উঠেছে এখানে। কিন্তু একই গোষ্ঠীর মানুষ, তাই কাছে কাছে থাকতে হবে। সংসার আলাদা হলেও গোষ্ঠীর স্বার্থেই একে অপরের সাহায্যে এগিয়ে আসার প্রয়োজন রয়েছে। একা মানেই শুধু নিঃসঙ্গ নয়, অসহায়ও বটে।

বড় ভাই দুটি চতুর, তারা শত্রুকেও চেনে। ধূর্ত শেয়ালকে দেখে পালিয়েছেও। কিন্তু বাসস্থানের জন্যই তাদের মরতে হল। দুর্গ সুরক্ষিত নয়, তাই বিপদে সহজেই তারা অসহায় হয়ে পড়ল। শত্রু যেখানে বলবান হয়, প্রতিআক্রমণ চালানো যেখানে অসম্ভব, সেখানে বুদ্ধির জোরে ও লুকোবার কৌশলে শত্রুকে নাজেহাল করতে হবে। সেটিই তার অস্ত্র। আত্মরক্ষার সুব্যবস্থা আগে দরকার।

পিতা-মাতার অভিজ্ঞতাকে মূলধন করে উত্তরপুরুষকে আরও এগিয়ে যেতে হয়। সমাজের বিকাশও এভাবেই ঘটে চলে। তাই বাবার চেয়ে আরোও গভীর ও লম্বা গর্ত খুঁড়েছে ছোট্ট খরগোশ। তার প্রতিরোধ-ব্যবস্থাকে সে আরও উন্নত করে তুলেছে। এইখানেই তার সার্থকতা, এইভাবেই সে এগিয়ে চলে।

প্রয়োজনের দিকে না তাকিয়ে যারা শুধু সৌখিনতার প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাদের পরিণতি সমাজে বড় করুণ। প্রথমে দরকার সুরক্ষিত এমন ব্যবস্থা যা প্রতিকূলতা থেকে বাঁচাবে। নিছক বিলাস জীবনকে সর্বনাশের পথে নিয়ে চলে।

বার্মা

দেশ পরিচয়

পর্বত বনভূমি স্রোতস্বিনী নদী ও অপরূপ প্যাগোডার দেশ বার্মা। ইরাবতী ও অন্যান্য বহু নদী দেশের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে, দেশকে প্রাকৃতিক রূপে-ঐশ্বর্যে ভরে তুলেছে। দক্ষিণে ও পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে ভারত-বাংলাদেশের সঙ্গে যোগ রয়েছে, উত্তরে আছে তিব্বত-চীন, আর পূবে থাইল্যাণ্ড। দেশের পূর্বদিকে বিশাল ঘন বনভূমি রয়েছে।

প্রাকৃতিক সম্পদে বার্মা সমৃদ্ধময়। ধান চা তুলো গম রবার এবং তামাক প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। আর রয়েছে উন্নত ধরনের সেগুন কাঠ। খনিজ পদার্থও পর্যাপ্ত। পেট্রোল পাওয়া যায় প্রভূত পরিমাণে দক্ষিণাংশে টিন ও উত্তরাংশে রূপো এবং নানাস্থানে টাংস্টেন পাওয়া যায়। এছাড়া পাওয়া যায় পদ্মরাগ মণি, নীলকান্ত মণি প্রভৃতি মূল্যবান পাথর।

এই অফুরন্ত প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বার্মার অধিকাংশ কৃষক শ্রমিক ও কাঠুরেরা দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করেন। বিশাল সম্পদ দেশের মুষ্টিমেয় কিছু ধনী ও বিদেশী বণিকেরা কুক্ষিগত করে রেখেছে।

গোটা দেশের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন সামন্তপ্রভু রাজত্ব করত। দীর্ঘ রক্তক্ষয় এবং অর্থক্ষয়ের পর ১৮৮৬ সালে বার্মা ইংরেজের ভারত-সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। পরে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনানুযায়ী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে স্বতন্ত্র দেশ হিসেবে বার্মা শাসিত হতে থাকে। ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারী নতুন প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির হাতে ক্ষমতা দিয়ে শেষ ব্রিটিশ গভর্ণর বিদায় নেয়।

এই দেশে নানা জাতির মানুষ বাস করে। শোষণ-অবিচার-অনিশ্চয়তা তাদের জীবনে থাকা সত্ত্বেও বার্মার জনগণ এক সুন্দর সংহত সমাজ গড়ে তুলেছে। অপরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশে জীবনের দুঃখ-বেদনার মধ্যেই অসংখ্য লোককথার সৃষ্টি তারা করেছে। ভারত ও চীনের সঙ্গে দীর্ঘদিনের নিবিড় সম্পর্ক থাকার জন্য বহু লোককথা একই আকারে তিনটি দেশে খুঁজে পাওয়া যাবে। উন্নত সংস্কৃতির ধারক এই বার্মার জনগণ তাদের অফুরন্ত লোকসংস্কৃতিকে আজও বাঁচিয়ে রেখেছেন।

দেশের এলাকা ২৬১,৭৮৯ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ১৯,২৪২,০০০ জন।

সোনালী খরগোশ ও সোনালী বাঘ

সোনালী খরগোশ একদিন সোনালী বাঘের কাছে গিয়ে বলল, 'চল, কাল সকালে আমরা মাঠে যাই। ধান কাটা হয়েছে। জমি থেকে ধানসুদ্ধ খড় যোগাড় করতে হবে।'

সোনালী বাঘ বড ভালমানুষ। সে খুব খুশি। তাহলে খরগোশ তার বন্ধু হল, কাল থেকে খুব ভাব জমে উঠবে। বাঘের প্রাণ আনন্দে নেচে উঠল।

পরের দিন পুব আকাশ লাল হতেই বাঘ তৈরি হয়ে নিল। সঙ্গে নিল কিছুটা ভাত আর কিছু রান্না-করা মাংস। তাড়াতাড়ি সে এসে গেল খরগোশের বাড়িতে। তারপর দুজনে একসঙ্গে রওনা দিল মাঠের দিকে। খরগোশও সঙ্গে নিয়েছে একটা পুঁটলি, কিন্তু তার ভেতরে রয়েছে কিছুটা বালি আর একতাল গোবর।

ভোরের মিষ্টি রোদ্দুরে বাঘ মাঠে নেমে ধানসুদ্ধ খড় যোগাড় করতে লাগল। কিন্তু খরগোশ দিব্বি খড়ের ওপর শুয়ে রইল, তার কোনো তাড়া নেই।

হঠাৎ খড়ের বিছানা থেকে উঠে বসে খরগোশ বলল, 'বাঘ, আগে আমরা খেয়েদেয়ে নি, পরে কাজ করব।' বাঘ পরিশ্রমী প্রাণী। সে বোঝে আগে কাজ, কাজ ফেলে রাখতে নেই। তাই সে কাজ করতে করতে বলল, 'আগে কিছুটা কাজ করি, পরে খাওয়া যাবে।'

খরগোশ চোখ নাচিয়ে বলল, 'তুমি যা ভাল বোঝ তাই কর। কিন্তু এটা মনে রেখো, জ্ঞানীগুণীরা বলেছেন যে আগে খায় সে মাংস-ভাত পায়, আর যে পরে আসে সে পায় গোবর আর বালি।'

কথা শেষ করেই খরগোশ লাফিয়ে চলল জমির পাশে যেখানে তাদের খাবারের পুঁটলি রয়েছে। দূরে মাঠে বাঘ নিচু হয়ে কাজ করছে, খরগোশ মজা করে তার সবটুকু মাংস-ভাত খেয়ে ফেলল। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে সে চলে গেল এক বিরাট গাছের তলায় আর ঝিরঝিরে হাওয়ায় গাছের ছায়ায় সে ঘুমিয়ে পড়ল।

মাথার ওপরে প্রচণ্ড রোদ্দুর। ঘামে নেয়ে গিয়েছে বাঘ। জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে। অনেকক্ষণ কাজ করে অনেক ধান সে যোগাড় করেছে। কাজেই ভীষণ খিদেও পেয়েছে তার। সে এগিয়ে গেল খাবারের পুঁটলির দিকে। গিয়ে দেখে তার পুঁটলি নেই, পড়ে রয়েছে শুধু খরগোশেরটা। ক্লান্তিতে চিৎকার করে বাঘ বলল, 'তুমি কি আমার মাংস-ভাত খেয়ে নিয়েছো?'

অবাক হয়ে অদ্ভুত গলায় খরগোশ বলল, 'তা কি করে হবে? আমি মোটেই

তোমার জিনিস কিছু খাই নি' কিন্তু আমি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি, কি হয়েছে তা আমি জানি। জ্ঞানীগুণীর কথা কি আর মিথ্যে হয়? একেবারে হাতেনাতে ফলে গিয়েছে। তুমি দেরি করলে আর তাই তোমার খাবার হয়ে গেল গোবর আর বালি। আমি আগেই বলেছিলাম। বল, বলেছিলাম কি না?'

সরল বাঘ খরগোশের কথাই মেনে নিল। সে কেমন করছে, তবু সত্যি ব্যাপারটা সে অস্বীকার করবে কেমন করে?

আবার মাঠে নামল বাঘ। সারা বিকেল সে একমনে কাজ করে চলল। বেশ কয়েকদিন আর পেটের চিন্তা করতে হবে না। খরগোশ কিন্তু তেমনি গাছের ছায়ায় ঘুমিয়ে রইল।

রোদ্দুর কমে এল, সূর্য ডুবু ডুবু হল, সন্ধ্যা নেমে এল। বাঘ অনেক ধানসুদ্ধ খড় জড়ো করেছে। খাটুনিতে পা কাঁপছে, কোমর ধরে গিয়েছে, ঘুমে চোখের পাতা বন্ধ হয়ে আসছে, তবু আবার আনন্দও হচ্ছে। ফসলের আনন্দ, এর চেয়ে বড় আনন্দ আর কি আছে?

খরগোশ কিন্তু একগুচ্ছ ফসলও তোলেনি বাঘ ধানসুদ্ধ খড়ের আটি পিঠে ফেলে রওনা দিল বাড়ির পথে। খরগোশ বল 'বাঘ দেখ ভাই, আমার কমন জ্বর জ্বর করছে, গা পুড়ে যাচ্ছে। আমি হাঁটতেই পারছি না। আমিটা যে কি বোকা! সারাদিন রোদ্দুরে ঘুমিয়ে আমার এই দশা হল।' ভালমানুষ বাঘ খরগোশকে বলল, 'তাতে কি হয়েছে? তুমি আমার পিঠে উঠে খড়ের ওপর বসে পড। আমি তোমায় বাড়ি পৌছে দিচ্ছি।'

কিছুদূর পথ চলার পরে খরগোশ তার লুকিয়ে-রাখা চকমকির বাক্স বের করে খড়ে আগুন ধরিয়ে দিল। বাঘের যেন কেমন সন্দেহ হল। সে হাঁটতে হাঁটতেই বলল, 'কিরকম যেন চটপট্ আওয়াজ হচ্ছে খরগোশ?'

'আর বল কেন বাঘ। তুমি তো আওয়াজ শুনছো? আমার দাঁতগুলো যে এদিকে কিড্‌মিড্ করছে, আর জ্বরে আমার সমস্ত শরীর থর্‌থর্ করে কাঁপছে।' খরগোশ কাঁপা গলায় বলল।

দেখতে দেখতে রোদে-পোড়া শুকনো খড়ে আগুন ধরে উঠল। আগুন ভালভাবে ধরতেই এক লাফে পিঠ থেকে নেমে খরগোশ পথের পাশে এক ঝোপে ঢুকে পড়ল। বাঘ কিছু বোঝার আগেই তার পিঠের চামড়া ভীষণভাবে পুড়ে গেল, জ্বালা করতে লাগল। ছোট-বড় ফোস্কায় ভরে গেল তার সারাটা পিঠ।

ফসল পুড়ে গেল। মনের দুঃখে বাঘ পথ হেঁটে চলেছে। হঠাৎ দেখতে পেল পথের পাশে বোকা বোকা চোখে খরগোশ বসে আছে। হুংকার ছেড়ে বাঘ বলল,

'ওরে শয়তান বিশ্বাসঘাতক শত্রু, আমার পিঠে আগুন ধরিয়ে দিয়ে তুই দৌড়ে পালিয়েছিস্। আর এখন দিব্যি বসে আছিস্। আমি তোর এই কাজের উচিত শাস্তি দেব। তোকে আমি মেরেই ফেলব।'

মাথা নাড়িয়ে খরগোশ বলল, 'সে কি কথা? এর আগে আমি তোমাকে কোনোদিন দেখি নি, তোমার সঙ্গে আমার পরিচয়ই ছিল না। আমি কি করে তোমার ক্ষতি করলাম? কিছু যে বুঝতেই পারছি না! তবে আমার মনে হচ্ছে, তুমি ভুল করে আমাকে বকছো। অবশ্য এর জন্য তোমাকে ভাই দোষ দিতে পারি না। আমার অনেক ভাই-বোন ভাইপো-বোনঝি আছে যারা অবিকল আমার মত দেখতে। ভুল তো তোমার হতেই পারে। কিন্তু বন্ধু, তোমার পিঠে এত ফোস্কা পড়ল কেমন করে?'

মনমরা হয়ে বাঘ বলল কেমন করে দুষ্টু খরগোশ তার এই দশা করল। খরগোশ খুব আস্তে আস্তে বলল, 'ছিঃ ছিঃ, এমন কাজও করে? যাক্‌গে, যা হবার হয়েছে। তবে আমি তোমার আরামের ব্যবস্থা জানি। তুমি পুরু বাকলের একটা গাছের গুঁড়িতে জোরে জোরে পিঠ ঘষতে থাক, দেখ কেমন আরাম পাবে। এর চেয়ে ভাল ওষুধ আর নেই।'

ভালমানুষ বাঘ, সে বিশ্বাস করতেই শিখেছে। খুঁজে-পেতে সে মোটা গুঁড়ির একটা গাছ পেল, তার বাকল এবড়োখেবড়ো কিন্তু খুব পুরু। জোরে জোরে ঘষতেই ফোস্কাগুলো গেল ফেটে, ঝর্‌ঝর্ করে পিঠ থেকে রক্ত গড়াতে লাগল। ব্যথায় বাঘের চোখ-মুখ কুঁকড়ে গেল। ভীষণ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করতে করতে বাঘ এগিয়ে চলল তার বাড়ির দিকে।

পথের পাশে বাঘ দেখতে পেল বোকা বোকা মুখ করে বসে আছে সেই খরগোশ। চোখ-ভর্তি জল নিয়ে বাঘ বলল, 'ওরে শয়তান বিশ্বাসঘাতক খরগোশ! তুই আমার এমন করলি? তোকে দেখাচ্ছি মজা। তোকে আমি মেরেই ফেলব।'

ভান করে অবাক হয়ে খরগোশ বলল, 'সে কি কথা? তোমায় তো কোনোদিন দেখেছি বলে আমার মনে হচ্ছে না। তোমার ক্ষতি আমি কেমন করে করব? বুঝেছি, তোমারই বা দোষ কি, ভুল তো হতেই পারে। আমার অনেক ভাই-বোন ভাইপো-বোনঝি যে আমারই মত দেখতে। তুমি বোধহয় গুলিয়ে ফেলেছো। যাক্‌গে।'

বাঘ কাঁচুমাচু হয়ে ক্ষমা চাইল। আহা ভালমানুষ সরল বাঘ!

খরগোশ বলল, 'যাইহোক, যা হবার হয়েছে। কিন্তু তোমার পিঠ গড়িয়ে রক্ত পড়ছে কেন ভাই?'

বাঘ তাকে সব বলল, কেমন করে খরগোশ তার এই সর্বনাশ করল। গাছের গুঁড়িতে কোম্কাগুলো ঘষতেই যে তার এমন হল।

খরগোশ দুষ্টুমি-ভরা চোখে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'ছিঃ ছিঃ, এমন কাজও করতে আছে! চিন্তা কোরোনা, এর খুব ভাল ওষুধও আছে। বন্ধু, তুমি এক কাজ কর। নদীর পাশে যে বালি রয়েছে তাতে যদি চেপে চেপে তুমি গড়াগড়ি দাও, তবে খুব আরাম পাবে।'

ভালমানুষ বাঘ বিশ্বাস করল, কেননা বিশ্বাস করতেই সে শিখেছে। নদীর কিনারে গিয়ে সে চিৎ হয়ে বালির ওপর শুয়ে পড়ল। চেপে চেপে গড়াগড়ি দিল। বালিগুলো তার ফেটে-যাওয়া নরম ফোস্কার মধ্যে ঢুকে গেল, দগ্‌দগে ঘায়ে বালির ঘষা লাগায় সে যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল। ব্যথায় গড়াগড়ি যেতে লাগল, তাতে ব্যথা আরও বেড়ে গেল।

কি আর করে! খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বাঘ চলে, পিঠ টানটান করে সে আর হাঁটতে পারছিল না। কিন্তু কিছুদূর যেতেই দেখে, বোকা বোকা চোখে পথের ধারে সেই খরগোশ বসে আছে। মরিয়া হয়ে বাঘ বলল, 'ওরে খরগোশ, এবার তুই আর রেহাই পাবি না। তোকে আমি এবার ঠিক মেরে ফেলব।'

যেন আকাশ থেকে পড়ল—এমন ভাব করে খরগোশ বলল, 'আমি তোমায় চিনি না, আগে কোনোদিন দেখিও নি। আমার মত দেখতে আমার অনেক আত্মীয়-শরিক রয়েছে, বোধহয় তুমি ভুল করে গুলিয়ে ফেলেছো। আমি তো কিছুই জানি না! কিন্তু সে যাক্‌গে! বন্ধু, তোমার পিঠে এমন ভয়ানক ঘা হল কেমন করে? ইস্, একেবারে সাংঘাতিক হয়ে উঠেছে ওগুলো। তবে তোমার ভাগ্য খুব ভাল, আমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমি একটা কুয়োর খোঁজ জানি, সে কুয়োর কাছে তুমি যা চাইবে, যা ইচ্ছা করবে তাই পাবে। সে কুয়ো ইচ্ছাপূরণ-কুয়ো। তুমি তার কাছে গিয়ে বল, তোমার ঘা এখুনি সেরে যাবে।''

ভালমানুষ বাঘ। ব্যথায় সে কষ্ট পাচ্ছে। সে অনুরোধ করল খরগোশকে, 'ভাই তুমি সত্যি খুব ভাল। কিন্তু আমি তো সে কুয়ো চিনি না! তুমি আমায় নিয়ে যাবে ভাই?'

'আমার পেছনে পেছন এস।' বাঁকা চোখে খরগোশ বলল।

খরগোশ বাঘকে একটু দূরের একটা কুয়োর পাশে নিয়ে গেল। 'বাবা তুমি কুয়োর মধ্যে তাকাও, নিচে তাকিয়ে তুমি তোমার ঘা সারাবার ইচ্ছে জানাও। খুব মন দিয়ে তাকিয়ে তবেই বর চাইবে।' খরগোশ তাকে আদেশের সুরে বলল।

আহা! ভালোমানুষ বাঘ! বাঘ মন দিয়ে তাকিয়ে রয়েছে সেই কুয়োর মধ্যে।

এইবার তার ইচ্ছেটা সে জানাবে। হঠাৎ আচমকা পেছন থেকে ধাক্কা মারল সেই খরগোশ। অন্যমনস্ক ছিল সোনালী বাঘ, তার মন ছিল কুয়োর মধ্যে। প্রচণ্ড শব্দ হল, ছিট্‌কে পড়ল কিছু জল, বাঘ ডুবে গেল। বাঁচবার চেষ্টা করল অল্পক্ষণ, তারপর কুয়োর ভেতর থেকে আর কোনো শব্দ বেরুলো না।

সোনালী খরগোশ এইরকমই। আগে অনেক কষ্ট দিল, ভীষণ যন্ত্রণা দিল—শেষকালে ভালমানুষ সরল-বিশ্বাসী সোনালী বাঘকে সে মেরে ফেলল। এরা এমনই হয়!'

অভিপ্রায়

প্রতি সমাজেই কিছু মানুষ থাকে যারা অলস অথচ হৃদয়হীন। জটিল সমাজব্যবস্থায় বিচিত্র সব মানসিকতার মানুষের দেখা মেলে। অন্যের পরিশ্রমে একদল মানুষ জীবন কাটাতে চায়, অন্যকে বিপদে ফেলে কিংবা দৈহিক পীড়ন ও নির্যাতন করে তারা আনন্দ পায়। অন্য গোষ্ঠীর মানুষের প্রতিই এই ধরনের মনোভাব বেশি সক্রিয় থাকে। এও একধরনের শোষণের মনোভাব।

সোনালী খরগোশ পরিশ্রম করল না, সোনালী বাঘের খাবারও সে খেয়ে নিল, তারপর নানাভাবে অত্যাচার করে তাকে সে হত্যা করল। খেটে-খাওয়া মানুষ সরল-বিশ্বাসী, বিশ্বাস করতেই সে শিখেছে। বাঘ তাই বারবার পর্যুদস্ত হয়েছে খরগোশের শয়তানী মতলবের কাছে।

যারা অত্যাচার করে, শোষণ-নিপীড়ন যাদের শ্রেণী-স্বভাবে পরিণত হয়েছে, তাদের দেখতে কিন্তু একইরকম। মানুষ তার সামাজিক অভিজ্ঞতায় বুঝেছে, শোষকের শোষণের প্রকাশ বিচিত্র হলেও স্বভাবে সে এক। সব খরগোশকে একইরকম দেখতে—বাঘের এ অভিজ্ঞতা বড় নির্মম। গল্পের শেষে কথক বলেছেন, 'সোনালী খরগোশ এইরকমই। এরা এমনই হয়!' নিপীড়িত মানুষের সুদীর্ঘদিনের সামাজিক অভিজ্ঞতার এটা এক বাস্তব প্রকাশ। এদের হাতে যুগ যুগ ধরে মানুষ অসহায় বাঘের মতন শুধু মৃত্যুর পথেই এগিয়ে চলেছে।

সাধারণ মানুষের যে অটুট সম্পদ তার শ্রমশক্তি, সেটাও বাঘের ফসল তোলার মধ্যেই ফুটে উঠেছে। খালি পেটে প্রখর রোদ্দুরেও সে কাজ করে চলে। ফসলের ক্ষেতের পাশে তার সারাদিনের আহারের সামান্য খাদ্যবস্তু থাকে পুঁটলিতে বাঁধা। শুধু বার্মা নয়, প্রতি দেশের লক্ষ কোটি কৃষকের দৈনন্দিন জীবনের এটা এক বাস্তব চিত্র।

চীন

দেশ পরিচয়

এশিয়ার এক-চতুর্থাংশ জুড়ে অবস্থিত বিশাল দেশ চীন। বিচিত্র ভৌগলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ এই দেশকে মনোরম করে তুলেছে। পৃথিবীর প্রাচীনতম দেশগুলির একটি, অথবা অনেকের অভিমত সবচেয়ে প্রাচীন দেশ হল চীন।

দেশের অভ্যন্তরে ও চারপাশে রয়েছে গভীর অরণ্যভূমি, সুউচ্চ পর্বতমালা, বিশাল মরুভূমি। পশ্চিম সাইবেরিয়ার অনুর্বর প্রান্তর ঘিরে পামির, তিব্বত-কাশ্মীর ঘিরে কারাকোরাম ও হিমালয় পর্বতমালা, পূর্বে কুড়ি হাজার ফুট উঁচু কুয়েনলুন পর্বতমালা দেশটিকে প্রাচীরের মত ঘিরে রয়েছে। ইয়াংশিকিয়াং, হোয়াংহো, সিকিয়াং প্রভৃতি অসংখ্য নদী দেশকে শস্যশ্যামল করে তুলেছে। ধান সিল্ক গম আলু চা তুলো প্রচুর পরিমাণে হয়। খনিজ পদার্থেও এই দেশ অসাধারণ সমৃদ্ধ। কয়লা আকরিক-লোহা তেল অ্যান্টিমনি টাংস্টেন পর্যাপ্ত পাওয়া যায়। চীনদেশেই পৃথিবীর প্রাচীনতম লৌহ-শিল্পের উদ্ভব ঘটে। শূকর-সম্পদ চীনের ঐশ্বর্য। বর্তমানে ভারীশিল্পেও চীন সমৃদ্ধ।

বিশাল মহাদেশের মত এই দেশে বৈচিত্র্যময় ধর্ম ও সংস্কৃতি রয়েছে। বিভিন্ন আদিবাসী ও নানা জাতের লোক বাস করে। চীনবাসীরা অত্যন্ত সাহসী পরিশ্রমী শিল্পকর্মে নিপুণ ও স্বাধীনচেতা। পাঁচ হাজার বছরের সংগ্রামী ইতিহাসে এই জাতির অনন্য কষ্ট-সহিষ্ণুতা ও ঐতিহ্যের প্রতি এক সুগভীর ভালবাসার পরিচয় পাওয়া যায়।

আগে খণ্ড খণ্ড এলাকায় সামন্তপ্রভুরা স্বাধীনভাবে রাজত্ব চালাত। জাপান জার্মানী ব্রিটেন রাশিয়া প্রভৃতি বিদেশী শক্তি বারবার এই দেশ আক্রমণ ও অঞ্চলবিশেষ দখল করেছিল। ১৯১২ সালে মাঞ্চু রাজবংশকে উৎখাত করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৯ সালের ১ অক্টোবর থেকে চীন গণপ্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের একাংশ ফরমোজা এখনও মূল ভূখণ্ড থেকে রাষ্ট্রীকভাবে বিচ্ছিন্ন রয়েছে।

প্রাচীন সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী হওয়ার ফলে এবং নানা বৈচিত্র্যের জন্য এখানকার লোকসংস্কৃতি অসাধারণ উন্নত ও সমৃদ্ধ। দেশে অসংখ্য পশুকথা ছড়িয়ে রয়েছে এবং আজ পর্যন্ত যা সংগৃহীত হয়েছে তা বিস্ময়কর। এখানকার পশুকথার মধ্যে লোকসমাজের সামাজিক অভিজ্ঞতা প্রকাশের পাশাপাশি একটি সংগঠিত প্রতিবাদের

ছবিও দেখতে পাওয়া যাবে। বহু দুঃখে আর সংগ্রামে তাদের জীবন কেটেছে, তাই একশ্রেণীর পশুর প্রতি তীব্র শ্লেষ ও ঘৃণার প্রকাশ ঘটেছে এইসব পশুকথায়। এই পশুরা অত্যাচারীর প্রতীক, তাদের অতিচেনা প্রতিদিনের আতঙ্ক।

চীনের লোকসংখ্যা ৬০৪, ৬৬৬, ২১২ এবং আয়তন ৩, ৬৯১, ৫০২ বর্গ মাইল।

পশুকথা

ছোট্ট চাচাতাতুতু ও বিশাল রূপসী পাখি

ছোট্ট চাচাতাতুতু পাখি। যেমন ছোট্ট দেহ, তেমনি দেখতে কদাকার। সব পাখির মধ্যে সবচেয়ে খারাপ দেখতে তাকে। তার বাসার কাছেই থাকে সবচেয়ে বড আর সুন্দরী এক বিশাল রূপসী পাখি।

অনেককাল আগে সেই ছোট্ট চাচাতাতুতু পাখি বড় বড ঘন সবুজ ঘাসের বাসায় তিনটে ডিম পেড়েছিল। কাছেই এক সরু গর্তের মধ্যে থাকত এক ছাতারে পাখি। যখন চাচাতাতুতু বাইরে খাবার খুঁজতে যেত, তখন ছাতারে হাওয়ার বেগে এসে তার ডিমগুলোকে খেয়ে যেত। এমনি করে সে দুটো ডিম খেয়ে ফেলল। বেচারী চাচাতাতুতু ভীষণ কষ্ট পেল। কষ্টে তার চোখ ঝাপসা হয়ে এল, কষ্টে তার দম বন্ধ হয়ে এল। কিন্তু এত ছোট্ট পাখি, সে কি-ই বা করতে পারে? উড়ে গেল বিশাল রূপসী পাখির কাছে, তার কাছে সে নালিশ জানাল।

কেঁদে কেঁদে চাচাতাতুতু বলল, 'রূপসী পাখি, তুমি তো পাখিদের রাণী। তুমি আমাকে দয়া কর, তুমি আমার কষ্ট দেখ। একটা দুষ্টু ছাতারে পাখি আমার তিনটে ডিমের মধ্যে দুটোই খেয়ে ফেলেছে। কি সুন্দর ফুটফুটে দুটো বাচ্চাই না হতো! দুটো বাচ্চা না ফুটতেই সে মেরে ফেলল। তোমার কাছে এসেছি, তুমি এর বিচার কর, তাকে শাস্তি দাও, তুমি প্রতিশোধ নাও।'

বুড়ো আঙুলের চেয়ে ছোট্ট একটা পাখির কথা শুনতে রূপসী রাণীর বয়েই গিয়েছে। খেঁকিয়ে উঠে রাগী গলায় রূপসী রাণী বলল, 'তুমি জানো না আমি কেমন সবসময় ব্যস্ত থাকি? আর তাছাড়া তোমার ঐ ছোট ব্যাপারে আমি যাবো তোমাকে সাহায্য করতে! তোমার স্পর্ধা তো কম নয়? যাইহোক, মায়ের কর্তব্য হল তার বাচ্চাদের রক্ষা করা, অন্য কেউ কেন সে কাজ করতে যাবে? এটা শুধু তোমারই কাজ, তুমিই তোমার বাচ্চাদের রক্ষা করবে।'

রূপসী পাখি কিছু করবে না শুনে ছোট্ট চাচাতাতুতু আরও ভয় পেয়ে গেল। আর কার কাছেই বা সে যাবে? তাই ভয়ে ভয়ে আবার বলল, 'আমি তোমার কাছেই এসেছিলাম, কেননা তুমিই তো আমাদের রাণী। আমার ওপরে তুমি এমন নির্দয় হোয়ো না, আর কখনও ভেবো না যে সামান্য একটা ছোট ব্যাপারে আমি এমন সোরগোল তুলেছি। এটা ছোট ব্যাপার ঠিকই, কিন্তু ঠিক সময়ে যদি তার দিকে নজর দেওয়া না হয়, একদিন তার থেকেই বিরাট বিপদ-আপদ নেমে আসতে পারে। আজ যেটাকে তুচ্ছ মনে হচ্ছে, কালকে সেটা একেবারে তুচ্ছ নাও থাকতে পারে। এমনটা যদি ঘটে তবে আমায় তখন দোষ দিওনা। আমাব কথা তখন যেন মনে থাকে।'

রূপসী পাখি তবু তার কথায় কান দিল না। একবার জোরে হেসে গুনগুন করে গান করতে লাগল সে।

চাচাতাতুতুব কথা কি রূপসী পাখি শুনতে পেল না? নাকি সে গ্রাহ্যই করছে না? আরও ভয় পেয়ে ছোট্ট পাখি বলল, 'তুমি হাসছ কেন? তুমি গান গাইছ কেন? আমার কথা ভালভাবে শুনে বাখ, যখন একটা ছোট্ট ব্যাপার থেকে ভীষণ ব্যাপার ঘটে যাবে তখন আর আমাকে দোষ দিয়ে কোনো লাভ হবে না। বুঝলে?'

তবু রূপসী পাখি তার দিকে চোখ ফেবালো না। সে গান গাইছে তেমনিভাবে। মনের দুঃখে অসহায় চাচাতাতুতু ফিরে এল তাব নিজের বাসায়। কেউ তাকে সাহায্য করবে না, নিজের ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে। কি আর করবে সে? দুঃখে ঘেন্নায় সে একটা চোখা লম্বা ঘাস তুলে নিল আর তাই দিয়ে তৈরি করল একটা সরু তীর। তীর নিয়ে উড়ে গেল পাশের এক গাছে, ডালে বসে অপেক্ষা করতে লাগল। ছোট্ট দুটো চোখ বড় বড় করে খুলে রাখল, খুঁজতে লাগল লোভী ছাতারে পাখিকে।

ঠিক তাই। ছাতারে আসছে তার শেষ ডিমটাকে খেতে, তার সুন্দর বাচ্চাকে ফুটবার আগেই শেষ করে দিতে। এই ভাবনায় চাচাতাতুতু এমন উত্তেজিত আর সাহসী হয়ে উঠল যে ছাতারে পাখি কিছু বোঝার আগেই তীরবেগে উড়ে গিয়ে সেই ছুঁচলো তীর ঢুকিয়ে দিল তার লোভী চোখে। চোখের ব্যথায় ছাতারে কোঁ কোঁ আওয়াজ ছাড়ছে, চারিদিকে পাঁইপাঁই ঘুরছে, বন্ধ চোখে এখানে-ওখানে ধাক্কা খাচ্ছে।

লাফাতে-লাফাতে গড়াতে গড়াতে উড়ে-উড়ে ছাতারে পাখি কোঁকাচ্ছে আর এগোচ্ছে। হঠাৎ এক সিংহের নাকের মধ্যে সে আচমকা ঢুকে গেল। সিংহ তখন তীরে শুয়ে মাথাটা বালিতে রেখে চোখ বুজে আরাম করছিল। হঠাৎ নাকের সুড়সুড়িতে তার ঘুম গেল ভেঙে, ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে সিংহ লাফিয়ে পড়ল জলে।

জলে তখন আরামে চরে বেড়াচ্ছে এক বিরাট সাপ, দুপাশে তার ডানা, চোখে আগুন জ্বলছে। হঠাৎ তার সামনে সে দেখতে পেল সেই সিংহকে, মনে হল সিংহ

যেন তার দিকেই ছুটে আসছে। সিংহ যদি তাকে মেরে ফেলে? এই চিন্তা করেই জল ছেড়ে এদিক-ওদিক কি রয়েছে সেসব না দেখেই সে উড়ে চলল।

ভয় পেয়ে পালানো, তাই চোখ যেন কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। উড়তে গিয়ে তার ডানার আঘাতে রূপসী পাখির বাসা গেল ভেঙে, মাটিতে পড়ে গেল রূপসী পাখির সুন্দর ডিম। বাচ্চা ফোটার আগেই ডিম গেল ভেঙে।

ভীষণ ক্ষেপে গেল রূপসী পাখি, দুঃখে বুক ফেটে যাচ্ছে তার। রুক্ষ গলায় সে বলে উঠল, 'তুমি হলে ড্রাগন, আর আমি হলাম রূপসী পাখি। চিরকাল তুমি থাক জলে, আর আমি থাকি ডাঙায়। তোমার সঙ্গে আমার কোনো ঝগড়া-বিবাদ নেই। তুমি জানো না যে. আমরা রূপসী পাখিরা বছরে মাত্র একবার একটা করে ডিম পাড়ি, সারা বছরে আমাদের একটাই বাচ্চা হয়? জলেব বাসা ছেড়ে তোমার উড়ে আসার কি দরকাব ছিল? তুমি আমার বাসা ভাঙলে, তুমি আমার একমাত্র ডিমকে ভেঙে ফেলল। আমি এখন কি করি? হায়! হায়! এ আমার কি হল?'

জলের প্রাণী হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'রূপসী পাখি, দোহাই তোমার, তুমি আমাকে দোষ দিও না। আমাব কোনো দোষ নেই। আমি যখন আনন্দে আস্তে আস্তে সাঁতার দিচ্ছিলাম, তখন একটা সিংহ আচমকা জলের মধ্যে ঢুকে পড়ে আর আমাকে খেতে তেড়ে আসে। তখন আমি কি করি? ভয়ে জল ছেড়ে আকাশে উড়ে পড়েছি। ভয়ে আমি হঠাৎ না দেখতে পেয়ে তোমাব বাসা ভেঙেছি, ডিম ভেঙেছি। কিন্তু ভাই, ইচ্ছে করে ভাঙি নি, দেখতে না পেয়ে এমন ঘটে গেল। তাই এটা সিংহের দোষ। সে আমায় খেতে না এলে তো আব আমি অমন করে উড়তাম না? তুমি ভাই সিংহকেই দোষ দাও। সেই তো দোষী।' রূপসী পাখি তাই সিংহের কাছে গেল।

সিংহ বলল, 'রূপসী পাখি, তোমার তো খুব বুদ্ধিসুদ্ধি আছে। তাই আমাকে দোষ দিও না। আমি দোষী নই। আমি গরম বালির ওপরে শান্তিতে ঘুমোচ্ছিলাম, হঠাৎ কোথা থেকে এক দুষ্টু ছাতারে পাখি সোজা আমার নাকের মধ্যে ঢুকে পড়ল। আমার এমন ব্যথা লাগল, এমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম যে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। তাই আমার দোষ কোথায়? এ তো ছাতারের দোষ। তুমি বরং তাকে দোষী কর। তাকেই জিজ্ঞেস কব। রূপসী পাখি তাই ছাতারে পাখির কাছে গেল।

খুব ভক্তি দেখিয়ে মাথা নুইয়ে ছাতারে পাখি বলল, রূপসী পাখি. আমার কিচ্ছু দোষ নেই, আমি কিচ্ছু করিনি। সব দোষ ঐ চাচাতাতুতুর। আমি ফুরফুর করে ঘাসে ঘাসে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ হতচ্ছাড়া চাচাতাতুতু আমার চোখে একটা ছুঁচলো তীর ঢুকিয়ে দেয়। আমার এমন ব্যথা লাগল, আমি এমন হকচকিয়ে গেলাম যে পালাতে গিয়ে ভুল করে সিংহের নাকে ঢুকে গিয়েছি। ইচ্ছে করে ঢুকিনি। তাই

সব দোষ ঐ ছোট্ট চাচাতাতুতুর, আমার নয়। তুমি বরং তার কাছে যাও।'
কি আর করে রূপসী পাখি। ছোট্ট চাচাতাতুতুর কাছে তাকে যেতেই হলো শেষকালে।

গম্ভীর হয়ে ভারী গলায় চাচাতাতুতু বলল, 'রূপসী পাখি, আমি তোমায় আগেই বলেছিলাম। কিন্তু সেদিন তুমি আমার কথায় কান দাও নি। কেননা, আমি একটা ছোট্ট পাখি, আমার ছোট ছোট পালক, আমার দেহে শক্তি নেই, আমাকে দেখতেও খুব খারাপ, বলার মত আমার কিছুই নেই। তোমার কাছে নালিশ জানাতে গিয়েছিলাম। তুমি তখন ভাবলে, আমার মত ছোট্ট পাখির কাছ থেকে তোমার কোনো বিপদ হবে না। ভাবলে, আমার দুঃখ-কষ্ট কিছুই না, খুব সামান্য ব্যাপার, ওতে কান দেবার কি আছে! আমাকে তুমি উপদেশ দিলে, বাচ্চাদের দেখাশোনা মায়েদেরই করা উচিত। তোমাকে বিরক্ত করতেও বারণ করলে। এখন কেমন মনে হচ্ছে? তুমি তোমার নিজের বাচ্চাকে দেখাশোনা করতে পার নি? তা না করে এখন সবাইকে বকে বকে দোষ দিয়ে বেড়াচ্ছো। যখন ছাতারে আমার ডিম খেয়েছিল তখন সেটা তো সামান্য ব্যাপারই! আর জলের প্রাণী যখন তোমার বাসা ভেঙে ডিম ভাঙল তখন কেন সেটা সামান্য ব্যাপার হবে না? আমি ঘাসের বাসায় তিন তিনটে ডিম পেড়েছিলাম। তাদের রেখে রোজ আমাকে খাবার খুঁজতে যেতে হত। আর তুমি পেড়েছো গাছের উঁচু ডালে, একটা মাত্র ডিম। নিচু জায়গায় তিনটে ডিম সামলানো কত কঠিন। আর উঁচু ডালে একটা ডিম পাহারা দেওয়া কত সহজ। তাই তুমি পারলে না? একটা ডিমও ভালোভাবে দেখেশুনে তুমি বাঁচাতে পারলে না? আমি তোমায় আগেই সাবধান করে দিয়েছিলাম, যদি খুব সামান্য একটা ব্যাপারের সমাধান তক্ষুণি না করে ফেল তবে তাই থেকে বিরাট কিছু ঘটে যেতে পারে। তখন বলেছিলাম, এরকম ঘটলে আমায় কিন্তু দোষ দিও না। তাহলে এখন তুমি বড় মুখ করে আমায় কেন দোষ দিতে এসেছ? আমি তো দোষী নই।'

চাচাতাতুতু পাখির কথায় রূপসী পাখি খুব লজ্জা পেল আর মনমরা হয়ে মাথা নিচু করে উড়ে চলল তার বাসার দিকে।

অভিপ্রায়

গাছের শুকনো ডালে ডালে ঘষা লেগে সামান্য আগুনের ফুলকি ওড়ে। তার থেকে ঘটে যায় দাবানল। এই বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে প্রবাদ, 'আগুনের ফুলকি দাবানল সৃষ্টি করতে পারে'। আজকে যে দুর্যোগ অতি তুচ্ছ বলে মনে

হচ্ছে, তাকে গ্রাহ্য না করলে, তার প্রকৃত সমাধান না করলে একদিন গভীর ও ব্যাপক বিপর্যয় নেমে আসতে পারে এবং তা আসেও। গোড়াতেই শক্তিশালী রূপসী পাখি যদি ছাতারেকে নিবৃত্ত করত তবে পরের বিপর্যয়গুলো ঘটত না।

সমাজে মানুষ বসবাস করে একে অন্যের ওপর নির্ভর করে। তাই কোনো বিশেষ ব্যক্তির ওপরে আঘাত বা নির্যাতনে যদি সমাজের অন্য মানুষ মুখ ফিরিয়ে থাকে তবে সমাজের সংহতি-ঐক্য নষ্ট হয়। বিচ্ছিন্নতা মানুষকে বড় দুর্বল করে। যে ঝড় একজনকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে তা যদি সমাজের সবাই মিলে প্রতিরোধ না করে, তবে একদিন নিজের ঘর ভাঙলে অন্যের সাহায্যও পাওয়া সম্ভব নয়। এদিকে মানুষের যখন ভুল ভাঙে তখন অনেক দেরি হয়ে যায়। এই ব্যক্তির প্রতি আক্রমণ প্রাকৃতিক দুর্যোগে ঘটতে পারে, রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণেও হতে পারে। সামন্তপ্রভু একজন কৃষককে জমি থেকে উচ্ছেদ করল, সে হল খেতমজুর। এলাকার সব কৃষক য'দি তার পাশে না দাঁড়ায়, তবে চক্রান্তের নাগপাশে তারাও একদিন দেখবে যে, তারাও আর কৃষক নেই, হয়েছে খেতমজুর। চীনের কৃষকের এ অভিজ্ঞতা সুদীর্ঘকালের। সন্তানহীনা চাচাতাতুতুর বিপদে রূপসী পাখি তার পাশে দাঁড়ায়নি, একদিন তাই রূপসী পাখিকেও পুত্রহীনা জননী হতে হয়েছে।

অন্যের বেদনায় আমরা উদাসীন থাকি। অন্যের বেদনা-ক্ষোভ-কান্না-ঘৃণা সাধারণভাবে আমাদের বিচলিত করে না। কিন্তু ঐ একই ঘটনা আমাদেরও যে সীমাহীন দুঃখে ফেলতে পারে ত' তখন ভাবি না। চীনের সামন্তপ্রভুরা যে দৈহিক অত্যাচার চালাত সেখানকার কৃষকদের ওপরে, অত্যাচারের সেই চাবুক পাল্টা তাদের পিঠের চামড়াকে ক্ষতবিক্ষত করলে কেমন লাগত—সে অনুভূতি তাদের কখনও জাগে নি। কিন্তু দিন পালটায়, বিপরীত দৃশ্যও তাই চোখে পড়ে। চাচাতাতুতু দুর্বল, তুচ্ছ, রূপহীন এক পাখি। সৌন্দর্য-মর্যাদা ও দৈহিক শক্তিতে গর্বিত রূপসী পাখি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, উপদেশ দিয়েছিল। বিপর্যয়ের চক্র কিন্তু রূপসী পাখিকেও সমানভাবে আঘাত হেনেছে।

সমাজে যারা তুচ্ছ নগন্য, শোষণে ও ক্ষোভে তারাও দীপ্ত হয়ে উঠতে পারে, তারাও এক অনন্ত শক্তি ও কৌশলে বলীয়ান হয়ে শত্রুকে তীব্র আঘাত হানতে পারে। অবিচার মানুষের মধ্যে প্রতিরোধের শক্তি জোগায়। তাই ছোট্ট চাচাতাতুতু ছাতারেকে বিদ্ধ করেছে এমন কি মর্যদাহে শক্তিময়ী রূপসী পাখিকে অপমান করতেও ভয় পায় নি।

প্রকল্প ৪

সাহিত্য সমালোচনা

নাইজিরিয়া

দেশ পরিচয়

আফ্রিকার পশ্চিমাঞ্চলের একটি বড় দেশ নাইজিরিয়া। নাইজার নদীর অববাহিকায় অবস্থিত এই দেশের বিরাট উপকূলে অরণ্য, জলাভূমি এবং অসংখ্য খাঁড়ি। দেশের অভ্যন্তরে মৌসুমী বনভূমি, বিস্তৃত তৃনভূমি। অন্যদিকে সুদূর উত্তর এলাকা গিয়ে মিশেছে সাহারা মরুভূমিতে। দেশের প্রধান নদী বেনুয়ে।

নাইজিরিয়ার উত্তরে সাহারা, পশ্চিম-আফ্রিকা, দক্ষিণে অতলান্তিক মহাসাগর, পশ্চিমে দাহোমে এবং পূর্ব দিকে রয়েছে চাদ ও ক্যামেরুন।

প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদে দেশ সমৃদ্ধ। মাটি অসাধারণ উর্বর। বাদাম কোকো পাম কলা রবার প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। পর্যাপ্ত কয়লা ও আকরিক টিনের ভাণ্ডার মজুত রয়েছে মাটির নিচে।

দেশের মানুষ বিভিন্ন আদিবাসী-গোষ্ঠীতে বিভক্ত। সুদীর্ঘকালের এক নির্মম ঔপনিবেশিক শাসনের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা রয়েছে এদেশের মানুষের। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু হয়। টিন-খনি শ্রমিক এবং সারা দেশ জুড়ে কৃষক-ছাত্রদের দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের পরে নাইজিরিয়া ১ অক্টোবর ১৯৬০ সালে স্বাধীন হয়।

আফ্রিকার প্রতিটি দেশেই পশুকথা যেমন সমৃদ্ধ তেমনি অফুরন্ত। এত পশুকথা পৃথিবীর অন্য কোনো মহাদেশে খুঁজে পাওয়া যাবে না। নাইজিরিয়ার হাউসাদের মধ্যে পশুকথার এক বিশাল ভাণ্ডার রয়েছে। ঔপনিবেশিক শোষণের জ্বালা ও অভিজ্ঞতা এইসব পশুকথাকে অসাধারণ করে তুলেছে। বনে-ঘেরা মানুষের সহজ অভিব্যক্তিতে এগুলি অনবদ্য।

নাইজিরিয়ার লোকসংখ্যা ৫৫, ৬৫৩, ৮২১ এবং আয়তন ৩১৬, ৬৬৯ বর্গ মাইল।

পশুকথা

আজও শুয়োর মাটি খোঁড়ে

সে অনেককাল আগের কথা। এক বনে দুই বন্ধু ছিল। তাদের একজন শুয়োর আর অন্যজন ছিল কচ্ছপ। দুজনের মনের মিল খুব। কেউ কারও কাছে কোনো কথা

লুকিয়ে রাখতে পারে না। সব কথাই দুজনে দুজনের কাছে মন খোলসা করে বলত।

এমনি করে দিন যায়। একদিন কচ্ছপ মন ভারি করে শূয়োরের কাছে গেল। তার মুখখানা শুকনো দেখে শূয়োর কেমন মুষড়ে গেল। আমতা আমতা করে সে জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার ভাই কচ্ছপ? তোমার শরীর-মন ভাল নেই বুঝি?'

কচ্ছপ দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে আধবোজা চোখে বলল, 'আমি একেবারে ভেঙে পড়েছি ভাই। ছেলে-বৌকে খাওয়ানোর মত সামান্য পয়সাও আজ আমার হাতে নেই। কি যে করি?'

'এই ব্যাপার?' বলেই শূয়োর ঠোঁটের ফাঁকে একটু হেসে নিয়ে আবার বলল, 'কিছু ভেবো না। কয়েকদিন আগেই আমি কিছু টাকা পেয়েছি। এখন খরচ করার মত কিছু নেই। তাই তুমি সেটা নিয়ে নাও ভাই, তোমার উপকার হবে।'

কচ্ছপ কিন্তু আরও দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে দুঃখের সঙ্গে বলল, 'তোমার হয়ত ঐ টাকাটার কোন দরকার নেই এখন। কিন্তু কালই তো দরকার হতে পারে।'

'কি যে তুমি বল ভাই! বিপদের সময় বন্ধুকে যদি সাহায্য করতে না পারলাম, তবে আর বন্ধুত্ব কিসের? তুমি আমার বিপদেও তো এইভাবেই সাহায্য করবে। কি, করবে না?' শূয়োর বলল।

'এ অবশ্য তুমি ঠিকই বলেছ বন্ধু।' কচ্ছপ মাথা ঝাঁকাল।

'আমি আর তোমায় দেরি করে দেব না,' বলেই শূয়োর তার শোবার ঘরে চলে গেল। ঘরের কোণার এক গোপন গর্ত থেকে সে কিছু টাকা বের করে গুনল। অর্ধেকটা নিয়ে বাকি অর্ধেকটা গর্তে রেখে গর্তের মুখ ভাল করে বন্ধ করে ফিরে এল কচ্ছপের কাছে।

'এই নাও ভাই কচ্ছপ।' টাকাগুলো সে তুলে দিল, কচ্ছপের হাতে।

কয়েকটা ফোঁটা চোখের জল ফেলে কচ্ছপ বলল, 'তোমায় বন্ধু অনেক ধন্যবাদ! তুমি যে আমার কি উপকার করলে।'

'ভুলে যাও ওসব কথা। আমি তোমায় সাহায্য করতে পেরেই আনন্দিত।'

'এ টাকা আমি তোমায় পনেরো দিনের মধ্যেই ফেরৎ দেব। আর যদি খুব দেরি হয় তবে একুশ দিনে। তুমি কিন্তু কিছু মনে কোর না ভাই।''

'তাড়াতাড়ির কোনো দরকার নেই। যখন তোমার সুবিধা হবে তখন দিও। তোমায় আমি বিশ্বাস করি, তুমি যে আমার বন্ধু।'

'শূয়োরভাই, তোমার নজর খুব উঁচু। তুমি বড়ই দয়ালু। তোমার মতন এত ভাল মন আমি আর কোথাও দেখিনি।' ধরা গলায় একথা বলে কচ্ছপ বিদায় নিল।

এদিকে টাকা নিয়ে যাওয়ার পর কচ্ছপের আর দেখা নেই। সে এ পথে আর

হাটেই না। একমাস যায়, দু'মাস যায়। কিন্তু কচ্ছপের কাছ থেকে কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। সে এখন শুয়োরকে পারতপক্ষে এড়িয়ে চলতে চায়।

একদিন একটা কাজে শুয়োর গিয়েছে দূরে। ফিরতে বেশ দেরি হয়ে গেল। ক্লান্ত পায়ে সে যখন বাড়িতে ঢুকছে, তখন তার বৌ তাকে দেখে প্রায় কেঁদেই ফেলল। তাকে দেখে শুয়োরের যেন কেমন মনে হল।

হন্তদন্ত হয়ে সে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে?'

'ওগো, আমাদের সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে।' এবার সে ঝরঝর করে কেঁদেই ফেলল। কোন কথা না বলে শুয়োরের বৌ সোজা তাকে ঘরের কোণের সেই গর্তের কাছে নিয়ে গেল যেখানে শুয়োর টাকাগুলো রেখেছিল।

'আমাদের টাকাগুলো সব চুরি হয়ে গিয়েছে।' ফোঁপাতে ফোঁপাতে সে বলল।

'চুরি গেছে?' অবাক হয়ে গেল শুয়োর। আর কোনো কথা বেরুল না তার মুখ থেকে। কেননা, সে ভেবেছিল সে ছাড়া আর কেউ ও গর্তের খবর জানে না।

'আমাদের সব টাকা চুরি হয়ে গেল।'

'আমাদের টাকা মানে?'

'হ্যাঁ গো, আমাদের দুজনের টাকা। আমি মাঝে মাঝেই এর মধ্যে সামান্য করে টাকা রাখতাম। তোমার আসার আগে আমি গুনতে গেলাম কেমন জমছে আমাদের টাকা। গিয়ে দেখি অর্ধেকটা চুরি হয়ে গিয়েছে। তুমি নিশ্চয়ই চোরকে ধরতে পারবে।'

'ও, অর্ধেকটা, তাই বল! আমার তো হয়ে এসেছিল তোমার কথা শুনে। ওটা চুরি হয়নি বৌ।' শুয়োর নিঃশ্বাস ফেলে বলল।

'তাহলে, টাকাগুলো কি হল', শুয়োরের বৌ চিৎকার করে উঠল।

রেগে গিয়ে শুয়োর বলল, 'শোন, টাকা আমার, আর তাই আমার যা ইচ্ছে তাই করব। তোমার নাক গলাতে হবে না।'

'আমার টাকার অংশও তুমি নিয়েছ। তাই আমার জানার অধিকার আছে। কাকে তুমি টাকা দিয়েছ?'

'আমি কাউকেই টাকা দিই নি। শুধু এক বন্ধুকে তার বিপদে সাহায্য করেছি। সে খুব সৎ লোক, শিগ্‌গিরই টাকা ফেরৎ দেবে।' শুয়োর বেশ জোরের সঙ্গে বলে উঠল।

'তুমি ও টাকা আর ফেরত পাবে না।' ঝাঁঝের সঙ্গে বলল বৌ।

'আমি টাকা ফেরৎ পাবোই। বন্ধু কচ্ছপ কখনও আমাকে ফাঁকি দেবে না।'

'হঁঃ, তোমার হাতে যখন ফেরৎ দেওয়া টাকা আমি দেখব, তখনই শুধু বিশ্বাস করব। তার আগে নয়।'

'বেশ, শিগ্‌গিরই তুমি তা দেখতে পাবে।'

'সেই শিগ্‌গিরই-টা তোমার কবে হবে শুনি?' শুয়োরের চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে বৌ জিজ্ঞেস করল।

'এরই মধ্যে একদিন।'

'ও একটা কথা।' হঠাৎ কিছু মনে পড়েছে এইভাবে শুয়োরের বৌ বলল, 'আচ্ছা, তুমি কতদিন আগে তোমার বন্ধুকে টাকা ধার দিয়েছ বলতো?'

'মানে, এই···এই তো কয়েকদিন আগে।' শূয়োর সত্যিকথাটা ভয়ে বলতে পারল না।

কিন্তু অত সহজে ভুলবার পাত্রী শূয়োরের বৌ নয়। সে বলে বসল, 'তোমার বন্ধু কচ্ছপকে তো আমি দুমাস আগে একবার এধারে দেখেছিলাম। তারপরে আর তো সে এমুখো হয়নি।'

'বাইরে তার সঙ্গে আমার প্রায়ই দেখা হয়। তার এখন সময়টা খুব ভাল যাচ্ছে না। নইলে.···' থেমে গেল শূয়োর তার বৌয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে।

'তাই বুঝি?' বৌ চোখ ঘুরিয়ে বলল।

শূয়োর গেল ক্ষেপে, 'আচ্ছা মুস্কিল ব্যাপারখানা কি বলত?'

'আমি কালকে বাজারে গিয়ে কচ্ছপের বৌকে দেখতে পেয়েছি। সে জলের মত টাকা খরচ করছে। এটা কিনছে, ওটা কিনছে, সেটা কিনছে।'

এবার সত্যি সত্যি শূয়োরের অবাক হওয়ার পালা।

'তাই বুঝি? কচ্ছপ তাহলে টাকা পেয়েছে! সে যদি টাকা পেয়ে থাকে, নিশ্চয়ই আমাকে টাকা দিয়ে যাবে। তার কাছে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। সেই ঠিকসময়ে আমার কাছে আসবে টাকা ফেরৎ দিতে।'

কিন্তু অবাক হল শূয়োর। সেইদিন কিংবা তারপরের দিনও কচ্ছপ এল না। তৃতীয় দিনে শূয়োর বেশ ঘাবড়ে গেল। সে ঠিক করল আজই সে কচ্ছপের সঙ্গে দেখা করবে। এই ভেবে সে রওনা দিল কচ্ছপের বাড়িমুখো।

এদিকে দূর থেকেই গাছের ফাঁক দিয়ে কচ্ছপ দেখতে পেল, দ্রুতপায়ে শূয়োর আসছে তারই বাড়ির দিকে। সবই বুঝল সে। বৌকে ডেকে তাই বলল, 'শূয়োর-বেটা এই ধারেই আসছে। আমি ওর সঙ্গে মোটেই দেখা করতে চাই না।'

'ওটা তুমি আমার ওপরেই ছেড়ে দাও। দেখ না, কি করি।' কচ্ছপের বৌ বলে উঠল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই কচ্ছপের বৌ ফিরিয়ে দিল শূয়োরকে। শূয়োর বাড়ি ফিরে এসে তার বৌকে কোনো কথাই বলল না।

দুদিন পরে আবার এল শূয়োর। এবারও সে শুনল কচ্ছপ বাড়িতে নেই, বাইরে গিয়েছে জরুরী কাজে। তার কেমন সন্দেহ হল, কচ্ছপের বৌ বোধ হয় সত্যি কথা বলছে না।

'আচ্ছা, কখন এলে কচ্ছপের দেখা মিলবে?' মনের সন্দেহ চেপে রেখে শূয়োর জিজ্ঞেস করল।

'সেটা বলা খুবই মুস্কিল। সে ইচ্ছে মত যাওয়া-আসা করে আজকাল।'

'আপনি কি তাকে বলেছিলেন যে, আমি সেদিন তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম?'

'হাঁ, তাকে আমি বলেছিলাম আপনার আসবার কথা। আপনার সঙ্গে দেখা না হওয়াতে তিনি খুব দুঃখ করলেন। আপনি যদি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেন, তবে তার দেখা পেতে পারেন। এরই মধ্যে তিনি এসে পড়বেন মনে হচ্ছে,' বলে কচ্ছপের বৌ গাছের ফাঁক দিয়ে দূরে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল যেন এখুনি কচ্ছপ এসে পড়বে।

এটাও কিন্তু তার মিথ্যা কথা।

আশায় ভর করে শূয়োর জিজ্ঞেস করল 'আচ্ছা, আমি কখন তাকে পেতে পারি?'

'আমি ঠিক বলতে পারি না। তিনি আজকাল যখন-তখন আসেন আর বাইরে বেরিয়ে যান যে সঠিক করে কিছু বলা কঠিন।'

শূয়োর সেখান থেকে ধীরে ধীরে চলে এল। পথে হাঁটতে হাঁটতে সে ভাবতে লাগল, কচ্ছপ ঠিক যেন বন্ধুর মত ব্যবহার করছে না। সে বাড়িতে গিয়ে এবার বৌকে বলল, 'দেখ, আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে, আমার টাকাটা হয়তো আমি আর ফেরৎ পাব না।'

'কিন্তু ওটা যে আমাদের টাকা?' বৌ বলল।

'কচ্ছপের এই ব্যবহার আমি ভাবতেই পারিনি। সে আমার অত বন্ধু।'

'যে আদৌ বন্ধু নয়, তাকে যদি হারাতে চাও তাহলে সামান্য টাকা ধার দিলেই যথেষ্ট।' সে আর তোমার ঘরমুখো হবে না।'

'তুমি ঠিকই বলেছ বৌ। তোমার কথাই ফলল। তুমি প্রথমেই আমাকে একথা বলেছিলে। আমি তখন বিশ্বাস করিনি। কিন্তু আমি টাকা ফেরৎ আনবই, নইলে আমার নাম শূয়োর-ই না।'

'আমি তোমার কথা শুনে খুবই খুশি হলাম। তুমি যত তাড়াতাড়ি একাজ করবে, ততই মঙ্গল।' শুয়োরের বৌ ঘরের কাজে মন দিল।

সেদিন ভাগ্য ভাল। হঠাৎ দেখা হয়ে গেল কচ্ছপের সঙ্গে। দুজনেই দুজনকে প্রীতিসম্ভাষণ করল।

'তুমি কেমন আছ ভাই কচ্ছপ?' শুয়োর মনের রাগ চেপে রেখে বাইরে হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল।

'খুব ভাল ভাই, খুব ভাল। কিন্তু আজকাল বড্ড ব্যস্ত আমি। বাড়িতে একেবারে থাকতে পারি না ভাই। বৌ বলেছিল, তুমি কয়েকবার গিয়েছে আমার সঙ্গে দেখা করতে।'

'কয়েকবার নয়, মাত্র দু'বার।' শুয়োর উত্তর দিল।

কচ্ছপ বলল, 'আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাব ভেবেছিলাম। কিন্তু ভাই এত ভীষণ ব্যস্ত ছিলাম যে আর যেতেই পারি নি। হ্যাঁ, একটা কথা। সেই সামান্য ব্যাপারটা আমি একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম।'

শুয়োর মাথা নাড়ল, হাসল, তারপর বলল, 'আমি বড় ঝামেলায় পড়েছি। আবার বৌও ব্যাপারটা জেনে ফেলেছে। আর তুমি তো জানোই, মেয়েরা কি ধরণের হয়।'

'যাক্‌গে, ঘাবড়িও না ভাই। আমি সব ব্যবস্থা করছি। আচ্ছা, তুমি কাল সন্ধ্যের সময় আসতে পাববে? কোনো অসুবিধা হবে না ত?'

'না না, অসুবিধার কি আছে? আমি নিশ্চয়ই আসব।'

'খুব ভাল হল। আমি সব ব্যবস্থা করে রাখব।' মিষ্টি সুরে কচ্ছপ বলে ওঠে।

শুয়োর আনন্দে অন্যসব ভুলে গেল। বাড়ি গিয়ে সে বৌকে সব জানাল।

'আমি যদি তুমি হতাম, তাহলে আরও আগে তার কাছে যেতাম টাকা আদায় করতে।' সমস্ত কিছু শুনে শুয়োরের বৌ উত্তর দিল।

যাই হোক, সন্ধ্যে লাগার আগেই শুয়োর বাড়ি থেকে রওনা দিল। তাকে আসতে দেখে কচ্ছপের বৌ দৌড়ে গিয়ে স্বামীকে খবর দিল। অল্পক্ষণের জন্য কচ্ছপ কি যেন ভাবল, ঘরের চারদিকে চেয়ে দেখল, তারপর তাদের শোবার ঘরের মধ্যে যে ঝুড়িটা ছিল, তার দিকে আঙুল দেখিয়ে সে বলল, 'আমি ওর মধ্যে লুকোচ্ছি।'

'কেন?'

'এখন খুলে বলবাব সময় নেই। শুধু সে চলে যাওয়া পর্যন্ত তুমি তার সঙ্গে কথা বলতে থাকো। কিন্তু কখনও যেন সে বুঝতে না পারে, তুমি তাকে তাড়াতে চাইছ। মনে থাকবে তো।'

'আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।' খুব প্রসন্ন না হয়েই বৌ জবাব দিল।

'তোমাকে করতেই হবে।' এই আদেশ দিয়ে কচ্ছপ ঝুড়ির মধ্যে চেপে বসল। বলল, 'আমাকে ঠিক করে কাপড-চোপড় দিয়ে ঢেকে দাও।'

কচ্ছপের বৌ তাকে এমনভাবে ঢেকে দিল যাতে সে নিঃশ্বাসটুকু শুধু নিতে পারে। একটু পরেই শূয়োরের দরজা নাড়ার আওয়াজ পাওয়া গেল।

সমাদরে কচ্ছপের বৌ তাকে ঘরে ডেকে আনল। 'আপনি ভাল অছেন তো?' সে শূয়োরকে জিজ্ঞেস করল।

'ভালই। কচ্ছপ বাড়ি আছে তো?' শূয়োর জিজ্ঞেস করল। 'কিছু মনে করবেন না, আমি একটু আগেই চলে এসেছি'

'আপনি কি কিছুক্ষণ বসবেন না?' খুব বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করল কচ্ছপের বৌ।

'হ্যাঁ, বসব।'

তারা দুজন এবার বসল। শূয়োর চেষ্টা করতে লাগল যাতে কচ্ছপের বৌ কথাবার্তা বলে, কিন্তু কচ্ছপের বৌ কোনো কথাই বলছে না। আরও কিছুক্ষণ পরে শূয়োর অস্থির হয়ে পড়ল।

'কালকে আপনার স্বামীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সে আমাকে আজ সন্ধ্যেবেলা আসতে বলেছিল।'

'আমাকে সে এসব কোনো কথাই বলে নি।' পরিষ্কারভাবে রূঢ় গলায় কচ্ছপের বৌ একথা জানাল।

এই ধরণের উত্তর কিন্তু শূয়োরের মোটেই ভাল লাগল না।

'ওঃ!' শূয়োর বলে উঠল, 'কচ্ছপ কি এই গাঁয়ের বাইরে কোনো কাজে গিয়েছে?'

'তা আমি কি করে জানাবো?'

'শ্রীমতী কচ্ছপ আপনি ঠিক কথা বলছেন না। আমার তাই মনে হচ্ছে।'

'আমি!' আঁৎকে উঠল কচ্ছপ-গৃহিনী।

'আপনার স্বামী কি ভেতরেই আছেন?' শূয়োরের জিজ্ঞাসায় কচ্ছপের বৌ মুখে কেমন শব্দ করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

'আপনি আমাকে কোনো কথাই বলবেন না জানি। তাহলে, আমিই খুঁজে দেখি কোথায় কচ্ছপ।' রেগে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল শূয়োর।

সে উঠে শোবার ঘরের দিকে যাওয়ার জন্য এগিয়ে গেল। কিন্তু দরজার কাছে তার পথ আটকে দাঁড়াল শ্রীমতী কচ্ছপ।

'আপনি ভেতরে যেতে পারবেন না।'

'তাহলে বলুন, কোথায় আপনার স্বামী লুকিয়ে আছে ?'

'সে কোথায়ও লুকিয়ে নেই। সে বাইরে গিয়েছে কাজে।'

'আপনি কি আমায় কচি ছেলে পেয়েছেন যে, যা বলবেন তাই বিশ্বাস করব ? যদি আপনি সত্যিকথাই বলছেন তাহলে আমাকে ভেতরে যেতে দিতে আপনার এত আপত্তি কেন ?'

'আমাকে না মেরে আপনি ও ঘরে যেতে পারবেন না।' তীক্ষ্ণস্বরে কচ্ছপের বৌ জানাল।

শূয়োরের তখন ধৈর্যের সীমা পার হয়ে গিয়েছে। রাগে কাঁপতে কাঁপতে সে বলল, 'আমি এক-দুই-তিন গুণব, এর মধ্যে আপনি যদি পথ থেকে সরে না যান, তবে যা হবে তার জন্য আপনাকেই পস্তাতে হবে।

'ঠিক আছে, আপনার যা ইচ্ছে আপনি করতে পারেন।' শান্তভাবে জবাব দিল কচ্ছপের বৌ।

'এক-দুই-তিন ! আপনি কি আমার পথ ছাড়বেন ?'

কচ্ছপের বৌ সেইভাবেই দাঁড়িয়ে রইল, শূয়োর ছুটে এসে মারল প্রচণ্ড এক গুঁতো ! কিন্তু ঠিক সময়ে হঠাৎ ফট্ করে সরে গেল কচ্ছপের বৌ আর সোজা ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল শূয়োর, হাওয়ার বেগে। ঢুকেই সে গুঁতো গেল সেই ঝুড়িটার সঙ্গে। রাগে সে ঝুড়িটাকে তুলে ঘরের বাইরে এনে টেনে ফেলে দিল দূরে। তারপর আবার ঢুকল শোবার ঘরে। সে পই পই করে সবদিক খুঁজল, কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না।

যখন সে বাইরে বেরিয়ে এল, তখন যা-নয় তাই বলে কচ্ছপের বৌ তাকে বকতে লাগল। সেও ক্ষেপে ছিল, গলা চড়িয়ে সেও দিল গালাগালি। দুজনের মধ্যে রীতিমত ঝগড়া বেধে গেল।

এদিকে দুইজনের মধ্যে যখন প্রচণ্ড বচসা হচ্ছে, তখন কচ্ছপ ঝুড়ি থেকে গুটি গুটি বের হয়ে বাড়ির দিকে এল।

'এখানে সব হচ্ছেটা কি ?' গোলমালকে ছাড়িয়ে সে চীৎকার করে উঠল।

হঠাৎ তাদের ঝগড়া গেল থেমে। তারপর কচ্ছপের বৌ সব ঘটনা কচ্ছপকে খুলে বলল আর সমস্ত দোষ চাপাল নিরীহ শূয়োরের ওপর।

'তোমার কিছু বলার আছে শূয়োর' কচ্ছপ জিজ্ঞেস করল।

'আমি খুব দুঃখিত যে আমি আমার ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছিলাম।' খুব বিনীত-ভাবে শূয়োর জানাল।

'আশ্চর্য ! আমি ভাবতে পারিনি বন্ধু, তুমি এই ব্যবহার করবে। আমি ভাবতাম, তুমি আমার প্রাণের বন্ধু। ওঃ ভাই, আজকে আমি জীবনের সবচেয়ে

বড় আঘাতটি পেলাম।' দুঃখের ভান করল কচ্ছপ।

'আমায় ভাই তুমি ক্ষমা কর।'

উপহাস করে রেগে কচ্ছপের বৌ বলল, 'জানেন, আপনি আমার ঝুড়ি ভেঙে ফেলেছেন?' তারপর স্বামীর দিকে চেয়ে বলল, 'সেই যে আমার শিল-পাটা, তুমি তো জানো, তাতে আমি পেঁয়াজ টমাটো আর লঙ্কা বাঁটতাম। সেটা ভেঙে ফেলেছে। তোমার বন্ধু শূয়োর ঝুড়ির সঙ্গে ওটাও বাইরে ফেলে দিয়েছে।'

'তাই নাকি শূয়োর-ভাই?'

'আমি একই সঙ্গে বোধহয় ও দুটোকে ফেলে দিয়েছি।' এই বলে শূয়োর বাইরে গিয়ে ঝুড়িটা নিয়ে এল কিন্তু শিল-পাটা কোথায়ও দেখতে পেল না।

'আমার বৌ-এর শিল-পাটা কোথায়?'

'ওটা তো আমি দেখতে পেলাম না। আচ্ছা, আমি আবার খুঁজে আসছি।'

এবারও খালিহাতে ফিরে এল শূয়োর।

'যতক্ষণ না তুমি ঐ শিল-পাটা খুঁজে পাচ্ছ, ততক্ষণ তোমার টাকা কিছুতেই শোধ করব না আমি, তা বলে রাখছি কিন্তু।' এতক্ষণে কচ্ছপ তার রূপ প্রকাশ করল।

'বেশ আমি ওটা খুঁজছি।'

'দেখ শূয়োর, আমার সঙ্গে চালাকি করতে এসো না। আমি আমার বৌ-এর সেই শিল-পাটা চাই, অন্য কোনোটি আনলে চলবে না। এ আমি তোমায় স্পষ্টই বলে দিচ্ছি।'

ওপরে-নীচে আশে-পাশে—সব জায়গায় বন্ধু শূয়োর সেই হারিয়ে যাওয়া শিল-পাটাটি খুঁজল, কিন্তু কোথায়ও সেটা সে পেল না। কেননা, শিল-পাটাটি ছিল ঝুড়ির মধ্যে লুকিয়ে থাকা কচ্ছপ নিজেই।

তাই আজও শূয়োরকে তার নাক দিয়ে মাটি খুঁড়তে দেখা যায়। সেইদিন থেকে মাটি খুঁড়ে সে শ্রীমতী কচ্ছপের শিল-পাটা খুঁজছে। আজও সে খুঁজেই চলেছে, এখনও পায়নি। যেমন ফেরৎ পায়নি সেই টাকা অকৃতজ্ঞ কচ্ছপের কাছ থেকে।

অভিপ্রায়

আমাদের এই শ্রেণীবিভক্ত সমাজে কিছু মানুষ হৃদয়ের উদারতায় পাড়াপড়শীকে সাহায্য করে। কিন্তু উপকৃত ব্যক্তি উপকারীকে অসাধু পথে বঞ্চনাই করে। উদার মানুষ অন্যকে বিশ্বাস করে, কেননা বিশ্বাস করতেই সে শিখেছে। কিন্তু বড় করুণ

পরিস্থিতিতে তারও বিশ্বাসভঙ্গ হয়। কচ্ছপ পরে টাকাপয়সা পেয়েছে, হাটে সে দুহাতে টাকা খরচ করছে, কিন্তু তার ঋণ-শোধের ব্যাপারে সে উদাসীন। অন্যের সহৃদয়তা ও ভালমানুষীর মূল্য সে এইভাবেই দিল।

মেয়েদের ঘর-গৃহস্থালির দায়-দায়িত্ব কিছু বেশি, তাই সামাজিক অভিজ্ঞতাও প্রচুর। শূয়োরের বৌ জানিয়েছিল যে, ঋণের অর্থ শূয়োর কখনই ফেরত পাবে না। শূয়োর কিন্তু তখনও আশা ছাড়ে নি। সাংসারিক কাজকর্মে আশেপাশের পরিবারের সঙ্গে লেনদেনের ব্যাপারেই শূয়োরের বৌয়ের এই নিষ্ঠুর অথচ বাস্তব অভিজ্ঞতা জন্মেছে।

সমাজে দেখা যায়, যে ধার দেয়, ধার ফেরত চাইবার সময় তার লজ্জাই যেন বেশি। যেন টাকা ফেরত চেয়ে সে অপরাধ করছে। শূয়োরের সৌজন্য ও সংকোচের মধ্যে এই সামাজিক মনোভাবটি ফুটে উঠেছে।

মানুষের শয়তানী যে কত বীভৎস হতে পারে, তার প্রমাণ উপকারীকে যখন নির্লজ্জ অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। এই অভিযোগের পেছনে রয়েছে চক্রান্ত ও মিথ্যাচার। শিল-পাটা খুঁজে দেবার অছিলায় শূয়োরকে ঋণ-পরিশোধে অস্বীকৃতি জানাবার মধ্যে এই ঘৃণ্য মানসিকতা ফুটে উঠেছে। যে অপরাধ একটি মানুষ করেনি, তার খেসারত দিতে মাথা নিচু করে যুগ যুগ কাটাতে হচ্ছে তাকে। অপূর্ব মানবিক অভিব্যক্তিতে শূয়োরের স্বভাবের সঙ্গে এটিকে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ঋণ গ্রহণ করে সেই টাকা ফেরত না দেওয়া বোধহয় মানুষের সমাজে এক আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা। আলোচ্য পশুকথাটি এই নির্মম সামাজিক অভিজ্ঞতাকে অপরূপ রসঘন করে তুলেছে।

ট্যাঙ্গানাইকা

দেশ পরিচয়

বিভিন্ন ভাষা ও জাতিগোষ্ঠীর এক অপরূপ সমাবেশ ঘটেছে এই দেশে। দেশীয় আদিবাসীগোষ্ঠীর সংখ্যা এক শতেরও বেশি, তাছাড়া বিপুল সংখ্যায় এশীয় এবং কিছু ইউরোপীয় এখানে স্থায়ীভাবে বাস করে। আদিবাসীদের প্রত্যেকের নিজস্ব ভাষা রয়েছে, সামাজিক রীতিনীতিও বিভিন্ন। সোয়াহিলী ভাষা অবশ্য মোটামুটি সবাই বোঝে।

ট্যাঙ্গানাইকার উত্তরে উগাণ্ডা, ভিক্টোরিয়া লেক, কেনিয়া, দক্ষিণে মোজাম্বিক, নিয়াসাল্যাণ্ড, উত্তর রোডেশিয়া, পশ্চিমে কঙ্গো এবং পূর্ব দিকে রয়েছে জানজিবার, ভারত মহাসাগর। দক্ষিণে নিয়াসা, পশ্চিমে ট্যাঙ্গানাইকা, উত্তরে ভিক্টোরিয়া—তিনটি মনোরম হ্রদ, কেনিয়ার সীমান্তে অবস্থিত আফ্রিকার সবচেয়ে উঁচু পর্বত তুষার-ঢাকা কিলিমনজারো এবং ১৯,০০০ ফুট উঁচু মৃত আগ্নেয়গিরি দেশে এক বিচিত্র ভৌগোলিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছে।

সিসল দেশের অর্থনীতির এক মূল ভিত্তি। বিদেশে সিসল রপ্তানী করে দেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ সিসল এই দেশই জোগান দিয়ে থাকে। কফি তৈলবীজ তুলো চা তামাক চামড়া প্রভৃতি এ দেশের সম্পদ।

সীমাহীন ঔপনিবেশিক শোষণে জর্জরিত হয়েছে এই দেশ এবং এ ব্যাপারে আফ্রিকার অন্যান্য দেশের ইতিহাসের সঙ্গে এর কোনো তফাৎ নেই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানীর হাত থেকে এ দেশ আসে ব্রিটিশের শাসনে। তখন থেকেই স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু হয়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এই সংগ্রাম তীব্রতর হয়। বহু রক্তাক্ত পথ অতিক্রম করে অবশেষে ১৯৬১ সালের ৯ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীনতা পায়।

ট্যাঙ্গানাইকা পশুকথায় সমৃদ্ধ। অবিচার এবং অত্যাচারের অসংখ্য করুণ অভিজ্ঞতা এইসব পশুকথার মধ্যে বিধৃত রয়েছে। এদের পশুকথাগুলি সংক্ষিপ্ত অথচ অভিব্যক্তি সুগভীর।

ট্যাঙ্গানাইকার জনসংখ্যা ৯,৪০৪,০০০ ও আয়তন ৩৬১,৮০০ বর্গ মাইল।

দুষ্টু খরগোস

টলটলে জলের এক নদীর কিনারে থাকত সাদারঙের এক খরগোস। একদিন সেই সাদা খরগোস দেখতে পেল, এক পাল হাতি নদী পার হবার জন্য তীরে দাঁড়িয়েছে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় হাতিকে খরগোস বলল, 'দেখুন, আমাকে একটু নদীটা পার করে দেবেন? আমি বড়ই ছোট আর খুবই দুর্বল।'

হাতি রাজি হল। সেই হাতির কাছে ছিল একটা পাত্র, আর সেই পাত্রে ছিল মধু। হাতি মধুর পাত্রটা পিঠের ওপরে রাখল এবং খরগোসকে পিঠের ওপরে উঠতে বলল। খরগোস পিঠে ভালভাবে চেপে বসবার পরে তারা নদীতে নামল। নদীটা বেশ চওড়া। হাতিরা এগোচ্ছে সাঁতরে সাঁতরে। আর ওপরে বসে খরগোস মধু বের করে খাচ্ছে, লোভ সামলানো বড় দায়।

খেতে খেতে হঠাৎ এক ফোঁটা মধু হাতির পিঠে পড়ে গেল। হাতি বলল, 'আমার পিঠে কি পড়ল?' খরগোস সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, 'আমি তো ভয় পেয়েছি, তাই কাঁদছি। আমার চোখের জল আপনার পিঠে পড়েছে।'

বিশাল দেহ নেড়ে হাতি নদীর ওপারে গিয়ে উঠল। পিঠের ওপরে বসেই খরগোস বলল, 'খুব উপকার করলেন আমার। এখন যদি দয়া করে কয়েকটা পাথরের নুড়ি আমাকে দেন তবে খুব ভালো হয়, ওগুলো দিয়ে আমি পাখি মারব।'

হাতি শুঁড়ে করে কয়েকটা নুড়ি তুলে দিল পিঠের ওপরে। আসলে খরগোস অনেকটা মধু খেয়ে ফেলেছে, পাত্রটা হাল্কা লাগছে। তাই সে কয়েকটা নুড়ি পাত্রের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। হাতির চোখ ছোট, অতশত সে দেখতে পায়নি। তারপরে খরগোস হাতিকে বলল, 'এবার আমার নামিয়ে দিন।' নামিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে সে বলল, 'এবার আপনারা এগিয়ে যান।' হাতি এগিয়ে চলল।

বনের বাসায় পৌঁছে হাতি মধুর পাত্রটা খুলে দেখে তাতে মধু খুব অল্পই আছে, পাত্র ভর্তি নুড়ি। খুব ক্ষেপে গেল হাতি। বিশাল দেহ নেড়ে শুঁড় তুলে তক্ষুনি বেরিয়ে পড়ল খরগোসকে খুঁজতে।

খুঁজতে খুঁজতে সে দেখল বিরাট ঘন একটা গাছের নিচে বসে খরগোস কচি কচি সবুজ ঘাস ছিঁড়ে খাচ্ছে। হাতি তার দিকে এগোতেই খরগোস টুক্ করে পাশের

একটা গর্তে ঢুকে পড়ল। হাতিও এগিয়ে গেল গর্তের দিকে। বিরাট শুঁড়ের সরু আগাটা সে ঢুকিয়ে দিল গর্তের মুখে। একটু ঢুকিয়েই হাতি শুঁড় দিয়ে খরগোসের একটা পা চেপে ধরল। খরগোস বিপদ বুঝে বলে উঠল, 'আমার মনে হয়, হাতি একটা শেকড়কে চেপে ধরেছে।'

একথা শুনেই হাতি খরগোসের পা ছেড়ে দিয়ে শুঁড় বেঁকিয়ে গর্তের মধ্যেকার একটা শেকড়কে জড়িয়ে ধরল। খরগোস তখন চীৎকার করে বলে উঠল, 'মরে গেলাম, মরে গেলাম। আর কোনোদিন এ কাজ করব না। আমার পা ভেঙে গেল, চুরমার হয়ে গেল।

হাতি ভাবল এবার নিশ্চয় সে খরগোসের পা ধরতে পেরেছে। সে প্রাণপণে টানতে লাগল। কিন্তু সেই শক্ত শেকড় সে কিছুতেই টেনে তুলতে পারছে না। খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ল সে। রাগে লাল হয়ে আছে হাতি, তাই সেও সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। আরও জোরে সে টানতে লাগল খরগোসের পা-ভাবা সেই শেকড়কে। শেষকালে অনেকটা মাটির চাঁইয়ের সঙ্গে গাছের শেকড় উপড়ে এল। হাতি টাল সামলাতে না পেরে একটু পিছনে হেলে পড়ল। আর সেই ফাঁকে খরগোস তিরিং করে লাফিয়ে পালিয়ে গেল।

খরগোস ছুটছে। প্রাণভয়ে পড়িমরি করে সে পালাচ্ছে। পথে দেখা হল আগুন-বাঙা কয়েকটা বেবুনের সঙ্গে। তারা বলল, 'কি ব্যাপার? এত ছুটছো কেন?'

খরগোস বলল, 'এক বিরাট হাতি আমায় তাড়া করেছে।'

বেবুনরা বলল, 'কিচ্ছু ভয় নেই। তুমি গাছের ঐ ছোট্ট কোটরের মধ্যে চুপটি করে বসে থাক। তোমাকে আমরা হাতির সামনে ছেড়ে দেব না, ঠিক বাঁচাব।' হাঁপাতে হাঁপাতে খরগোস গাছের ছোট্ট কোটরে ঢুকে পড়ল।

এমন সময় শুঁড় তুলে হাতি সেখানে এসে দাঁড়াল। সে বলল, 'আচ্ছা, এই পথ দিয়ে কোনো খরগোস ছুটে পালিয়েছে?'

একটা বেবুন বলল, 'হ্যাঁ, একটা খরগোস এই খুব কাছেই লুকিয়ে আছে। আমরা আপনাকে তার লুকোবার জায়গাটা বলে দিতে পারি। কিন্তু তার বদলে আপনি কি দেবেন আমাদের?'

'তোমরা যা চাইবে আমি তাই দেব,' হাতি বলল।

'কিন্তু খরগোসকে দেখবার আগেই কিন্তু সেটা দিতে হবে.' বেবুন বলল।

'ঠিক আছে,' হাতিও চটপট জবাব দিল।

বেবুন বলল, 'এই যে পেয়ালাটা দেখছেন, এই পেয়ালা ভর্তি আপনার দেহের রক্ত দিতে হবে।'

বিরাট হাতি ঐ ছোট্ট পেয়ালা দেখে শুঁড় নেড়ে একটু তাচ্ছিল্য ভাবে হেসে বলল, 'রক্ত নাও।'

একটা বেবুন ঘর থেকে ছোট একটা তীর-ধনুক নিয়ে এল। আর একটা বেবুন ধনুক দিয়ে তীরটা ফুটিয়ে দিল, হাতির গলায় ঠিক শুঁড়ের পাশে। রক্ত ঝরতে লাগল ঝরণার মত। বেবুন পেয়ালাটা রাখল হাতির গলার নিচে। বেশ কিছুক্ষণ রক্ত ঝরবার পরে হাতি পেয়ালার দিকে তাকিয়ে দেখল তখন মাত্র পেয়ালাটার অর্ধেকটা ভরেছে। আসলে বেবুন পেয়ালার নিচে একটা বড়ো ফুটো করে রেখেছিল। তাই রক্ত যতই পেয়ালায় পড়ুক না কেন, ফুটো দিয়ে তা মাটিতেই ছড়িয়ে পড়ছিল।

বেবুন ঠাট্টা করে বলল, 'বেশ মজার ব্যাপার তো! এত বড় দেহ আর আধ পেয়ালা না ভরতেই হাঁপিয়ে উঠলেন? আসলে আপনি ভয় পেয়ে গিয়েছেন, কোনো সাহস নেই আপনার।'

ঐটুকু বেবুনের মুখে ঠাট্টা শুনে হাতি রেগে গেল। বলল, 'তোমার কোনো চিন্তা নেই। যতক্ষণ পেয়ালা না ভরে আমি রক্ত ঢেলে দিচ্ছি।'

একথা শুনে বাঁকা হাসি হেসে বেবুন রক্ত ধরতে লাগল। আরও কিছুক্ষণ কেটে গেল তবু পেয়ালা ভর্তি হল না। আর কেমন করেই বা হবে? হাতি ছোট বেবুনদের সামনে লজ্জায় কিছু বলতেও পারছে না। শেষকালে হাতির পাগুলো কাঁপতে লাগল, চোখ কেমন ঘোলাটে আবছা হয়ে এল, কানদুটো কয়েকবার থরথরিয়ে উঠল, আর সে ধপ করে মাটিতে বসে পড়ল। শুঁড়টাকে কয়েকবার এধার ওধার নাড়ল। তারপর স্থির হয়ে গেল। অনেক রক্ত ঝরেছে, তাই হাতি মরে গেল।

কোটর থেকে খরগোস সব দেখছিল। সে বুঝল, এখন আর কোনো বিপদ নেই। সে বেরিয়ে এল কোটর থেকে। তাকে বাঁচাবার জন্য বেবুনদের অনেক ধন্যবাদ জানাল তারপরে মোটা লেজ নাচিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে বনের পথে চলে গেল।

অভিপ্রায়

সমাজে এক শ্রেণীর মানুষ রয়েছে যারা অন্যের শ্রমে সংগৃহীত দ্রব্যে ভাগ বসাতে কখনও দ্বিধা করে না। এজন্য চৌর্যবৃত্তি ও বঞ্চনার পথ গ্রহণ করতে আর কোনো লজ্জা হয় না। খরগোস মধু খেয়ে মুড়ি রেখে হাতিকে বঞ্চনা করেছে। এর জন্য সে অনুতপ্ত নয়, কেননা সমাজের কাঠামো তাকে এই স্বভাবে অভ্যস্ত করে তুলেছে।

প্রবঞ্চিত মানুষ রুষ্ট হয়ে প্রতিশোধ নিতে চায়। কিন্তু ধুরন্ধর চক্রান্তকারীর কাছে বুদ্ধির মারপ্যাঁচে সে হেরেও যায়। সহজ মানুষ সরলভাবে জীবন কাটায়, অত কৌশল সে আয়ত্ত করতে শেখে নি। পায়ের বদলে শেকড় ধরে হাতি তার সরল মনের পরিচয় দিয়েছে। দৈহিক শক্তির অটুট সম্পদ থাকা সত্ত্বেও পরজীবী খরগোসের বুদ্ধির কাছে তাকে হারতে হয়েছে।

জমির কৃষক কিংবা খামারের ক্রীতদাস হয়ে উপনিবেশের মানুষকে রক্ত ঝরাতে হয়েছে। প্রথমে সে সম্মত হতে বাধ্য হয় প্রভুর কৌশলী চালে। সরল মনে সে ভাবে, দেহের শ্রম ঝরিয়ে তার মুক্তি ঘটবে। দুদিনের পরিশ্রমের শেষে একদিন সে মানুষের মত জীবন নিয়ে বাঁচতে পারবে। যে রক্ত ঝরানো শুরু হয় ফোঁটা ফোঁটা করে, শোষনের বীভৎস লোভ একদিন তার দেহের সমস্ত রক্ত নিঙড়ে, ছিবড়ে করে ফেলে দেয়। অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু ঘটে তার কিংবা জীবন্মৃত হয়ে বেঁচে থাকে। হাতি বলল, 'রক্ত নাও।' কিন্তু সুকৌশলী শোষকের হৃদয়হীন কৌশল তার অজানা। খনিতে-খামারে-জমিতে-জঙ্গলে সাধারণ মানুষের ক্ষয়ে যাওয়ার এই চরম বেদনাময় অভিজ্ঞতা লোকসমাজের রয়েছে। হাতির মৃত্যুদৃশ্যের মধ্যে সেই করুণ ছবি ফুটে উঠেছে। পা কাঁপছে, চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে, কান থরথরিয়ে উঠেছে, ধপ করে মাটিতে বসে পড়েছে, তারপর স্থির হয়ে গেছে—এ অনুভূতি তাদের একান্ত আপনার।

আর অন্যদিকে শয়তান খরগোস মোটা লেজ নাচিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে বনের পথে চলে গেল। শোষিত মানুষের মৃত্যুতে শোষকের কোনো ভাবান্তর হয় না। সাদারঙের খরগোস ও আগুন-রাঙা বেবুন—এদের দেহের রঙ মনে পড়িয়ে দেয় ইউরোপীয় উপনিবেশবাদীদের কথা। এ বিশেষণ বড় সচেতন প্রয়োগ, এ রূপক তুলনাহীন। সাদা এবং আগুন-রাঙা রঙের এই পারস্পরিক বন্ধুত্ব লক্ষ্যণীয়, একই শ্রেণীর মানুষ অত্যাচারে গাটছড়া বাঁধে।

সাধারণ মানুষের সম্পদ তার দৈহিক শক্তি, তবু সে হেরে যায় সমাজ বিকাশের বিচিত্র প্রক্রিয়ায়। সাধারণ মানুষের সম্পদ তার শ্রম, তবু শ্রমশক্তি নিঃশেষ করেও সে নিজেকে বাঁচাতে পারে না শোষণের হাত থেকে। হাতির সব ছিল তবু তাকে মরতে হয়েছে। লোকসমাজ প্রতিদিন এ ঘটনা দেখে চলেছে।

অ্যাংগোলা

দেশ পরিচয়

কয়েক শতাব্দীর নিষ্ঠুর ক্ষত ও বেদনা বুকে নিয়ে চরমতম দারিদ্র্য এবং অপমানের মধ্যে দিন কাটাতে বাধ্য হয়েছে অ্যাংগোলা। আফ্রিকার প্রতিটি দেশই উপনিবেশবাদী শোষণে জর্জরিত, কিন্তু অ্যাংগোলা বোধহয় সবরকম অবিচার ও অত্যাচারের এক উর্বর ক্রীড়াভূমি।

সুন্দর দেশ এই অ্যাংগোলা। উত্তরে কংগো, গাবোন, দক্ষিণে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা, পূর্বে রোডেশিয়া আর পশ্চিমে অতলান্তিক মহাসাগর। পশ্চিম অংশের সমস্ত উপকূলভূমিতে আছড়ে পড়েছে এই মহাসাগর। দেশের এই অংশ এবং নদী এলাকার জমিগুলো অসাধারণ উর্বর, যদিও কংগোর সীমান্তে একহাজার মাইল ও দক্ষিণ অংশ খুব শুকনো, কেননা এখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সামান্য।

দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে কফি ভেষজ-তেল তুলো সিসল চিনি ও ভুট্টা হয়। খনিতে রয়েছে প্রচুর কয়লা বক্সাইট ট্যানটালাম হীরে এবং সোনা। কিন্তু সম্পদের এই প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও এদেশের মানুষ নিঃস্ব। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজ উপনিবেশবাদীরা এদেশে আসে। সমুদ্রের তীরে তীরে এখানে মজবুত উপনিবেশ গড়ে তোলে। সব সম্পদ চলে যায় পর্তুগালে। খনি খামার আর কারখানায় যারা কাজ করে তারা ক্রীতদাসের জীবন কাটায়। অন্যেরা ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন গ্রামে ছোট ছোট গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বাস করে। পর্তুগীজরা সবাইকেই বাধ্য করেছে বিনা মজুরিতে শ্রমদান করতে। যখন খুশি যে কোনো অ্যাংগোলাবাসীকে মেরে ফেলবার এক সুন্দর অধিকার তারা অর্জন করেছে। ষোল থেকে ষাট বছর পর্যন্ত প্রতিটি শ্রমিককে তার আয়ের এক-তৃতীয়াংশ 'দেশীয় কর' হিসাবে দিতে হয়।

অ্যাংগোলার মানুষ অবশেষে জেগে উঠেছে। মরতে তাদের কোনো ভয় নেই, কেননা প্রতি মুহূর্তে তারা মৃত্যুকে দেখছে। সমগ্র জাতি তাই মাথা উঁচু করে হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছে উপনিবেশবাদীদের দেশ থেকে উৎখাত করার সংগ্রামে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই এই স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু হয়, কিন্তু ১৯৬০ সাল থেকে অসংখ্য রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর তারা দেশের অনেক অংশ মুক্ত করে এবং মুক্ত এলাকায় স্বাধীন অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। দেশের অন্যান্য অংশও ক্রমান্বয়ে মুক্তি সংগ্রামে উত্তাল হয়ে

ওঠে। অবশেষে দেশ স্বাধীন হয় ১৯৭৬ সালে।

কয়েক শতাব্দীর এক অমানুষিক উপনিবেশিক শোষণ অ্যাংগোলার জনগণের সাংস্কৃতিক জীবনের ওপরে গভীর প্রভাব ফেলেছে। এক উন্নত আদিবাসী সংস্কৃতির তারা উত্তরাধিকারী এবং তারই সঙ্গে এসে মিশেছে এই অবিচার আর বেদনার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা। তাই তাদের পশুকথার বিষয়বস্তুও এইসব অভিজ্ঞতা-অভিমান-ক্রোধ থেকে উৎসারিত হয়েছে। নদী সমুদ্র আর বনভূমির প্রাকৃতিক পরিবেশে তাদের পশুকথাগুলোও শিল্পকর্মে অনন্য হয়ে উঠেছে। এখানকার গ্রামীণ আদিবাসী মানুষের গল্পবলার ভঙ্গি ও কৌশলটি বড় সুন্দর এবং আন্তরিক।

অ্যাংগোলার এলাকা ৪৮১,৩৫১ বর্গ মাইল ও লোকসংখ্যা ৮, ৪৪১, ৩১২ জন।

পশুকথা

পোষা পশুপাখির বিশ্বাসঘাতকতা

সেকালের কথা সবাই ভুলে গিয়েছে। সেই ভুলে-যাওয়া পুরাণকালে সব পশুপাখি মিলেমিশে আকাশে বাস করতো। তাদের মধ্যে খুব ভাব ছিল, কেউ কাউকে হিংসে করতো না। মনের সুখে তাদের দিন কাটতো। বিপদে-আপদে সবাই সবাইকে দেখাশোনা করতো।

এমনি করে দিন কাটে, রাত কাটে। একদিন শুরু হল বৃষ্টি। বৃষ্টি আর থামে না, অঝোরে জল পড়েই চলেছে। এমন বৃষ্টি তারা দেখেনি। বৃষ্টির সঙ্গে দমকা হাওয়া আর হাওয়ার দাপটে তারা শীতে ঠক্ঠক্ করে কাঁপছে, এমন কাঁপুনি যে মনে হল তারা বুঝি মরেই যাবে।" আর কতক্ষণ সহ্য করা যায় এমন শীত!

কাঁপতে কাঁপতে পাখিরা বলল, 'ভাই কুকুর! তুমি তো খুব জোরে ছুটতে পারো, তোমার তো শীতও কম লাগে, তুমি নিচে পৃথিবীতে দৌড়ে যাও। কিছুটা আগুন নিয়ে এসো। আগুনে আমরা শরীর গরম করি, নইলে যে সবাই মারা পড়ি।'

কুকুর সব শুনল। বন্ধুদের জন্য আগুন আনতে সে দৌড় দিল। প্রচণ্ড তার গতি, দুর্বার তার বেগ। কিছুক্ষণ পরেই সে পৃথিবীতে পৌঁছে গেল। তাকে যে আগুন নিয়ে যেতে হবে, বন্ধুরা যে শীতে কাঁপছে! আগুনের খোঁজ করতেই কুকুরের

চোখে পড়ল, মাঠের মধ্যে কয়েকটা মাংসের হাড় আর কতকগুলো মাছ পড়ে রয়েছে। লোভে তার জিব বেরিয়ে এল। জিব থেকে জল গড়াতে লাগল। ভুলে গেল আগুনের কথা, ভুলে গেল বন্ধুদের কাঁপুনির কথা, ভুলে গেল কেন সে এখানে এসেছিল। সব ভুলে কুকুর হাড আর মাছ চিবোতে লাগল। খাওয়ার আনন্দে আধবোজা চোখে সে শুধু হাডই চিবোতে লাগল।

আকাশে পশুপাখিরা কাঁপতে কাঁপতে চেয়ে আছে কুকুরের ফেরার আশায়। এই বুঝি কুকুর আসে, মুখে তার জ্বলন্ত আগুন। আহ্! সেই আগুনে গরম হবে শরীর, শীত পালাবে দূরে। তাকিয়েই থাকে তারা, বন্ধু কুকুর কিন্তু আসে না। অনেক সময় কেটে যায়, তবু কুকুর ফেরে না।

কি আর করে! উপায় না দেখে পশুপাখি সবাই মিলে মোরগকে বলল, 'ভাই মোরগ! কুকুর তো এলো না, এদিকে আমরা যে শীতে মরি। তুমি তো ধনুকের তীরের মত নিচে নেমে যেতে পারো। তুমিই পৃথিবীতে গিয়ে তাড়াতাড়ি কিছু আগুন নিয়ে এসো। তুমি গেলেই তাড়াতাড়ি ফিরতে পারবে।'

মোরগ সব বুঝল। কুকুরের ব্যবহারে মোরগ বেশ রেগে গেছে। রাগের চোটে লাল-ঝুঁটি নেড়ে মোরগ ধনুকের তীরের মতো ছুটল পৃথিবীর পথে। পশুপাখি ওপর থেকে দেখল, পা দুটো সোজা রেখে ঝুঁটি লম্বা করে উঁচিয়ে মোরগ নেমে চলেছে, নেমেই চলেছে। পৃথিবীর পথে আরও এগিয়ে চলল মোরগ, ওপর থেকে মেঘের ধোঁয়ায় আর তাকে দেখা গেল না। কিছুক্ষণ পরেই মোরগ পৌঁছে গেল পৃথিবীতে। তাকে যে আগুন নিয়ে যেতে হবে, বন্ধুরা যে শীতে কাঁপছে!

আগুনের খোঁজ করতেই এক গাছের তলায় মোরগ দেখল অনেক শস্যদানা, অনেক গম আর ছোট ছোট ফল ছড়িয়ে রয়েছে। লোভে মোরগের গলা থেকে অদ্ভুত শব্দ বেরিয়ে এল, লম্বা লম্বা পায়ে ঝুঁটি নামিয়ে এগিয়ে গেল খাবারের দিকে। শক্ত ঠোঁটে ঠুকে ঠুকে মুখে পুরতে লাগল সেইসব শস্যদানা। ভুলে গেল আগুনের কথা, ভুলে গেল বন্ধুদের কাঁপুনির কথা, ভুলে গেল কেন সে এখানে এসেছিল। সব ভুলে মোরগ খাওয়ার আনন্দে গাছের তলা চষে ফেলতে লাগল। মোরগ কুকুরের কোনো খোঁজ নিল না, নিজেও আগুন বয়ে নিয়ে যেতে ভুলে গেল।

তুমি যদি সন্ধ্যের সময় কান পেতে শোনো, তবে শুনতে পাবে গাছের ডালে ডালে পাখিরা গান গাইছে, কিচির-মিচির করছে। এ কিন্তু পাখিদের গান নয়, এ পাখিদের কিচির-মিচির নয়। তারা ঐ শব্দের মধ্যে বলে চলেছে—'কুকুর লোভে পড়ে ক্রীতদাস হয়ে গেল, মোরগ লোভে পড়ে ক্রীতদাস হয়ে গেল। হায়! হায়!'

তাই তোমরা দেখতে পাবে, সব পাখি কুকুর আর মোরগদের দেখলেই

তাদের ভাষায় গালাগাল দেয়, তাদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে। পাখিরা গালাগাল দেয়, বিদ্রূপ করে, কেননা তারা আজও ভুলতে পারেনি যখন কুকুর আর মোরগ বন্ধুদের কথা ভুলে গিয়ে, তাদের আকাশে ছেড়ে এসে নিজেদের দেহ গরম করেছে, নিজেরা পেটপুরে খেয়েছে, তখন তাদেরই বন্ধু সমস্ত পশুপাখিরা শীতে কেঁপেছে, হাওয়ার দাপটে মরে যেতে বসেছে, আগুনের অভাবে তাকিয়ে থেকেছে পৃথিবীর পথে, যে পথে তাদের বন্ধু দুজন গিয়েছে কিন্তু আর কখনো ফেরেনি।

কুকুর ও মোরগ সেইদিন থেকে ঘরের পোষা পশু ও পাখি হয়ে গেল। তারা হল গৃহপালিত।

অভিপ্রায়

গোষ্ঠীভুক্ত মানুষ নানা রকমের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও দুরবস্থার মধ্যে বাস করতে বাধ্য হয় তারা আশা করে, সবাই মিলেমিশে থাকবে, একে অপরের বিপদে-আপদে পাশে দাড়াবে। কিন্তু বাস্তবে সেটা আর হয় না। তারা স্বপ্ন দেখে, এক সময়ে সবাই সুখে-শান্তিতে ভাইয়ের মত বাস করত। তারপরে তাদের জীবনে এল বৃষ্টি, দুর্দিনের বছর। দুর্দিনে কিভাবে ভুগতে হয় তার চিত্র রয়েছে অবিরাম বৃষ্টি আর দমকা হাওয়ার কাঁপুনির প্রতীকের মধ্যে।

মানুষ সুদীর্ঘকালের বেদনাময় অভিজ্ঞতায় বুঝেছে, লোভ বড় সাংঘাতিক। এই লোভের প্রকোপে মানুষ নিচ ও হীন হয়, অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে, স্বার্থপর হয়ে ওঠে। মানুষ স্বভাবতই ভাল, কিন্তু লোভের সর্বনাশা কামড়ে সে স্বজনকেও ভুলে যায়। এই বিধ্বংসী লোভ তাকে ক্রীতদাস করে তোলে। লোভকে দমন করাও বড় শক্ত।

কুকুর ও মোরগ মন্দ লোক নয়। তারা তাদের আপনজনের জন্য কষ্ট স্বীকার করতে দ্বিধা করেনি। কিন্তু লোভ তাদের সব ভুলিয়েছে। বিশেষ করে দুর্দিনের পরে সুদিনের মুখ দেখে তারা আত্মজনকে ভুলেছে। অনাহার আর কাঁপুনি থেকে ভালো অবস্থায় এসে তারা আর পূর্বের অবস্থায় ফিরে যেতে চায়নি। এরকম হওয়া উচিত নয়, কিন্তু সমাজে যে তাই ঘটে যায়।

মানুষ আশায় বসে থাকে, শেষে তার মোহ ভাঙে। পশুপাখিরা আশায় পৃথিবীর,বুক থেকে ফিরে-আসা কুকুর মোরগের পথের দিকে তাকিয়েছিল, তারা ফিরবে না এটা ভাবতে চায় নি। কিন্তু মোহ তাদের ভেঙেছে।

অ্যাংগোলার শোষিত মানুষ সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করে ক্রীতদাসত্বকে। যুগ যুগ ধরে এই দাসত্বকে বহন করতে হচ্ছে বলেই তার এত বিদ্বেষ। মনিবের কাছে গৃহপালিত পশুপাখি ক্রীতদাস ছাড়া আর কি? তার মরা-বাঁচা মনিবেরই হাতে। লোভের বশে নিজের সুখের জন্য কুকুর মোরগ ক্রীতদাস হয়েছে। তাই আবহমান-কাল ধরে বনের স্বাধীন পশুপাখি কুকুর-মোরগকে দেখলে বিদ্রূপ করে, গালাগাল দেয়। স্বাধীন চেতনার প্রতি অটুট বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা অ্যাংগোলার আদিবাসী মানুষকে দাসত্বলোভের প্রতি ঘৃণা ও ব্যঙ্গ করতে শিখিয়েছে। না-মেটা আশার এমন করুণ অভিব্যক্তি পশুকথাটিতে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছে।

ক্যামেরুন

দেশ পরিচয়

আদিম বনভূমির প্রশান্ত ছায়ায় ঘেরা আফ্রিকার এই দেশ। পর্তুগীজ জলদস্যু আর উপনিবেশবাদীরা এই দেশের উপকূলভাগে ও নদীর গভীর খাড়িতে দেখেছিল অসংখ্য চিংড়ি মাছ। বিস্মিত হয়ে এ দেশের নাম রেখেছিল ক্যামারাওস, অর্থাৎ চিংড়ি মাছ। সেই থেকে দেশের নাম হয়ে গেছে ক্যামেরুন।

ক্যামেরুনের উত্তরে চাদ, দক্ষিণে গাবোন ও কংগো, পশ্চিমে অতলান্তিক মহাসাগর ও নাইজিরিয়া, পূর্বে কংগো, উবাংগি-শারি ও উবাংগি নদী। দেশের মাঝখানে ক্যামেরুন পর্বত, উচ্চতা ১৩,৫০০ ফুট।

দীর্ঘদিন ধরে এই দেশ ফরাসী ও ইংরেজের উপনিবেশ ছিল। এই দীর্ঘ শোষণে দেশের কোনোভাবে কোনো উন্নতি ঘটে নি, বরং দুই রাষ্ট্রের অধীন থাকার ফলে দুটি ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতা ও ভাষা এবং দু'রকম সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠেছে। দুই ধরণের মুদ্রা ও ওজন, করপ্রথা, আন্তঃশুল্ক ব্যবস্থা ও শাসনব্যবস্থা দেশে এক জটিল অবস্থার সৃষ্টি করেছে। উত্তর ক্যামেরুন স্বাধীন হয় ১৯৬০ সালের ১ অক্টোবর, পশ্চিম অংশ স্বাধীন হয় ১৯৬১ সালের ১ অক্টোবর। তবু আজও দুই ক্যামেরুনের মধ্যে রয়েছে বিচিত্র ও বিভিন্ন ধরণের বিভেদ যার বিষাক্ত বীজ রোপন করে গিয়েছে ফরাসী ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা।

বনভূমি ও কৃষি আজও শতকরা নব্বইজনের উপজীবিকার আশ্রয়কেন্দ্র। দেশের উত্তরাংশ উর্বর, কিন্তু পশ্চিমাংশে রয়েছে বিস্তৃত অনুর্বর এলাকা। কলা জলার ধান বাদাম ভুট্টা এবং কফি কৃষিজাত দ্রব্য। আর আছে অফুরন্ত কাঠ। এত সম্পদ থাকতেও দেশের লোক আজও অর্ধাহারে-অনাহারে সীমাহীন দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটায়। কেননা, সমস্ত জমি বিরাট বিরাট সামন্তপ্রভু, আদিবাসী সর্দার, অসংখ্য সুলতান এবং বিদেশী ইংরেজদের করায়ত্ত। দেশের রাজনীতির ধারক এরাই, এরাই দেশের ভাগ্য-নিয়ন্তা। সামন্তশোষণ আজও ক্যামেরুনের অভিশাপ এবং এই শোষণ সেই মধ্যযুগের ব্যবস্থাকেই টিকিয়ে রেখেছে। খুব স্বাভাবিকভাবেই তাই স্বাধীনতার পরেও দেশের অগ্রগতি তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

ক্যামেরুনের মানুষ বিভিন্ন গোষ্ঠী ও ভাষায় বিভক্ত রয়েছে। গোষ্ঠীপতিদের

আদেশ ও নির্দেশ মেনে চলাই দেশের স্বাভাবিক নিয়ম। দেশবাসী অত্যন্ত পরিশ্রমী। দারিদ্র এদের প্রতিদিনের সাথী। দুর্ভিক্ষ লেগেই রয়েছে। তাই তাদের পশুকথার মধ্যে এই বিপর্যস্ত পরিস্থিতির কথা বারবার এসেছে, ক্ষোভ-হতাশা-বেদনার ছবিই সব চাইতে বেশি ফুটে উঠেছে।

দেশের আয়তন ১৮৩, ০৮০ বর্গ মাইল এবং জনসংখ্যা ৪, ৯০৭,০০০।

পশুকথা

সবজান্তা বন্ধু

অনেক অনেককাল আগে পশুদের রাজ্যে এক ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। তখন যারা খুব বুড়ো হয়ে গিয়েছিল তারাও সেরকম আকাল আগে কোনোদিন দেখেনি। এক ফোঁটা বৃষ্টি হয়নি সে বছরে। মাটি শুকনো খটখটে, সূর্যের তাপে ফসলের জমি ফুটিফাটা হয়ে গিয়েছে। জলের অভাবে জমিতে কোনো ফসল ফলেনি। গাছের সব পাতা খসে পড়েছে, গাছের বাকল ফেটে কুঁকবে ঝুলে পড়েছে, সুন্দর সবুজ গাছগুলোকে শুকনো কাঠের মত দেখতে লাগছে। মাঠের ঘাসগুলো জলে-পুড়ে খাক হয়ে গিয়েছে, ধুলো-মাটি উড়ছে। রোদের তাপ এত প্রখর যে বাইরে বেরুনো যায় না, দেহ পুড়ে যায়। রাতে শুকনো হাওয়া, হাওয়ায় গলা শুকিয়ে যায়, নাক-চোখ জ্বালা করে। সে এক সর্বনেশে আকালের দিন, আকালের রাত।

সব রকমের পশু সব জায়গায় খিদের জ্বালায় ছটফট করছে। তারা আর্তনাদ করে বলছে, 'এখন আমরা কি করি? এখন আমরা কি করি?' পেটে ভীষণ ব্যথা, গা বমি বমি করছে। খিদের অসহ্য যাতনায় পশুরা দিশেহারা হয়ে পড়েছে।

দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে, কিন্তু আকাশে বৃষ্টির কোনো লক্ষণ নেই। আকাশে এতটুকু মেঘের দেখা নেই, আগুনের গোলার মত সূর্য তাপ ছড়াচ্ছে, ঝলসে যাচ্ছে দিক থেকে দিগন্ত। এ আকাল শেষ হবে বলে মনে হচ্ছে না। এদিকে খাবারের কিছুই নেই, সব শেষ হয়ে গিয়েছে, বাকি নেই একরত্তি।

সিংহের এত খিদে পেয়েছে যে খিদের জ্বালায় রাগে সে গর্জন করে উঠতে চেষ্টা করল। কিন্তু আওয়াজ করতেই গলা ধরে গেল, এমন কাঁপতে লাগল [illegible]

করে যে তার মনে হল সে বুঝি মরেই যাবে। দুর্বল দেহে অল্প অল্প আওয়াজ করে সে বলল, 'উঃ! কেউ যদি আমাকে একটু গোরুর মাংস দিত।'

সিংহী দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বিরক্ত হয়ে বলল, 'বাঃ বাঃ! সারাদিন বসে বসে শুধু হা-হুতাশ করলে অমনি খাবার আসবে? কিছু একটা ব্যবস্থা করতে পার না?'

'কি ব্যবস্থা, গিন্নী?'

'নিজেকে তো খুব জাহির কর, তুমি হচ্ছে পশুর রাজা! পশুরাজ না ছাই!' মুখ ঘুরিয়ে সিংহী বলল।

এরকম কথা সিংহ কোনোদিন শোনে নি। এরকম কথা কেউ কোনোদিন তাকে শোনায়নি। সে তো এমন কথা শুনতে অভ্যস্ত নয়। তবু আজ তাকে এসব শুনতে হচ্ছে। তার অভিমানে বড় আঘাত লাগল। কিন্তু কি আর করা। দুর্বল শরীরেও সিংহ ঘুরে দাঁড়াল, ফোলানো কেশর নেড়ে সে বলল, 'ঠিক আছে, দেখি কি করতে পারি। কিছু করতেই হবে।'

'তাই নাকি।' পেছন থেকে সিংহী ঠাট্টা করে উঠল।

গুহা থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে সিংহ বলল, 'দেখতেই পাবে কিছু করতে পারি কিনা।'

যেতে যেতে সিংহ ভাবল আজ যদি আমি আগের মত তেজী থাকতাম, আমার গায়ে যদি আগের মত জোর থাকত, তাহলে কি আর সিংহীকে আমি অমন করে কথা শোনাতে দিতাম? কিন্তু কেন এমন হল? সে তো এমন ছিল না? সিংহী ছিল খুব শান্ত মেজাজের গৃহিনী, এমন ভালো বৌ আর হয় না। কি সুন্দর স্বভাব ছিল আমার বৌয়ের। আসলে আকালের দিনে খেতে না পেয়ে পেয়ে, খিদে সহ্য করতে করতে সিংহীর মেজাজ এমন রুক্ষ হয়ে গেল। পেটের জ্বালায় তাই আজ সিংহী আমাকে এমন কড়া কথা শোনাল। আকালে সবারই মেজাজ এমন হয়। কি যে আমাদের হয়ে গেল!

এইসব ভাবতে ভাবতে সিংহ এগিয়ে চলল বনের পথে। আস্তে আস্তে সে এগোচ্ছে আর ভাবছে। ভাবছে আর এগোচ্ছে।

বাঘের গুহার পাশ দিতে যেতেই সিংহ শুনতে পেল ভেতরে খুব হৈ-হট্টগোল হচ্ছে। দাঁড়িয়ে পড়ল সিংহ, শুনতে লাগল ভেতরের কথাবার্তা।

'কুঁড়ের বাদশা কোথাকার! ওঠো ওঠো। লজ্জা করে না? পাথরের মত শুধু বসে আছো? যাও, গিয়ে কিছু খাবার-দাবার জোগাড় করে আনো। কত আর ঝিমোবে? আমি খিদের জ্বালায় মরে গেলাম, দেখতে পাচ্ছো না? এবার ঠিক মরেই যাবো। বেরোও গুহা থেকে।'

গলায় যত জোর আছে তাই নিয়ে বাঘিনী কেবল চিৎকার করছে। সব শক্তি তার গলায় আওয়াজে ফেটে পড়ছে। গুহা কাঁপছে। বাঘিনীর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? সিংহ অবাক হয়ে ভাবছে, খালি পেটে এই আকালের দিনে বাঘিনী এত জোরে চিৎকার করছে কেমন করে? সিংহ বুঝতে পারল না, সে শুধুই অবাক হয়।

বাঘ থতমত খেয়ে বাঘিনীকে বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি এক্ষুণি কিছু খাবার নিয়ে আসছি।'

'কোথা থেকে আনবে?' ঝাঁঝাল শব্দ বেরিয়ে আসে বাঘিনীর মুখ থেকে।

বাঘ গরগর করল, উত্তর দিল না। বেরিয়ে এল গুহা থেকে। সে এত রোগা হয়ে গিয়েছে যে তার সুন্দর হলুদ ডোরা-কাটা নরম মোলায়েম চামড়ার মধ্যে দিয়ে হাড়গুলো দেখা যাচ্ছে, সেগুলো একটা একটা করে গোনা যায়। এত দুর্বল হয়ে পড়েছে যে বাঘ হাঁটতেই পারছে না। মনে হচ্ছে যেন একটা বাঘের জ্যান্ত কঙ্কাল আস্তে আস্তে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগোচ্ছে।

বাইরে আসা মাত্র সিংহ বাঘকে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করল, 'বন্ধু, তোমার গুহায় কি হয়েছে? তুমি এমন ভাবে বেরিয়েই বা এলে কেন?'

বাঘ গুহার দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'ওখানে খুব গরম হাওয়া বইছে।'

সিংহ বলল, 'বুঝেছি ভাই। আমারও যে একই দশা। আমি কিছুতেই আর গুহায় ফিরে যাব না যতক্ষণ না কিছু খাবার জোগাড় করতে পারছি। কিন্তু কেমন করে জোগাড় করব তা আমি জানি না।'

বাঘ দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'বন্ধু, আমরা এক পথেরই পথিক। এসো, আমরা একসঙ্গে পথ চলি। কিন্তু বন্ধু, খালি পেটে আমি যে কিছুই চিন্তা করতে পারছি না। আর যে পারি না।'

চলতে চলতে তারা থামছে। থামছে আবার চলছে। পথ ভীষণ দীর্ঘ বলে মনে হচ্ছে। এমন সময় তারা দেখল বনের পথে দুলকি চালে হাতি আসছে। কিন্তু ঐ দুলকি চালও আজ কেমন বেমানান লাগছে। কাছে এসে হাতি থামল। দুঃখের কথা সেও জানাল। সেই একই করুণ দশা তারও।

'তাহলে এখন আমরা কি করব?' সিংহ জিজ্ঞেস করল।

আর তারা পারে না। তিনজনেই মাটিতে বসে পড়ল। মাথা নাড়তে লাগল। আকাশের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। হঠাৎ হাতি কেমন চিঁ চিঁ করে ডেকে উঠে শুঁড়টা অল্প তুলে নামিয়ে নিল। তারপর বাঘ আর সিংহের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'একটা বুদ্ধি মাথায় এসেছে। আচ্ছা, আমরা কেন কচ্ছপের কাছে যাচ্ছি না?'

'খুব ভাল বুদ্ধির কথা। খাঁটি কথা।' সিংহ বলল।

বাঘ পায়ে ভর দিয়ে উঠে বলল, 'কচ্ছপ হ'ল সবজান্তা। তার খুব বুদ্ধি। একটা কিছু উপায় সে ঠিক বের করতে পাববে। আর যদি সে কোনো উপায় বলে দিতে না পারে, তবে তাকেই আমার খাবার বানিয়ে ফেলব। তার মাংস বাঘিনীর জন্য নিয়ে যাব। চমৎকার বুদ্ধির কথা।'

তিনজনে চলল কচ্ছপের কাছে। দূর থেকে তারা দেখতে পেল, কচ্ছপ তার বাড়ির সামনে বসে রয়েছে। তারা সব খুলে বলল আর বুদ্ধি চাইল কচ্ছপের কাছে। লম্বা গলা নেড়ে নেড়ে খুব মন দিয়ে কচ্ছপ সব শুনল। লম্বা গলা ভেতরে ঢুকিয়ে চোখ-মুখ একটু বের করে কচ্ছপ ভাবল—অনেকক্ষণ ভাবল—ভেবে ভেবে লম্বা গলা বের করে চোখ কুঁচকে বলল, 'শোনো বন্ধুরা। আমরা নিশ্চয়ই কোনো অন্যায় করেছি, তাই দেবতা রুষ্ট হয়েছেন। তাকে পুজো দিতে হবে, সন্তুষ্ট করতে হবে। তার জন্য বলির ব্যবস্থা করতে হবে। দু-একদিনের মধ্যেই তবে আমরা খাবার পাব।'

খাবারের নাম শুনেই সিংহ গর্জন করে উঠল, বাঘ গরগর করতে লাগল, হাতি শুঁড় উঁচিয়ে ডাক ছাড়ল।

সিংহ কেশর দুলিয়ে বলল, 'তাহলে কালকেই বলির ব্যবস্থা করা হোক।'

'বেশ তাই।' সবাই সায় দিল।

তাদের যাবার পথের দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে রইল কচ্ছপ। যেই সিংহ বাঘ এবং হাতি বনের গভীরে মিলিয়ে গেল, তক্ষুনি কচ্ছপ তার বৌ এবং ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে তার বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেল। বেশ দূরে লুকিয়ে রইল এমন জায়গায় যেখান থেকে তারা কচ্ছপকে খুঁজে বের করতে পারবে না। নিশ্চিন্ত হয়ে কচ্ছপ বলল, 'আমার বৌ আর আমার ছেলেমেয়েদের আমি দেবতার বলি হতে দিতে পারি না।'

অভিপ্রায়

প্রকৃতির কোলে জন্মগ্রহণ করে এবং অত্যন্ত নিবিড়ভাবে প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত থাকবার ফলে আদিবাসী মানুষ দু'চোখ ভরে পরিবেশকে দেবার সুযোগ পায়। এই গল্পে প্রকৃতির ভয়ানক রূপের যে বর্ণনা রয়েছে তা অতুলনীয়। একদিকে ভয়ার্ত মনের ছবি, অন্যদিকে রয়েছে প্রকৃতির কবিত্বময় চিত্র বর্ণনা। কত স্বাভাবিক বলার ভঙ্গি, কত বাস্তব এই অভিজ্ঞতা। আকাল শুধু প্রকৃতিকে বিধ্বস্ত করে না, মানুষেরও

মনকেও কিভাবে প্রভাবিত করে তার উজ্জ্বল বাস্তব চিত্র রয়েছে এই পশুকথাটিতে।

দুর্ভিক্ষের সময়ে মানুষ প্রখর সূর্যের তাপে দগ্ধ হতে থাকে, তার চেয়েও বেশি দগ্ধ হয় পেটের জ্বালায়। এই জ্বালায় শক্তিমান স্বাস্থ্যবান মানুষেরাও কেমন দুর্বল হয়ে পড়ে। গলা শুকিয়ে যায়, মুখ দিয়ে শব্দ বেরোয় না, চামড়ার নিচে হাড় স্পষ্ট হয়ে আসে, পথ চলতেও ক্লান্তি হয়। আকালের সময় যে শব্দটি সবচেয়ে প্রিয় তা হল 'খাবার'। কচ্ছপের মুখে 'খাবার মিলবার' কথাতেই তাই তিনজন কেমন আর্তনাদ করে ওঠে। জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা ছাড়া এর প্রকাশ সম্ভব নয়।

গ্রামীণ নারীরা স্বভাবতই শান্ত ধীর ও ধৈর্যশীলা। পুরুষের আধিপত্য এর পেছনে রয়েছে। সিংহী বাঘিনী সুগৃহিনী, শান্তস্বভাবা। কিন্তু অনাহারের জ্বালায় আজ তারাও বিক্ষুব্ধ, দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য। কাকে কিভাবে কথা বলতে হবে তাও তারা ভুলে গিয়েছে। আগে তারা এমন ছিল না। ক্ষুধা তাদের সমস্ত আচরণকে বিকৃত করে তুলেছে। এই তো স্বাভাবিক, এরকমই তো ঘটে থাকে। এই আকালেই তো পিতামাতা পেটের জ্বালায় পুত্রকন্যাকেও একমুষ্টি খাদ্যের বিনিময়ে বিক্রি করতে বাধ্য হয়, আকালেই মানুষ ছিনিয়ে নেয় আপনজনের মুখের গ্রাস। অনাহার মানুষকে পশু করে তোলে।

আকাল শক্তিমান মানুষকেও নির্জীব করে তোলে। সিংহীর কথায় সিংহের অভিমানে আঘাত লাগে তবু সে কিছু বলতে পারে না। নিরুপায় মানুষ আপনমনে গর্জায়। অথচ সামন্ত-সমাজের নিয়মে আগে কিন্তু সিংহ স্ত্রীর এই বেয়াদপী ক্ষমা করত না। ক্ষুধার জ্বালায় কি তীক্ষ্ণ বাক্যবানই না সহ্য করতে হয়েছে সিংহ ও বাঘকে!

দুর্দিন মানুষকে দুর্বল করে তোলে বলেই বন্ধুত্ব করার প্রবণতা জাগে। একা অসহায় লাগে, ভাবনা আসে সবাই মিলে হয়ত কিছু করা যায়। তাই তিনজনে মিলিত হয়ে উপায় অনুসন্ধানে বেরিয়েছে।

'খালি পেটে আমি যে কিছুই চিন্তা করতে পারছি না'—এ অভিজ্ঞতা কত গভীর! কত প্রাণবন্ত বাঘের চেহারা আর তার হাঁটার চিত্রটি যার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে দুর্ভিক্ষগ্রস্ত মানুষের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি।

আকাল মানুষকে নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন করে তোলে। যার কাছে বুদ্ধি নিতে গিয়েছে, খাদ্য না মিললে তাকে হত্যা করে খেতেও বাঘ কুণ্ঠিত হবে না বলে জানিয়েছে। খুব খারাপ লাগলেও মানুষের সমাজে আকালের সময় এমন সব অদ্ভুত কাণ্ডই ঘটে থাকে।

সরল মানুষ প্রকৃতির বিরূপতার পেছনে বৈজ্ঞানিক কারণ কি রয়েছে তা জানে না। তারা কল্পনা করে, কোনো 'অশুভ' শক্তি নিশ্চয়ই সক্রিয় হয়ে উঠেছে, তাই

তাদের জীবনে নেমে এসেছে এমন দুর্বিপাক। মানুষকে সন্তুষ্ট করতে গেলে কিছু ভেট দিতে হয়, বিনীতভাবে কথা বলতে হয়। দেবতাও সন্তুষ্ট হবেন কিছু ভেট পেলে। সরল বনেঘেরা মানুষ মানুষের মেজাজের প্রতিরূপ দেবতায় আরোপ করে। এই ধারণা তাদের সহজাত প্রবণতায় জন্মেছে, মিলিতভাবেই তারা তাই দেবতার উদ্দেশ্যে পুজো দেয়। কিন্তু এই সারল্যকে কাজে লাগালো পুরোহিতশ্রেণী। তারা সরল মানুষকে শোষণ করার পদ্ধতি হিসাবে বেশি করে পুজো বলি এবং অন্যান্য ধর্মীয় আচার আচরণের ব্যবস্থা করল। এভাবে তারা নিজেরাই হয়ে উঠল শোষকশ্রেণীর প্রতিনিধি, প্রথম সারির চতুর শ্রেণীশত্রু। কচ্ছপ এই পুরোহিতশ্রেণীর প্রতিভূ। স্বাভাবিকভাবেই সে অন্য দশজনের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান। কেননা সে অন্যের শ্রমে জীবন কাটায়, তাই বুদ্ধিবৃত্তি চর্চা করার অবসর পায়। যে অন্যের শ্রমশক্তি শোষণ করে তার চেয়ে নিকৃষ্ট আর কেউ হতে পারে না। তার মানসিকতা সবসময় এই ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে চায়। তাই সে হয়ে ওঠে নিচ ও স্বার্থপর। আকালের দিনে কোনো পথ সে দেখাতে পারে না, পুজো আর বলি ছাড়া অন্য উপায় সে জানে না। সেই বিধানই সে দেয়। কিন্তু যেহেতু সে ধূর্ত এবং এটা জানে যে বলিদানের ফলে খাবার মিলবে না তাই সে নিজে সতর্ক হয়েছে। অন্যের জীবন যায় যাক, নিজের কোনো ক্ষতি সে ঘটতে দেয় না। আজ বড় দুঃসময়ে সে উপলব্ধি করল, অনাহারের মুখে পশুরা তাকে রেহাই দেবে না। সেই হয়তো হবে তাদের খাদ্য। তাই সে লুকিয়ে পড়ে। পুরোহিত দেবতার আদেশ বয়ে আনে সাধারণ মানুষের কাছে—মানুষ একথাই বিশ্বাস করে। কিন্তু পুরোহিত জানে দেবতার উদ্দেশ্যে কোনো আবেদনই বাস্তব রূপ নেয় না। আজ তাকে বড় কঠিন সময়ের মুখোমুখী হতে হয়েছে। স্বভাবতই বিক্ষোভের মুখে সে দাঁড়াতে পারেনি। পুরোহিতশ্রেণীর এক বাস্তব চরিত্র চিত্রিত হয়েছে এই পশুকথাটিতে।

দাহোমে

দেশ পরিচয়

এক ফালি ছোট্ট দেশ দাহোমে, কিন্তু বৈচিত্র্যে ভরা। ঐটুকু দেশে নানা জাতির মানুষ বাস করে। উত্তর অংশে বারিবাস, সোমবাস প্রভৃতি জাতি, দক্ষিণের আবোমে অঞ্চলে ফন জনগোষ্ঠী, পোর্তো নোভো এলাকায় বাস করে য়োরুবা জনগোষ্ঠী। এর মধ্যে ফন জনগোষ্ঠীই দেশের মোট জনসংখ্যার প্রধান অংশ। দেশের উত্তর অংশ শোচনীয়ভাবে পিছিয়ে রয়েছে দক্ষিণ অঞ্চল থেকে।

দেশের উত্তরে আপার ভলটা, নাইজার নদী, দক্ষিণে গিনি উপসাগর, পশ্চিমে ঘানা ও পূর্বে রয়েছে নাইজিরিয়া।

দাহোমেকে বলা হয় আফ্রিকার 'লাতিন কোয়ার্টার'। আগে ফরাসী পশ্চিম-আফ্রিকার মধ্যে একটি উপনিবেশ ছিল এই দেশ। তখন দেশের দক্ষিণ অংশে ক্যাথলিক মিশনের অধীনে অনেক শিক্ষালয় গড়ে ওঠে, যেটা পশ্চিম-আফ্রিকার অন্যান্য উপনিবেশগুলিতে হয়নি। এইসব শিক্ষালয়ে ছাত্ররা সরকারী চাকুরীর ব্যাপারে যোগ্য শিক্ষা পেত। নিজেরা ফরাসী উপনিবেশের অধীনে নির্মম পরাধীনতা সহ্য করেছে, আবার এই পরাধীন দেশের কিছু সুযোগপ্রাপ্ত শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সরকারী কর্মচারী অন্য উপনিবেশে শোষণের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। দাহোমের এইসব প্রশাসক ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকার সমস্ত উপনিবেশগুলিতেই ছড়িয়ে পড়েছিল।

স্বাধীনতার আগে এরাই দাহোমের রাজনৈতিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে এবং দেশের সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছে। দেশের মধ্যে বিভিন্ন মত পার্থক্য থাকলেও স্বাধীনতার জন্য দেশের জনগণ তীব্র লড়াই শুরু করে পঞ্চাশের দশকে। দেশ স্বাধীন হয়েছে ১৯৬০ সালের ১ আগষ্ট। পরাধীন দেশে যারা উপনিবেশবাদীদের সহায়ক ছিল, স্বাধীনতার পরে তারাই হয়েছে দেশের শাসন-কর্তা। তাই দেশ স্বাধীন হলেও, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা একই রয়ে গেল।

দেশে দুর্ভিক্ষ নিত্য সহচর, বিদেশী ঋণ ক্রমবর্ধমান আর জমির ওপরে বজায় আছে সামন্ততান্ত্রিক প্রভুত্ব। সরকারী প্রশাসন চালাতেই বেশির ভাগ অর্থ ব্যয় হয়, [illegible] ও শিল্পে তাই উন্নতি ব্যাহত হচ্ছে।

[illegible] দেশের বিরাট সম্পদ। কিছু কিছু শিল্প আছে, কিন্তু মূল সম্পদ

এই হোল এবং কৃষি। দেশের দক্ষিণ অংশই অপেক্ষাকৃত বেশি উর্বর। কৃষিজাত দ্রব্যের চারভাগের তিনভাগই জন্মায় এই দক্ষিণ অংশে।

কৃষকের নিজের জমি সামান্য, বেশির ভাগ জমির মালিক মন্ত্রী প্রশাসক ও পুরনো সামন্তপ্রভুরা। দিনমজুর আর ক্ষেতমজুর এইসব জমিতে অমানুষিক পরিশ্রম করে অর্ধাহারে অনাহারে দিন কাটায়।

অথচ দেশের লোকসংস্কৃতির ধারক এরাই। অসীম দারিদ্র্যের মধ্যে, বীভৎস উপনিবেশিক শোষণের মধ্যেও এরা অপূর্ব রস-সমৃদ্ধ লোকসাহিত্য সৃষ্টি করেছে। পশুকথার এক বিচিত্র ভাণ্ডার রয়েছে লোকসমাজে। আর সমস্ত পশুকথাগুলির মধ্যেই বুদ্ধিদীপ্ত মনের প্রকাশ ঘটেছে অত্যন্ত সুন্দরভাবে।

দাহোমের আয়তন ৪৪,১৮৩ বর্গ মাইল এবং লোকসংখ্যা ১,৯৩৪,০০০।

পশুকথা

বাদুড়ের স্বভাব

অনেকদিন আগের কথা। সেইকালে একবার পশু আর পাখিদের মধ্যে খুব যুদ্ধ হয়েছিল। সেই সময় পশু আর পাখিদের মধ্যে খুব তর্ক বাধল। তর্ক বাধল বাদুড়কে নিয়ে। বাদুড় কোন দলে যোগ দেবে? পশুদের দলে না পাখিদের দলে? বাদুড় খুব চতুর। সে জানে কেমন করে নিজেকে বাঁচাতে হয়। ওর খুব বুদ্ধি। অনেক দিক ভেবেচিন্তে সে কাজ করে। পাখিরা যখন প্রভু ছিল, পাখিরা যখন পশুদের ক্রীতদাস করে রেখেছিল, তখন বাদুড় ছিল পাখিদের সঙ্গে। তার ভাগ্যকে সে পাখিদের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছিল। তখন পাখিরা ছিল রাজা, পশুরা ছিল পরাধীন।

এমনি করে চল্লিশ বছর কেটে গেল। পশুদের অশেষ কষ্ট। শেষকালে অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে সিংহ ও বাঘ প্রস্তাব দিল যে, অত্যাচারী পাখিদের সঙ্গে আমরা কখনও পেরে উঠব না, তাদের সঙ্গে রেষারেষি বা যুদ্ধ করেও কিছু হবে না, তাই এসো বন্ধুগণ আমরা শান্তির প্রস্তাব রাখি। তাদের কাছে মাথা নত করলে তারা খুশি হয়ে আর অত্যাচার করবে না।

এই পরামর্শ শোনামাত্র অন্য সবাই হৈ হৈ করে উঠল। তারা সবাই মিলে

শান্তির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করল। তারা বলল, এভাবে অত্যাচার বন্ধ হবে না। আমরা লড়াই করব, আর শেষ পর্যন্ত আমরাই জিতব। আমাদের শক্তি তো কম নেই? এসো সবাই মিলে পাখিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি। সিংহ আর বাঘ বাধ্য হয়ে মেনে নিল তাদের কথা। আবার যুদ্ধ বাধল অত্যাচারী পাখিদের সঙ্গে।

এতদিন বাদুড় ছিল অত্যাচারী নিষ্ঠুর পাখিদের দলে। কিন্তু যখনই পশু আর পাখিদের মধ্যে যুদ্ধ বেধে গেল, তখন সে আলাদা হয়ে থাকল। পাখিদের কাছ থেকে সরে এল, কিন্তু পশুদের দলেও যোগ দিল না। সে দেখছে, কে জেতে। তারপরে তার দলে যোগ দেবে। পশুরা নজর রাখল, বাদুড়ের ভাবগতিক দেখল। সবই বুঝতে পারল তারা।

পশুরা জোর লড়াই চালাচ্ছে। সেইসময় তারা শেয়ালকে পাঠাল বাদুড়ের কাছে। শেয়ালকে বলল, বাদুড়কে বন্দী করে নিয়ে এসো।

শেয়াল তক্ষুনি বাদুড়ের কাছে গিয়ে তাকে বন্দী করে নিয়ে এল। পশুদের নেতারা বসে রয়েছে, বন্দী বাদুড়কে নিয়ে আসা হল তাদের সামনে। তারা বলল, বাদুড় দু'রকম চরিত্রের। আগে ছিল পাখিদের দলে, এখন আলাদা হয়ে সরে আছে। এ কাজ জঘন্য। বাদুড়কে আমরা অভিযুক্ত করছি। বাদুড় কেন এরকম করেছে তার জবাব দিক।

বাদুড় বলল, এতে আমার কোনো দোষ নেই। এরকম কাজ করতে আমি বাধ্য হয়েছি। আমার বৌ আমাকে এই পরামর্শ দিয়েছে। আমার বৌ আমাকে বলেছে, গণ্ডগোলের সময় সরে থাকবে, আর যেই একদল জিতবে তখন তার দলে গিয়ে বলবে, আমি তো তোমাদের দলেই ছিলাম। তাতে যুদ্ধ জেতার ফলে যত ভালো ভালো জিনিস, তা সবই পাবে। আগে আমি বৌয়ের কথায় জেতাদল পাখিদের সঙ্গে ছিলাম, আর এখন দেখছিলাম কি হয়। আমার কোনো দোষ নেই।

বাদুড়ের এই দু'রকমভাবে চলাফেরার জন্য সব পশু তাকে ভীষণভাবে গালাগালি দিল। তারপরে তাকে নিজেদের জঙ্গলে ঘেরা একটা ঘরে বন্দী করে রাখল। ঠিক হল, যুদ্ধের পরে তার বিচার হবে। এখন যুদ্ধ নিয়ে তারা ব্যস্ত, পরে ঠিকমতন বিচার করা যাবে।

দশ বছর ধরে চলল এই ভীষণ যুদ্ধ। কত পাখি, কত পশু মারা পড়ল, কতজন আহত হয়ে পড়ে রইল। শেষকালে পশুরাই জয়ী হল। তারা মরণপণ লড়াই চালিয়ে পাখিদের একেবারে হারিয়ে দিল।

পশুদের মধ্যে যাদের খুব বুদ্ধি তাদের নিয়ে একটা দল করা হল। তারপরে তাদের সামনে বাদুড়কে ডাকা হল। এবার তার বিচার হবে।

বাদুড় বুঝল, সে এবার বড় শক্ত পাল্লায় পড়েছে। এতদিন বুদ্ধি করে সে নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে এসেছে। কিন্তু এবার? ব্যাপারটা খুব শক্ত, তাই সে আরও বুদ্ধিমান একজনকে অনেক ভেট দিয়ে তার হয়ে কথা বলতে বলল। লোভে পড়ে সে রাজি হল।

বাদুড়ের সেই বুদ্ধিমান বন্ধু বলল, বাদুড়ের অধিকার আছে যে কোনো দলে যোগ দেবার। তার স্বভাব, তার চেহারা, তার চরিত্র এমনই যে, সে যে কোনো দলে সুন্দরভাবে মিশে থাকতে পারে, আর তাই সে করেছে। যদিও সে পাখি নয়, তবু তার দুটি ডানা আছে, সে আকাশে উড়তে পারে। তাই সে যখন আকাশে উড়ে উড়ে বেড়ায় তখন কেউ বলবে না যে সে অন্যের এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। সবাই নিশ্চয়ই মানবে, তার যখন ডানা আছে তখন তার আকাশে উড়বার অধিকারও আছে। আবার বাদুড়ের অন্যদিকে তাকান, দেখবেন যে তার সারা দেহ লোমে ঢাকা, তার দাঁত আছে, বেশ বড় কান আছে। অথচ পাখিদের লোম দাঁত এবং কান কোনোটাই নেই। লোমের বদলে রয়েছে পালক। তাহলে সে তো পশু। তাই যখন সে পশুদের দলে যোগ দিতে চায় তখন তার বাধা কোথায়? তার দেহই এমন যে, সে পাখি বা পশু যে কোনো দলেই ভিড়ে যেতে পারে। এতে তার নিজের দোষ কোথায়? বিচার করে দেখুন, বুঝতে পারবেন বাদুড় নির্দোষ, তার কোনো দোষই নেই।

অভিপ্রায়

অতি পরিচিত এক নির্মম সামাজিক সত্য এই পশুকথাটির মূল বিষয়। আমাদের সমাজে নানা ধরনের বিরোধ উপস্থিত হয়। এইসব বিরোধ সবসময় শান্তিপূর্ণ বা অহিংস থাকে না। সেখানে হানাহানি হয়, রক্তপাত ঘটে। আবার সেই বিরোধ যদি শ্রেণী-সংঘর্ষ বা শোষক-শোষিতের দ্বন্দ্ব হয় তবে রক্তক্ষয়ী সংঘাত অনিবার্য। কিছু চতুর সুযোগসন্ধানী মানুষ নিরপেক্ষতার ভান করে সুকৌশলে এসব এড়িয়ে চলে। আমাদের সহজ সরল মানুষ অধিকাংশ সময়েই এই ধূর্ত মনোভাবকে ধরতে পারে না। উপযুক্ত এবং অনুকূল সময়ে এইসব ধূর্ত মধ্যপন্থীরা বিজয়ী দলে ভিড়ে যায়, মানুষও তাদের গ্রহণ করে। বাদুড় এই জাতীয় মধ্যপন্থী।

কিন্তু দাহোমের শোষিত মানুষ দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় এ ধরনের মানুষকে চিনে নিতে ভুল করেনি। নিরপেক্ষতা বলে যে কিছু নেই সেটা তারা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জেনেছে। একারণেই তারা বাদুড়কে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছে।

লড়াইয়ের সময় এইসব নিরপেক্ষ-মানুষ দ্বৈত ভূমিকা পালন করে সংগ্রামের ক্ষতি করতে পারে। তাই সংগ্রাম চলাকালীন বাদুড়কে লড়াকু মানুষ বন্দী করে রেখেছে, যাতে তার কূটবুদ্ধি সক্রিয় হতে না পারে। এ অভিজ্ঞতার প্রকাশ অতুলনীয়।

একদল শোষক দীর্ঘদিন অন্যদের পদানত করে রাখে। তাদের অত্যাচার অবিচার চরমে ওঠে, কিন্তু প্রতিবাদের পথ না থাকায় অন্যেরা সব সহ্য করে। এই পদানত দলের কেউ কেউ বিরোধ মিটিয়ে কিছু সুযোগ সুবিধা পাওয়ার পক্ষপাতী। এরা হচ্ছে আপোসপন্থী। এখানে বাঘ ও সিংহ সেই দলের। কিন্তু অধিকাংশ শোষিত মানুষ লড়াই করে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনার পক্ষে থাকে। উপযুক্ত সময়ে তারা বিদ্রোহ করে এবং পরাধীনতা থেকে মুক্ত হয়। দীর্ঘ চল্লিশ বছরের ক্রীতদাসত্ব পশুরা ঘুচিয়েছে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। আপোসপন্থীরা পিছু হটেছে।

বহু মানুষ নিজের অপরাধের বোঝা অন্যের ঘাড়ে চাপায়। বাদুড় তার কদর্য স্বভাবের সমস্ত দোষ চাপিয়েছে তার বৌয়ের ঘাড়ে। আবার এটাও সত্যি যে, অনেক স্ত্রৈণপুরুষ স্ত্রীর কথাতেই সিদ্ধান্ত নেয়। বাদুড়ের ক্ষেত্রেও তা হতে পারে। এ অভিজ্ঞতাও বাস্তব সত্য।

শোষকের বিরুদ্ধে সংগ্রামও খুব সহজ নয়। বহু প্রাণ বলিদান দেবার পরে, দীর্ঘ দশ বছর লড়াই চালিয়ে তবেই জয় সম্ভব হয়েছে। সাধারণ মানুষের এ অভিজ্ঞতা প্রতিদিনের লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই জন্মেছে।

বাদুড়ের হয়ে ওকালতি করেছে আরও একজন বুদ্ধিমান। তাকে প্রচুর ভেট দিয়ে কাজ করাতে হয়েছে। সমাজে এ ঘটনা তো অহরহ ঘটছে।

বন-ঘেরা মানুষের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তির তুলনা হয় না। বাদুড়কে কি নিখুঁতভাবে তারা লক্ষ্য করেছে, তার স্বভাব ও দেহগত বৈশিষ্ট্যগুলো জেনেছে। নিরপেক্ষ অসাধুদের স্বভাব সুস্পষ্ট করতে তারা বাদুড়কেই বেছে নিয়েছে। বাদুড়ের দেহগত বৈশিষ্ট্য তাদের অভিপ্রায় প্রকাশে সহায়ক হয়েছে।

গ্রীস

দেশ পরিচয়

মিশর চীন এবং ভারতবর্ষের মত গ্রীসও প্রাচীনতম সভ্যতার সুমহান গৌরবদীপ্ত-ঐতিহ্যের এক স্মরণীয় দেশ। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ যখন চিন্তাভাবনা-কাজকর্মে অনেক পিছিয়ে ছিল, তখন গ্রীসের মানুষ দর্শন বিজ্ঞান মহাকাব্য নাটক স্থাপত্য ভাস্কর্য সাহিত্য তত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ের এক বিশাল সমৃদ্ধ ভাণ্ডার গড়ে তুলেছে। একদিকে ক্রীতদাস-প্রথার মত অমানবীয় বীভৎস সমাজব্যবস্থাকে যেসময়ে লালন করেছে গ্রীস, অন্যদিকে এবং একই সাথে মানবসভ্যতা বিকাশের সুন্দরতম ও মহত্তম বস্তুগুলিকেও সে সৃষ্টি করেছে। অবশ্য ক্রীতদাস-প্রথার অবর্ণনীয় দুর্দশার কথা মনে রেখেও এটা স্বীকার করতে হবে, গ্রীসীয় সভ্যতা বিকাশে এই প্রথাও ব্যাপকভাবে সহায়ক হয়েছে।

ছোট্ট সুন্দর এই দেশ। গ্রীসের উত্তরে যুগোশ্লাভিয়া এবং বালগরিয়া, দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর, পশ্চিমে আলবানিয়া আর আইওনিয়ান সাগর এবং পূর্বদিকে রয়েছে ঈজিয়ান সাগর, তুরস্ক। মূল ভূখণ্ড আর অসংখ্য ছোট ছোট দ্বীপ নিয়ে গড়ে ওঠা এই দেশে রয়েছে অসংখ্য পাহাড় আর পর্বত। পাহাড়ী উপত্যকাগুলি অত্যন্ত উর্বর। দেশের উত্তরাংশের নদীগুলি সামান্য বড়, কিন্তু দক্ষিণের নদীগুলি খুব অপ্রশস্ত এবং খাঁড়িতে ভর্তি। পাহাড় এলাকাগুলি বরফ-ঢাকা থাকে দীর্ঘ শীতের কাল, অন্যদিকে সমুদ্র উপকূলে নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া।

দেশের অর্ধেকটা যদিও পাহাড় আর অনুর্বর জমি, তবু পরিশ্রমী মানুষ সেখানেও জলপাই আঙুর এবং খেজুরের সমৃদ্ধ বাগিচা গড়ে তুলেছে। সমবায় পদ্ধতিতে গমের চাষ করে তারা ফলন বাড়িয়েছে প্রভূত পরিমাণে। কিছু যাযাবর পশুপালক রয়েছে। ভেড়া এবং ছাগলই তাদের সম্পদ। কৃষকেরা বেশিরভাগই ঘোড়া গোরু ও শুয়োর পালন করে।

দেশের মানুষ যেমন স্বাধীনতাপ্রেমী তেমনি ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। কাজের সময় আজও গ্রামীণ মানুষ প্রাচীন বীরগাথা লোকসঙ্গীত গেয়ে চলে। লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যে অসাধারণ সমৃদ্ধ এই দেশ। ঈশপের দেশে পশুকথাগুলি যেমন সুন্দর, তেমনি উপদেশ ও অভিব্যক্তিতে ভরপুর।

গ্রীসের আয়তন ৫০,১৪৭ বর্গ মাইল এবং লোকসংখ্যা ৭,৬৩২,৮০১।

ছোট্ট হরিণের প্রশ্ন

বড় মোটাসোটা হরিণটা অনেক পথ দৌড়ে এসে ভীষণ হাঁপাচ্ছিল। মুখ ফাঁক করে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে, বুক ও পেট ঘন ঘন ওঠানামা করছে, নাকের ডগায় ঘাম জমেছে, পাগুলো তার থরথর করে কাঁপছে। কতকগুলো শিকারী কুকুর তাকে তাড়া করেছিল। প্রাণভয়ে বন-বাদাড় পেরিয়ে সে ছুটে এসেছে, একবারও পেছনে ফিরে তাকায় নি। সে রক্ষা পেয়েছে। দ্রুত পায়ে ছুটে কুকুরদের সে অনেক পেছনে ফেলে এগিয়ে এসেছে। এদিকে বনের গভীরে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছেও তার ভয় কাটেনি। হাঁপাতে হাঁপাতে বারবার সে দূর বনের পথের দিকে নজর রাখছিল। ভয় কাটেনি তার। হঠাৎ যদি চলে আসে সেই মৃত্যুদূতগুলো! ক্লান্ত হয়ে বসে রইল সেই হরিণ।

এমন সময় সেখানে লাফাতে লাফাতে এল এক ছোট্ট হরিণশিশু। ফুটফুটে ছোট্ট হরিণ হঠাৎ বড় হরিণকে দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। দেহটা অমন করে কাঁপছে কেন ওর? অত জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে কেন? হরিণ দূর বনের পথে কিসের দিকে তাকিয়ে আছে? ছোট্ট হরিণ এসব ভাবতে ভাবতে বড় হরিণকে জিজ্ঞেস করল, 'হরিণকাকা, তুমি কাঁপছ কেন? তোমার কি হয়েছে? তুমি তাকিয়ে তাকিয়ে কি দেখছ?'

বড় হরিণ দু'কথায় বুঝিয়ে দিল, 'কতকগুলো রক্তখেকো শিকারী কুকুর আমাকে তাড়া করেছিল। কোনোরকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি।'

হরিণশিশু অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'হরিণকাকা, অবাক কাণ্ড! আমি অবাক হয়ে শুধু ভাবি, তোমরা কেন ঐ কুকুরগুলোকে দেখে ভয়ে পালাও। তুমি যদি ওদের সঙ্গে লড়াই কর, তবে তুমিই তো জিতবে। ওদের ক্ষমতাই নেই তোমাকে হারায়। তুমি জিতবেই। তোমার কি সুন্দর শিং! কি প্রচণ্ড ধার রয়েছে তাতে, শিং-এর মুখও অনেকগুলো, সবগুলোই কেমন তীক্ষ্ণ। কেমন বড় তোমার শিং, পেটে ঢুকিয়ে দেওয়াও সোজা আর সুবিধের। কুকুরের কয়েকটা দাঁত ছাড়া আর কিই-বা আছে? তাছাড়া তোমার আরও অনেক সুবিধে আছে। তোমার পা চারটে খুব সরু আর লম্বা। তুমি তাই খুব জোরে ছুটতে পারো। ওরা তো পেছনেই পড়ে থাকবে। কাজেই ওদের ভয় পাওয়ার কি আছে। তুমি শুধু

শুধু ঐ কুকুরগুলোকে দেখে ভয় পাও। ওরাও তাই পেয়ে বসেছে। আমরা লড়াই করলে ওরাও ভয় পেয়ে পালাবে। কি? আমি ঠিক বলিনি?'

পালিয়ে আসা সেই হরিণ তখন একটু শান্ত হয়েছে। নিঃশ্বাস আস্তে আস্তে পড়ছে, গাছের মিঠে হাওয়ায় নাকের ঘামও শুকিয়ে গিয়েছে। তবু ভয় কি সহজে যায়? আর একবার দূর বনের পথে তাকিয়ে ক্লান্তস্বরে হরিণ বলল, 'ছোট্ট হরিণ, তুমি যা বললে তা খুবই খাঁটি কথা। তুমি ভুল কিছু বলনি। আমি নিজেও কতবার এ প্রশ্ন নিজেকে করেছি। মন থেকে উত্তর পেয়েছি, 'সত্যি তো! আমার ধারালো শিং আছে, দ্রুতগামী পা আছে, আমি কেন পালাতে যাব? কুকুরদের কাছ থেকে পালাবার কোনো কারণই নেই।' মনে সাহস এনে আমি অনেকবার ভেবেছি: 'কুকুরগুলো তাড়া করলে আর পালাব না, রুখে দাঁড়াব, যুদ্ধ করে ওদের হটিয়ে দেবই।' কিন্তু যে মুহূর্তে আমি কুকুরগুলোর হাড় কাঁপানো ডাক শুনি, অনেক দূরে শুকনো পাতায় ওদের পায়ের অস্থির শব্দ শুনি,—তখন নিজেকে কেমন যেন আর সামলাতে পারি না। ভয়ে বুক কাঁপে, মুখ শুকিয়ে যায়, পালাবার জন্য পাগুলো ছটফট করে। আগের মনোবল ভেঙে পড়ে। তখনই পালাবার পথ খুঁজি। রুখে দাঁড়ালে কি হত তা যাচাই করার সময়ই পেলাম না। হয়তো লড়াই করলে ওদের হারিয়ে দিতে পারি, কিন্তু লড়াই করার সাহসই হল না কোনোদিন। আমি পারলাম না, আর হয়তো কোনোদিন পারবও না। জানি না তুমি পারবে কিনা। তোমার সুন্দর কথাগুলো হয়তো তুমি যাচাই করতে পারবে। তুমি নতুন জীবন শুরু করেছ, হয়তো তুমি পারবে।'

এই বলে ছলছল কালো কালো চোখ নিয়ে ক্লান্ত হরিণ পাশের ছোট ডোবায় জল খেতে নামল।

অভিপ্রায়

শ্রেণীবিভক্ত সমাজে নিপীড়িত মানুষকে সবসময় অবিচার ও অত্যাচারের ভয়ে দিন কাটাতে হয়। জীবনে টিকে থাকাটাই সেখানে এক বিরাট সমস্যা। অত্যাচারী শোষকশ্রেণী আচম্‌কা আক্রমণ চালায় এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষ হয় তাদের শিকার। সবসময় শোষক যে বলশালী থাকে তা নয়, কিন্তু তাদের অস্ত্র রয়েছে এবং তারা শোষণের ব্যাপারে সংগঠিত। অন্যদিকে হাটবাটের সহজ সাধারণ মানুষ অসংগঠিত, তাদের অস্ত্র নেই। দৈহিক শক্তিতে তারা হয়তো বলবান, রুখে দাঁড়াতে

হয়তো অত্যাচারী শোষক পরাজিত হবে, কিন্তু দীর্ঘকালের ভয় এবং জড়তা মানুষকে রুখে দাঁড়াতে দেয় না। একমাত্র যখন মরিয়া হয়ে সে লড়াই করে তখন শোষক পালাতে বাধ্য হয়। বড় হরিণ বহুবার ভেবেছে যে সে রুখে দাঁড়াবে কিন্তু সংগ্রামের মুহূর্তে সে পিছিয়ে যায়, পালিয়ে আসে। এটাই তো বাস্তব সত্য। শোষকের মিলিত আক্রমণে অসংগঠিত জনগণ তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মার খায়। একমাত্র যেদিন তারা সংঘবদ্ধ হয়, সেইদিনই অন্য এক সমাজ গড়ে ওঠার পথ প্রশস্ত হয়।

বড় হরিণের অসহায়তা কি নিদারুণভাবে ফুটে উঠেছে তার পালিয়ে আসা অবস্থাটির মধ্যে। শিকারী কুকুরেরা তাড়া করেছে তা.ক, নিরাপদ দূরত্বে পালিয়ে এসেও তার স্বস্তি নেই। অত্যাচার যেন পেছনে পেছনে ধাওয়া করে চলেছে। গ্রামীণ সাধারণ মানুষের এ অভিজ্ঞতা তো প্রতিদিনের। মৃত্যুর দূত সর্বক্ষণ যেন তার জীবনের সঙ্গী।

বয়স হলে যে অভিজ্ঞতা হয় বা ভয় যেভাবে জীবনকে জড়িয়ে থাকে, নবীন বয়সে তা বাসা বাধতে পারে না। তাই নবীন উচ্ছল প্রাণচঞ্চল হরিণ অবাক হয়েছে। তার ধারণা, হরিণ যদি রুখে দাঁড়ায় তবে কুকুর ভয়ে পালাবে। নবীনদের মধ্যে সংগ্রামী চেতনা অনেক বেশি প্রবল থাকে, পরিবেশকে মোকাবিলা করার মনোবলও থাকে অনেক দৃঢ়। 'তুমি জিতবেই'—এই কথাটির মধ্যে হরিণশিশুর দৃঢ় প্রত্যয় ফুটে উঠেছে। মানুষের সমাজে দেখতে পাই, উত্তর যৌবনে মানুষ আত্মকেন্দ্রিক হয়, সাহস কমে আসে, ঝুঁকি নিতে ভরসা হয় না, আত্মবিশ্বাসে ভাটা পড়ে। আর কৈশোর ও যৌবনে এগিয়ে চলার এক সাহসিক উন্মাদনা থাকে। তাই লড়াইয়ের কঠিন সময়ে যুবকেরাই হয় অগ্রণী সৈনিক। মৃত্যুকে শুধু যে তারা তুচ্ছ করতে পারে তাই নয়, শত্রুকে পরাজিত করার দুর্দমনীয় আকাঙ্খাও তাদের প্রবল থাকে, শত্রুকে তারা বিরাট কিছু ভেবে পেছিয়ে আসে না। এই মনোভাব হরিণশিশুর বক্তব্যে স্পষ্ট হয়েছে। 'আমরা লড়াই করলে ওরাও ভয় পেয়ে পালাবে'—এ উক্তি নবীন সংগ্রামীই করতে পারে।

শত্রুকে প্রশ্রয় দিতে নেই। সে যদি বোঝে তার আক্রমণে অন্যেরা ভীত হচ্ছে তবে তার অত্যাচার বেড়েই চলে। 'ওরাও তাই পেয়ে বসেছে'– এ এক গভীরতম সত্যের নির্দেশ।

এইসব কথা বড় হরিণও চিন্তা করেছে কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতিতে মানসিক বলের অভাবে তাকে পিছিয়ে যেতে হয়েছে। কিন্তু নিজের পরাজয়ের মধ্যেও সে পরিপূর্ণ আশাহত হয়নি। সে বলেছে, 'আমি পারিনি, হয়তো কোনোদিন পারবও না। তুমি নতুন জীবন শুরু করেছ, হয়তো তুমি পারবে।' খেটে-খাওয়া মানুষের এই

আশা রয়েছে বলেই জীবন থেমে থাকে না, অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানসিক শক্তি প্রখরতর হয়ে ওঠে। যে নবাগত নবশক্তিতে বলীয়ান হয়ে আজ প্রতিরোধের স্বপ্ন দেখছে তার প্রতি বিশ্বাস রেখেই বয়স্ক মানুষ দিন কাটায়। 'আমি যা পারিনি, অত্যাচারের যে জোয়াল আমি কাঁধ থেকে নামাতে পারিনি, হয়তো আমার সন্তান তা পারবে'—এই বিশ্বাস এবং কামনাই উত্তরপুরুষকে বলিষ্ঠ হতে উজ্জীবিত করে। উত্তরপুরুষ যেদিন এই সংগ্রামে সফল হয় সেদিন বয়স্ক হরিণরা হয়তো থাকে না, কিন্তু তার বেদনাসিক্ত আশা সফল হয়। সমাজের এই সত্যও আমাদের অতি-চেনা।

ফ্রান্স

দেশ পরিচয়

ফরাসী বিপ্লব ও পারি কমিউন বর্তমান বিশ্বকে প্রথম হাতেকলমে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বাণী উপলব্ধি করিয়েছে। শোষণ ও অত্যাচারের প্রতীক বাস্তিল দুর্গের পতন দুনিয়ার নিপীড়িত মানুষকে স্বাধিকার বোধে উদ্বুদ্ধ করেছে। প্রাচীন গলদেশের মতন আধুনিক ফ্রান্সও সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে এক মহান ঐতিহ্যের ধারক।

ফ্রান্সের উত্তরে ইংলিশ চ্যানেল, বেলজিয়াম, দক্ষিণে স্পেন, বর্শিকা দ্বীপ, পশ্চিমে বিসকে উপসাগর, অতলান্তিক মহাসাগর এবং পূর্বে রয়েছে জার্মানী, সুইজারল্যাণ্ড, ইতালি। ইউরোপ মহাদেশের এই দেশটি প্রায় দ্বীপের মত। উত্তরে ইংলিশ চ্যানেল, দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর ও পশ্চিমে অতলান্তিক মহাসাগর; শুধুমাত্র দক্ষিণ ও উত্তরের কিছু অংশ এবং দেশের পূর্বাংশ স্থলভাগের সঙ্গে যুক্ত। অতলান্তিক মহাসাগর থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত তুষার-ঢাকা পিরেনিজ স্পেন ও ফ্রান্সের মধ্যে দুর্ভেদ্য প্রাচীর তুলেছে। জুরা পর্বতমালা সুইজারল্যাণ্ড থেকে ফ্রান্সকে আলাদা রেখেছে। শেন, লয়ের ও গারোনে নদী শিরা-উপশিরার মত ফ্রান্সে প্রবাহিত হচ্ছে। ফ্রান্সে ১৫০টি নদী রয়েছে। উর্বরা নদীতীরে ও পাহাড়ী সমতলে রয়েছে অনন্য বনসম্পদ।

ঐতিহ্যের প্রতি এখানকার মানুষের গাঢ় শ্রদ্ধা এক সমৃদ্ধময় লোকসংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। পণ্ডকথাগুলোকে তারা সযত্নে স্মৃতিতে ধরে রেখেছে, এমন কি অধিকাংশ লোকসাহিত্যকে সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করেছে। গ্রামীণ সংস্কৃতির প্রতি অগাধ মমতা না থাকলে এ কাজ করা কখনই সম্ভব নয়।

ফরাসী শাসকেরা এশিয়া ও আফ্রিকায় বহু উপনিবেশ গড়েছিল, সেখানে তাদের প্রতিনিধি শাসকসম্প্রদায় ও সৈন্যেরা অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছে। আবার ফ্রান্সের মানবতাবাদী প্রগতিশীল মানুষেরাই এইসব শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, তাদের দেশের শাসকের বিরুদ্ধে উপনিবেশের মানুষকে স্বাধীনতার সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছে।

দেশে অপরিমেয় সম্পদ রয়েছে, বিদেশে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ফ্রান্সের নৈপুণ্য রয়েছে, দেশে সাধারণতন্ত্র বজায় আছে—তবু অসম-বণ্টনের জন্য বিত্তবান, নিম্নবিত্ত, শ্রমিক ও কৃষকের মধ্যে জীবনযাপনের সুযোগ সুবিধাগত ফারাক বড় বেশি।

ফ্রান্সের আয়তন ২১২, ৬৫৯ বর্গ মাইল এবং লোকসংখ্যা ৪৬,১৫০,০০০।

দুষ্টু রাজার সাজা

বনের রাজা না হলে ষাঁড়ের আর আশ মিটছে না। কিন্তু সে যে সামান্য ষাঁড়, অন্য হিংস্র জন্তুর সঙ্গে কেমন করে এঁটে উঠবে? তাই দেমাকী ষাঁড় ঠিক করল, সে শুধু গোরুদেরই রাজা হবে কারণ গোরুর চেয়ে তার গায়েব জোর বেশি, শিং খুব মোটা শক্ত আর ধারালো, তেমনি রয়েছে দুর্জয় সাহস। সে দিনে দিনে গোরুদের দলপতি হয়ে উঠল। গায়ের জোরে, শিং-এর জোরে কেউ তার সঙ্গে পেরে ওঠে না। তাই সব গোরু তাকে রাজা বলে মেনে নিল।

গোরুদের চারণভূমির অল্প দূরেই ছিল এক সুন্দর সবুজ পাহাড়। পাহাড়ের সেই কোন্ অদৃশ্য উঁচু থেকে পাহাড়ীবনের পাশে এঁকে বেঁকে নেমে এসেছে একটা ঝরণা। সেটাই গোরুদের তৃষ্ণা মেটাবার আর স্নানের একমাত্র জায়গা। প্রত্যেক দিন সেই দলপতি ষাঁড় তার গোরু প্রজাদের নিয়ে যায় সেই ঝরণায়। কিন্তু জলে নেমে আনন্দ করার উপায় গোরুদের ছিল না। তৃষ্ণায় বুক ফেটে গেলেও অপেক্ষা করতে হত তাদের। কেননা সবার আগে নামত দলপতি ষাঁড়। প্রথমে নেমেই সে প্রাণভরে জল খেয়ে নেয়, তারপরে দেহ এলিয়ে দেয় টলটলে ঠাণ্ডা জলে। অন্যের কথা সে ভাবে না। ডাঙ্গায় দাঁড়িয়ে থাকে সমস্ত গোরুরা। এদিকে জলে সেই ষাঁড় এমন হুটোপুটি করত যে অল্পক্ষণের মধ্যেই টলটলে জল কাদায় ভরে উঠত। শেষকালে ষাঁড় উঠে এসে রোদ পোহাত আরামে। জলে নামত অন্য গোরুরা। তৃষ্ণায় সেই কাদাজল খেতেই বাধ্য হত। তাতেই দেহ জুড়োতো তারা। কি আর করে। ষাঁড়ের গায়ে যে ভীষণ শক্তি।

ষাঁড় তাদের দল বেঁধে নিয়ে যেত সবুজ মাঠে কিংবা পাতাভরা গাছের বনে। গাছের কচি পাতা আর কচি নকুলকে ঘাস প্রথমে খেত ষাঁড়। অন্য ঘাস ও পাতা ইচ্ছেমত দলে মুড়িয়ে দিত সে। শেষকালে তাই খেত অন্য গোরুরা। কোনোদিন কচি ঘাস, কচি পাতা তারা খেতে পেত না। কি আর করে। ষাঁড়ের গায়ে যে ভীষণ শক্তি!

এমনি করে দিন কেটে যায়। ষাঁড় কিন্তু গোরুদের রাজা হয়েই সন্তুষ্ট রইল না। সে ভাবল, বনের সব পশুর রাজা হতে হবে। ফন্দি আঁটতে লাগল, কিভাবে সে সবার রাজা হবে।

ভাবতে ভাবতে ষাঁড় হঠাৎ চমকে উঠল—একটা কথা তো ভাবিনি আগে। সব পশুদের রাজা হওয়ার আগে আমার দলেই যে অনেক শত্রু আছে! আজ আমার শক্তি আছে, শিং-এ ধারও আছে। সবাই আমায় মানে। কিন্তু যেদিন আমি বুড়ো হব, তখন তো জোয়ান ষাঁড়রা আমাকে হটিয়ে দেবে! তখন? তাই আগে ঘরের শত্রুদের শব করি!

এইভেবে সব ষাঁড়কে সে মেরে ফেলতে লাগল। পেছন থেকে আচমকা সে অন্য ষাঁড়ের পেটে ধারালো শিং ঢুকিয়ে দিত। এমনি করে একে একে সব ষাঁড় মারা পড়ল তার শিং-এর গুঁতোয়।

তবু তার শান্তি নেই। কোনো গোরুর বাচ্চা হলেই সে ছুটে যায় তার কাছে, যদি দেখে বাছুরটা ষাঁড় তবে গুঁতিয়ে তাকে মেরে ফেলে সে। কোনো বাচ্চা ষাঁড় তার অত্যাচারে বেঁচে থাকতে পারল না। মায়ের কালো গভীর চোখে জল ঝরে, বুক ফেটে যায়। কিন্তু করারও তো কিছু নেই। সব সহ্য করতে হয়। পেটে বাচ্চা এলে মা-গোরু ভয়ে ভয়ে দিন কাটায়।

একদিন গভীর রাত্তিরে সবাই যখন গভীর ঘুমে ঢলে পড়েছে, তখন পাহাড়ী ঝরণার ধারে গভীর বনে এক গাভীর বাচ্চা হল। বাচ্চা দেখে মা চমকে উঠল, এ বাচ্চা যে ষাঁড়! বাচ্চা হওয়ায় কোথায় মায়ের আনন্দ হবে, তা না সে কাঁদতে লাগল। কিন্তু কেঁদে আর কি হবে? হঠাৎ গাভী সোজা হয়ে দাঁড়াল, শিং উঁচিয়ে পাহাড়ের দিকে তাকাল। দূরে অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে, সূর্য উঠছে। সে ভাবল, বাচ্চাকে আমার বাঁচাতেই হবে। দেখি না শেষ চেষ্টা করে।

গাভী বাছুরকে নিয়ে গেল ঝরণা থেকে কিছু দূরে পাহাড়ের এক অন্ধকার গুহায়। বাচ্চাকে গুহায় রেখে মা বলল, 'বাছা, তুই দিনের আলো থাকতে গুহার বাইরে যাবি না। ইচ্ছে হলেও 'হাম্বা' করে ডাকবি না। তোকে বড় হতে হবে। ঐ দুষ্টু বদ ষাঁড় যদি জানে তুই এখানে, তবে তোকে মেরে ফেলবে। তুই এমনভাবে দিন কাটাবি যেন ষাঁড় বুঝতে না পারে তুই এখানে বড় হচ্ছিস্। খুব সাবধানে থাকবি বাছা, তোকে যে বড় হতে হবে। কেন, তা তুই পরে বুঝবি।'

একথা বলেই গাভী ফিরে এল। বাছুর কিছুই বুঝল না, কিন্তু বেরোলে তাকে যে ষাঁড় মেরে ফেলবে এটা বুঝেছিল। সে মায়ের কথা শুনল। মনে রাখল মায়ের উপদেশ।

সমস্ত দিন বাছুর অন্ধকার গুহায় লুকিয়ে থাকত। মাঠে ঘাস খাওয়ার ছলনা করে, ঝরা-পাতা খাওয়ার নাম করে মা আসত গুহায়। বাছুরকে দুধ খাইয়ে যেত সে।

এদিকে ষাঁড় টেরও পেল না, এক অন্ধকার গুহায় তার শত্রু বেড়ে উঠছে।

আর একটু বড় হলে বাছুর রাত্তিরে গুহার বাইরে কিছুটা বেরিয়ে ঘাস-পাতা খেত। আবার গিয়ে ঢুকত গুহায়। এমনি করে দিনে দিনে বাছুর বড় হতে লাগল।

এমনি করে লুকোচুরি খেলে অনেকদিন কেটে গেল। একদিন রাতে বাছুর জল খেতে ঝরণায় এল। আকাশে ফুটফুটে চাঁদের আলো। বিরাট গোল চাঁদ মাথার ঠিক ওপরে। বাছুর জল খেতে খেতে দেখল, সেই ষাঁড়ের পায়ের দাগের চেয়েও তার পায়ের দাগ কিছুটা বড়। পায়ের পাতা ফেলে বারবার সে মাপল। না, কোনো ভুল নেই। সবচেয়ে বড দাগের চেয়েও তারটাই বড়। তার মনে কেমন সাহস এল।

আর একদিন ফুটফুটে জ্যোৎস্নার রাতে ঝরণার পাশে বাছুর দেখল, সেই ষাঁড়ের পেছনের পায়ের দাগ আর সামনের পায়ের দাগের মধ্যে যে জমিটুকু রয়েছে, তার চেয়ে তার নিজের পেছনের ও সামনের পায়ের দূরত্ব বেশি, জমিটা কিছুটা বড়। বাছুরের সাহস গেল আরও বেড়ে।

একদিন সেই রাজা ষাঁড় দলবল নিয়ে ঝরণায় জল খেতে এসেছে। তার বেশ বয়স বেড়েছে, কিন্তু স্বভাব পাল্টায়নি। তেমনি রয়েছে ভাবভঙ্গি। প্রচণ্ড গরমে আর তৃষ্ণায় সবাই ব্যাকুল হয়ে জলের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ষাঁড়ের সেদিকে খেয়াল নেই। সে আস্তে আস্তে রসিয়ে রসিয়ে জল খাচ্ছে, দেহ এলিয়ে দিয়েছে ঠাণ্ডা জলে।

গুহা থেকে বেরিয়ে কিছুটা এগিয়ে বাছুর উঁকি মেরে সব দেখছিল। তার সাহস এখন আরও বেড়ে গিয়েছে। ষাঁড়ের স্বার্থপরতায় সে অবাক হয়ে গেল। তার মনে পড়ল ছেলেবেলায় শোনা মায়ের কথাগুলো। মায়ের লুকিয়ে লুকিয়ে আসার ছবি ফুটে উঠল রাগী চোখের সামনে। হঠাৎ তার চোখ পড়ল ষাঁড়ের শিং-এর দিকে। অনেকটা এগিয়ে এসেছে বাছুর। পায়ের তলায় জল তিরতির করে বয়ে চলেছে। নিচু হয়ে নিজের শিং দেখল সেই বাছুর। 'আরে! আমার শিং তো অনেক বড়, মোটা আর ধারাল! ষাঁড়ের চেয়েও সোজা আমার শিং!' বিস্ময়ে তার রক্ত চন্‌মন্ করে উঠল।

বাছুর সব ভুলে গেল। রাগে ঘৃণায় তার দেহ কাঁপছে। গোঁ গোঁ করে সে এগিয়ে এল ষাঁড়ের দিকে। ষাঁড় এই শব্দ শুনে অবাক হয়ে পেছনে তাকাল। দেখতে পেল তার চেয়েও শক্তিমান এক যুবক ষাঁড়কে। ঠিকমত বাধা দেওয়ার আগেই বাছুর তার তীক্ষ্ণ মোটা শিং ঢুকিয়ে দিয়েছে বুড়ো ষাঁড়ের পেটে। ষাঁড় মুখ থুবড়ে পড়ল জলে, জলের রঙ লালচে হয়ে গেল, দু'বার তার দেহটা থরথরিয়ে কেঁপে উঠে পা চারটে দু'দিকে লম্বা হয়ে গেল, চোখ কাঁপতে লাগল। শেষকালে তার দেহ নিথর হয়ে আধডোবা জলে পড়ে রইল।

সেইদিন থেকে সেই বিজয়ী বাছুর হল গোরুদের রাজা। অবশ্য এখন আর সে ছোট্ট বাছুর নেই। সে এখন মহাশক্তিশালী বিশাল ষাঁড়।

নতুন দলপতি একেবারে অন্যরকম। সে প্রথমে সবাইকে ঝরণার জল খেতে দিত, অন্যেরা যখন জল খেত সে পাহারা দিত। পরে জল খেত নিজে। সবুজ মাঠে, ঘন বনে সবাই মিলে একসঙ্গে ঘাস খেত, পাতা খেত। এইভাবে বহুদিনের কান্না-ভরা দিন শেষ হল। গোরুরা সবাই ভালোবাসল নতুন দলপতিকে। অল্পদিনের মধ্যেই বাচ্চা ষাঁড়ে ভরে উঠল তাদের দল। কেননা নতুন দলপতি ষাঁড়দের কখনও মেরে ফেলত না, তাদের বিপদে-আপদে রক্ষা করত সবসময়।

অভিপ্রায়

ব্যক্তিগত সুযোগসুবিধা করায়ত্ত করবার জন্য যে উচ্চাকাঙ্খা তা মানুষকে বড় নিচ ও হীন করে তোলে। অন্যকে পদানত করবার স্পৃহা মানুষকে অপকৌশলী ও অত্যাচারী করে তোলে। আবার এই জঘন্য স্পৃহা মনের কোণে বাসা বাঁধলে তা বেড়েই চলে, একটি পাওয়ার পরে আরেকটি চাওয়া এসে উপস্থিত হয়। স্বার্থপর ষাঁড় গোরুদের দলপতি হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারল না, সমস্ত পশুসমাজকেই তার পায়ের নিচে আনবার চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

মানুষের আদিম সমাজব্যবস্থায় দলপতিই ছিল রাজা। দৈহিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে সে প্রভুত্ব করত। দলের সকলেই তার আদেশ মানতে বাধ্য ছিল। তারপর তার বার্ধক্যে তাকে হটিয়ে অন্য শক্তিমান যুবক হত দলপতি। পরবর্তীকালে অবশ্য দলপতি নির্বাচনে পুরুষানুক্রমিক ব্যবস্থা চালু হয়েছে। আলোচ্য পশুকথাটিতে প্রাচীন সমাজব্যবস্থার এই দিকটিই সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। প্রসঙ্গত বলা দরকার, হনুমান বাইসন প্রভৃতি পশুদের মধ্যে একটি শক্তিমান পুরুষ-পশুরই আধিপত্য থাকে, এবং এই আধিপত্য বজায় রাখবার জন্য তারা নবজাত সমস্ত পুরুষ-শিশুদের হত্যা করে। কাহিনীর বিষয়বস্তুতে পশুসমাজের এই রূপটি প্রকাশ পেয়েছে।

অন্যদিকে অত্যন্ত নিপুনভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে দলপতি বা রাজার অত্যাচার। সে আগে জল খাবে, কচি পাতা ও ঘাস খাবে। শুধু তাই নয়, যখন তৃষ্ণার্ত গোরুরা দাঁড়িয়ে থাকত তখন সে জলে আরাম করত। জল কর্দমাক্ত করার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু ক্ষমতার দর্পে হীন কাজ করা তার স্বভাবে দাঁড়িয়ে

গিয়েছিল। বলদর্পী মানুষেরা তো এইরকমই হয়। শোষিত মানুষ উচ্ছিষ্ট খেয়েই বেঁচে থাকে, অন্যদিকে সমাজের শাঁসটুকু ভোগ করে সুবিধাভোগী শ্রেণী।

এমন কি নিজের সমাজের প্রতিও এই সুবিধাভোগী শ্রেণীর কোনো সহানুভূতি থাকে না, কেননা শোষণই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। তারা সমাজের সমস্ত সংগ্রামী চেতনার মানুষকেই শত্রু জ্ঞান করে, তাদের ভয় পায়। পাছে সুযোগসুবিধা হাতছাড়া হয়ে যায়, তাই নবজাত ষাঁড়কে মারতে তাদের এত উৎসাহ। এরাই তো তার পথের কাঁটা।

অন্যদিকে সংগ্রামী চেতনাকে সাধারণ মানুষ গোপনে লালন করতে থাকে। শোষক যদি শোষিতের এই সংগ্রামী প্রস্তুতির লেশমাত্র হদিস পায় তবে তাকে অংকুরেই বিনাশ করবে। পৃথিবীর দেশে দেশে এইভাবে কত সংগ্রামী প্রস্তুতির বিনাশ প্রারম্ভেই ঘটে গিয়েছে। সামাজিক অভিজ্ঞতায় পোড়-খাওয়া মানুষ তাই খুব গুপ্তভাবে সন্তর্পনে সংগ্রামী প্রস্তুতি গড়ে তোলে। এই চেতনাকে বাঁচাবার আকাঙ্খা যে কত প্রবল তা মায়ের মনোভাবে প্রকাশ পেয়েছে, 'বাচ্চাকে আমার বাঁচাতেই হবে। দেখি না শেষ চেষ্টা করে।' এ কি শুধু স্নেহময়ী মায়ের আকুতি, না গোটা সমাজের অত্যাচারিত মানুষের হৃদয়-নিঙরানো সম্ভাবনাকে বাঁচিয়ে রাখার আকুতি? সংগোপনে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হয়। রাতের অন্ধকারে মা যায় অন্ধকার গুহায়। সেখানে প্রতিরোধ, শক্তি সঞ্চয় করে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়ে ওঠে। প্রতিরোধের শক্তি যখন অত্যাচারীর শক্তির চেয়ে বেশি শক্তিশালী হয় তখনই আসে আঘাতের সময়। পোড়-খাওয়া মানুষ অনেক অত্যাচার ও সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে এই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। বাছুরের দেহ ও পায়ের দাগ যখন ষাঁড়ের চেয়ে বড় হয়েছে, শিং যখন অনেক বেশি তীক্ষ্ণ ও মজবুত হয়েছে একমাত্র তখনই সে অন্ধকার থেকে আলোয় বেরিয়ে এসেছে। এ অভিব্যক্তি অসাধারণ।

এইসঙ্গে মনে রাখতে হবে, শত্রু যখন দুর্বল হয়ে পড়ে তখনই তাকে আঘাত করতে হয়। এই সময় নির্ধারণ করতে না পারলে সফল হওয়া যায় না। দলপতির দলের সবাই বিক্ষুব্ধ, তারা তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে না এটা বুঝেছে বাছুর। আবার অত্যাচার করবার মুহূর্তে প্রতিবাদী শক্তি বড় প্রবল হয়ে ওঠে। তার মানসিক আবেগ তাকে দ্বিগুণ শক্তিতে আক্রমণ করতে উৎসাহ জোগায়। ষাঁড় দুর্বল হয়ে পড়েছে, গোরুরা বিক্ষুব্ধ, ষাঁড় জল খাচ্ছে রসিয়ে রসিয়ে, প্রচণ্ড গরমে ও তৃষ্ণায় অন্যরা ব্যাকুল—সেই মুহূর্তে বাছুর ষাঁড়কে আক্রমণ করে। অনেক দিনের অভিজ্ঞতায় এই কৌশলী শক্তিকে আয়ত্ত করেছে সাধারণ মানুষ।

শোষকের স্বভাব পাল্টায় না। ষাঁড়ের স্বভাবও প্রথম থেকে একই রয়েছে।

অন্যদিকে যৌবন এখানে সংগ্রামের প্রতীক হয়ে উঠেছে। বাছুর তো আর ছোট নেই, সে এখন পূর্ণ যৌবনপ্রাপ্ত ষাঁড়।

ষাঁড়ের প্রতি তীব্র ঘৃণা রয়েছে বলেই তার মৃত্যু নিরুত্তাপভাবে দেখানো হয়েছে। এই মৃত্যুতে প্রচ্ছন্ন আনন্দ ও স্বস্তি ফুটে উঠেছে।

নবীন ষাঁড় দলপতি হল। বিপদে-আপদে সে দলকে বাঁচায়। সবাই তাই ভালোবাসল নতুন দলপতিকে। হয়তো এই দলপতি বাস্তবের দলপতি নন, কেননা দলপতিদের অত্যাচারী মূর্তিতে দেখতেই মানুষ অভ্যস্ত। কিন্তু কল্পনায় যে সুন্দর সমাজের চিত্র তারা আঁকতে অভ্যস্ত, এ হল সেই সমাজের প্রতিচ্ছবি। এই সমাজকে তারা পেতে চায়, কিন্তু বাস্তবে তার দেখা মেলে না বলে গল্পের মধ্যে তাকে সত্য করে তুলেছে। ব্যথিত হৃদয়ের আকাঙ্খার বাস্তব প্রকাশ তারা এইভাবেই ঘটিয়ে থাকে। যে সমাজে অবিচার নেই, অত্যাচার নেই, যে সমাজে সবাই সমান—সেই সমাজই যে তাদের কাম্য। বাস্তবে না থাক, স্বপ্নের সেই সমাজ সত্য হয়ে উঠেছে এই পশুকথাটিতে।

ফিনল্যাণ্ড

দেশ পরিচয়

বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী এবং নানান দেশের সবচেয়ে গর্বের বস্তুগুলি এদেশের মানুষ অনুসরণ করেছে, পাশাপাশি নিজেদের সুন্দর ও মহান ঐতিহ্যকেও লালন করে চলেছে। সহনশীলতা ও স্বীকরণের এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বড় একটা চোখে পড়ে না। বিচিত্র জাতিগোষ্ঠীর মিশ্রণে এবং পূর্ব-বালতিক, নরডিক ও ল্যাপ্ নরগোষ্ঠীর পারস্পরিক মিলন এবং আদান-প্রদানে গড়ে উঠেছে বর্তমান ফিনল্যাণ্ডের উন্নত জাতি।

ফিনল্যাণ্ডের উত্তরে নরওয়ের উত্তরাংশ এবং আর্কটিক সাগর, দক্ষিণে ফিনল্যাণ্ড উপসাগর, পশ্চিমে বোথনিয়া উপসাগর, সুইডেন আর পূর্ব দিকে রয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নের পশ্চিমাংশ।

বিস্তৃত বনভূমি, অসংখ্য সরোবর, নদী, গভীর অরণ্যে-ঘেরা হাজার হাজার দ্বীপ এই দেশকে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে মনোরম করে তুলেছে। 'হাজার সরোবরের দেশ'— এই ফিনল্যাণ্ডে কোনো পাহাড় নেই।

ফিনল্যাণ্ডের সম্পদ বিশাল পাইন বৃক্ষের অরণ্য। দেশের ব্যাপক অংশ জুড়ে এই বন-সম্পদ ছড়িয়ে রয়েছে। দেশের মধ্যভাগে রয়েছে অসংখ্য সরোবর, এবং প্রায় ১২,০০০ বর্গ মাইল এলাকা জুড়ে এইসব সরোবর থাকায় দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ গড়ে ওঠা সম্ভব হয়েছে। কাগজ দেশলাই প্লাই-উড সুতোর-নলি প্রভৃতি তৈরির জন্য ফিনল্যাণ্ড বিদেশে বিপুল পরিমাণ কাঠ ও মণ্ড রপ্তানি করে। পশুসম্পদে সমৃদ্ধ হওয়ার জন্য মাখন পনির যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয়। দেশের পরিশ্রমী মানুষ কাঁকুরে অনুর্বর জমিতেও রাই ওট বার্লি ও আলু উৎপাদন করে। সমবায় পদ্ধতি ব্যাপকভাবে গ্রহণ করার ফলে দেশ সমৃদ্ধ হয়েছে।

দেশের অর্ধেক মানুষ কৃষক। উত্তর অংশের কিছু মানুষ পশুপালক। নাবিকের বৃত্তিও খুব জনপ্রিয়। দেশে জাহাজ শিল্প খুব উন্নত। দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতা-মূলক। গ্রামীণ মানুষের মধ্যেও তাই শিক্ষার হার খুব বেশি। ফিনল্যাণ্ডই পৃথিবীর প্রথম দেশ যেখানে নারীকে সমান ভোটাধিকার দেওয়া হয়েছে। এক শ' বছরের ওপর হয়ে গেল দেশ থেকে মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছে। শিশুদের কল্যাণের সার্বিক ব্যবস্থা করার জন্য এ দেশকে বলা হয় 'শিশুদের স্বর্গভূমি'।

যুগ যুগ ধরে ফিনল্যাণ্ডের বন-জলাভূমি-দ্বীপের মানুষ স্মৃতিতে ধরে রেখেছে প্রাচীনতম সব রূপকথা বীরগাথা সঙ্গীত ছড়া প্রবাদ প্রভৃতি। মুখে মুখে সেগুলি শুনিয়েছে উত্তরপুরুষকে। এমন সমৃদ্ধ মৌখিক লোকসাহিত্য সত্যিই সকলকে বিস্মিত করে.।

উনিশ শতকে ফিনল্যাণ্ডে ব্যাপকভাবে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটে। তখন থেকেই দেশের সমৃদ্ধ লোকসংস্কৃতি সংরক্ষণ ও সংগ্রহের প্রেরণা জাগে। এদের মধ্যে উজ্জ্বলতম স্মরণীয় ব্যক্তিত্বের নাম ইলিয়াস লোনরোট। তিনি ছিলেন গ্রামের দরিদ্র দর্জির সন্তান। দীর্ঘদিন গ্রামে গ্রামে ঘুরে কষ্টকর জীবন কাটিয়ে তিনি নানা লৌকিক গল্প, গাথা সংগ্রহ করেন এবং এগুলোকে কেন্দ্র করে একটি জাতীয় মহাকাব্য লেখেন। এই.মহাকাব্যের নাম 'কালেভালা' অর্থাৎ বীরভূমি। এ ছাড়াও তিনি লোকগীতি প্রবাদ এবং অসংখ্য লোককথা সংগ্রহ করে রেখে গিয়েছেন।

ফিনল্যাণ্ড প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র। দেশটির আয়তন ১৩০, ১৬৫ বর্গ মাইল ও লোক-সংখ্যা ৪, ৩৯৪, ৭০০।

পশুকথা

বুদ্ধিমান ছাগল

উত্তরদিকের এক গভীর জঙ্গলে এক নেকড়ে থাকত। তার নাম পেক্কা। সে ছিল খুব বোকা আর ভীষণ ভীতু।

কয়েকদিন পেক্কার খাওয়া-দাওয়া হয়নি। শিকারের খোঁজে সে বনের এধারে-ওধারে ঘুরছে। এমন সময়ে অল্পদূরে পেক্কা দেখল, একটা ছাগল আর একটা ভেড়া মুখ নিচু করে ঘাস খাচ্ছে। দুজনেই বেশ বড় আর মোটাসোটা।

নেকড়ে নিজের মনেই বলল, 'ওরা এখানে কেন ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছে? এটা তো ওদের জায়গা নয়? ওদের যদি খারাপ কিছু ঘটে যায় তাহলে আমার কোনো দোষ নেই, ওদেরই দোষ।'

ছাগল আর ভেড়া ছিল দুই বন্ধু। ছাগলের নাম ভুহি আর ভেড়ার নাম ভিনাস। তারা দুজনেই খুব ভালোভাবে জানত যে, বনে-জঙ্গলে তারা মোটেই নিরাপদ নয়। যেকোনো সময়ে নেকড়ে ভালুক তাদের মেরে ফেলতে পারে। কিন্তু তারাই বা কি করবে? খিদের কষ্ট যে আর সহ্য হয় না। গাঁয়ের আশেপাশের মাঠে ঘাস

নেই, নিচু গাছে পাতা নেই। তাই জীবন বিপন্ন করেও খাবারের খোঁজে বনে বনে ঘুরতে হচ্ছে। মৃত্যু হতে পারে জেনেও এখানে আসা ছাড়া উপায় ছিল না। তাই তারা এমন জায়গায় এসেছে।

ভেড়া কেমন ভয়ে ভয়ে বলল, 'বন্ধু, এই বনে ঢুকে পড়ার পর থেকেই আমার কেমন ভয়ভয় করছে, বুক কাঁপছে, লোম খাড়া হয়ে উঠছে। যদি নেকড়ে তাড়া করে তবে কি হবে? আমরা কেমন করে নেকড়ের হাত থেকে বাঁচব? তুমি কিছু ভেবেছো?'

ভুহি দাড়ি নেড়ে জবাব দিল, 'বন্ধু, কিছু ভেবো না। আমি অনেক ভেবেচিন্তে একটা বুদ্ধি বাতলেছি।'

তারপরে ভুহি একটা থলে বের করল, তার মধ্যে টুকরো টুকরো কাঠ ঢোকালো, থলেটা অর্ধেক ভরে গেলে থলের মুখটা বন্ধ করে খুব জোরে সেটা নাড়া দিল। কাঠের টুকরোগুলো নড়ে-চড়ে অদ্ভুত শব্দ বের হল। থলেটা পিঠের ওপরে ফেলে ছাগল ভেড়াকে বলল, বন্ধু ডিনাস তুমি মোটেই ভয় পেয়ো না। বনের দুষ্টু জানোয়ারদের থাবা থেকে আমরা ঠিক বেঁচে থাকব। ওদের কিভাবে ভয় দেখাতে হয় তা আমি জানি। বুদ্ধি খাটিয়ে আমাদের বাঁচতেই হবে।'

কথা শেষ হতেই পেকা নেকড়ে বেরিয়ে এল ঝোপ থেকে, একেবারে তাদের খুব কাছাকাছি।

শয়তানী চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে নেকড়ে বলল, 'হাঃ হাঃ! ঐ থলেটা কোন্ কাজে লাগবে? ওর মধ্যে কি আছে? আজেবাজে কথা বলবে না একদম, ঠিক জবাব দাও। এক্ষুনি জবাব দাও। নইলে তোমাদের দুজনকেই মেরে ফেলব। বুঝতেই পারছো, তোমাদের না মেরে আমার কোনো উপায় নেই। কাজেই ঠিক জবাব দেবে।'

ভুহি বাঁকা চোখে ডিনাসের দিকে তাকিয়ে থলেটা অল্প একটু নেড়ে দিল। অল্প শব্দ হল। ভুহি তখন নেকড়েকে বলল, 'এই থলেতে কি আছে? তাই কি তুমি জানতে চাও? তবে শুনেই নাও, কি আর করা! এই থলের মধ্যে আছে অনেক নেকড়ের হাড় আর মাথার খুলি। আমরা যতগুলো নেকড়ে মেরেছি, তাদের মাংস খেয়ে হাড় আর খুলি এর মধ্যে জমিয়ে রেখেছি। কিন্তু বেশ কয়েকদিন ধরে খাবার মত একটাও নেকড়ে খুঁজে পাচ্ছি না। তাই না ডিনাস? যাক নেকড়ে, তুমি এসে পড়েছো, খুব ভালো হয়েছে। বড় ঠিক সময়ে এসে গিয়েছো। আমাদের দুজনের কি খিদেই না পেয়েছে, তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না। ডিনাস, তুমি শিং নামিয়ে তৈরি হও, জলদি। এইবার নেকড়েকে মেরে ফেল।'

ভেড়া তার বাঁকানো লম্বা শিং নেড়ে নিল, মুখটা মাটির দিকে নামালো, সামনের দুটো পা দিয়ে মাটিতে আঁচড়ে নিল দু'বার, তারপর এগিয়ে যাবার জন্য দেহটা দুলিয়ে নিল।

পেক্কা ভেড়ার ভাবভঙ্গি দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। সে এমন হক্‌চকিয়ে গেল যে নিজে আক্রমণ করতে ভুলে গেল, প্রতিরোধ করার ক্ষমতা চলে গেল, পাগুলো এমন কাঁপতে লাগল, এমন ভারি হয়ে উঠল যে সে দৌড়ে পালাতেও পারল না।

সে কেঁদে ফেলল, ধরা গলায় বলল, 'ভাই, আমার কথা শোন। আমাকে মেরে ফেল না। আমি যে তোমাদেরই বন্ধু। আমাকে খেয়ো না, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি তোমাদের জন্য ভালো কিছু করব। আমাকে ছেড়ে দাও।

ছাগল বলল, 'ডিনাস, তুমি তৈরি থেকো, কিন্তু এক্ষুণি নেকড়েকে মেরে ফেল না।' তারপরে নেকড়ের দিকে তাকিয়ে দরাজ গলায় বলে উঠল, 'যদি আমরা সত্যি সত্যি তোমায় ছেড়ে দি, তুমি আমাদের জন্য কি করবে?'

নেকড়ে প্রতিজ্ঞা করল, 'বন্ধু, তোমরা যদি আমাকে ছেড়ে দাও, তবে আমি তোমাদের জন্য বারোটা নেকড়ে পাঠিয়ে দেব। আমাকে মেরে আর কতটুকু মাংস হবে? বারোটা নেকড়ের মাংস অনেক হবে, তোমাদের বেশ পেট ভরবে। আমি ঠিক পাঠাব, আমাকে দয়া করে ছেড়ে দাও।' নেকড়ের দু'চোখ বেয়ে জল পড়ছে।

ছাগল দাড়ি নেড়ে মাথা ঝাঁকিয়ে উত্তর দিল, 'বারোটা নেকেড়ে! আচ্ছা, বারোটা! তাহলে মনে হচ্ছে তুমি ঠিকই বলছো। একটা নেকড়ের চেয়ে বারোটা নেকড়ের মাংস অনেক বেশি হবে। ঠিক কথা, খুব খাঁটি কথা। কিন্তু একটা শর্ত আছে। তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি, কিন্তু ঠিক বারোটা নেকড়েই পাঠাতে হবে। একটা কম হলে চলবে না। এটা মনে থাকে যেন। কথা যদি না রাখো, তবে আজ হোক কাল হোক তোমায়...'

নেকড়ের পাগুলো ভয়ে কেমন অসাড় হয়ে গিয়েছিল, মাটি থেকে পা তুলতে পারছিল না। তবু সেই পায়েই যত জোরে পারে দৌড় দিল সে। ছুটতে ছুটতে অনেক দূরে এসে হাঁফ ছাড়ল। ভয় তবু যায় না।

তারপরে নেকড়ে আরও বারোটা নেকড়েকে এক জায়গায় ডেকে আনল। সবাইকে বলল, 'ভাই, আমরা সবাই ভাই ভাই। তোমাদের কেন ডেকেছি তা বলছি। দুটো ভয়ানক জানোয়ারের হাত থেকে তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি। একজন হল ছাগল, আর অন্যজন ভেড়া। তোমরা খুব সাবধানে থেকো, ছাগল আর ভেড়া এই বনে ঢুকেছে আর নেকড়েদের মেরে মেরে মাংস খাচ্ছে। নেকড়েদের খেতেই তারা বনের নানাদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বললে বিশ্বাস করবে না, এর মধ্যেই তারা এত

নেকড়ে খেয়েছে যে, আমাদের সেই হতভাগ্য ভাইদের মাথার খুলি আর হাড়ে তাদের একটা থলে ভরে গিয়েছে। সেই থলে নিয়ে তারা ঘুরে বেড়ায়। আমি নিজে চোখে হাড় ও খুলিতে ভর্তি সেই বিরাট থলে দেখে এসেছি। তাই ভাই, চল আমরা এই বন ছেড়ে পালাই। তোমরাই বল, আমাদের কি পালানো উচিত নয়? যদি আমরা বাঁচতে চাই, তাহলে এ ছাড়া পথ নেই।' এতগুলো ভয়ের কথা বলে নেকড়ে হাঁপাতে লাগল।

নেকড়েরা একসঙ্গে বলে উঠল, 'কি? তেরোটা নেকড়ে একটা ছাগল আর একটা ভেড়ার ভয়ে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যাবে? তা কখনোই হতে পারে না। আমরা একসঙ্গে ওখানে যাব আর ওদের সঙ্গে লড়াই করব। দেখি না কি হয়।'

পেক্কা লেজ নাড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'ভাই, আমাকে আর তোমাদের মধ্যে ধরো না। আমাকে বাদ দাও। আমি আর ঐ সাংঘাতিক নেকড়ে-খেকো জন্তুর মুখোমুখি হতে চাই না। আমায় মাফ কর।'

নেকড়েরা আর কি করে! পেক্কাকে ছাড়াই তারা রওনা হল।

দূর থেকে ছাগল দেখতে পেল এক দঙ্গল নেকড়ে আসছে। হ্যাঁ, ঠিক তাদের দিকেই আসছে। ছাগল তাই তাড়াতাড়ি একটা গাছের অনেক উঁচু ডালে চেপে বসল। ভেড়াও ছাগলের পেছন পেছন গাছে উঠল, কিন্তু খুব উঁচু ডালে উঠতে পারল না। সে একটা নিচু ডালে বসে রইল আর ভয়ে কাঁপতে লাগল। এদিকে বারোটা নেকড়ে সেই গাছের নিচে এসে দাঁড়াল, গাছটাকে ঘিরে ওপরে চেয়ে রইল।

'এইবার! ভেড়া আর ছাগল, দেখি তোমাদের কত সাহস। নেমে এসো নিচে। আমারা তোমাদের সঙ্গে লড়াই করব। দেখবো তোমাদের কত তেজ। খাবে না আমাদের?'

ছাগলও বন কাঁপিয়ে ভেড়াকে আদেশ করল, 'ডিনাস, তাহলে তৈরি হয়ে নাও। ভালোভাবে তৈরি হও। আমরা যা চেয়েছিলাম তাই হয়েছে। বারোটা নেকড়েই এসে গিয়েছে। একেবারে সময় নষ্ট করবে না। ওদের ওপরে প্রচণ্ড শক্তিতে লাফিয়ে পড়, ওদের প্রত্যেককে মেরে ফেল। তারপর...'

এই না বলে ছাগল আস্তে আস্তে উঁচু ডাল থেকে নামতে লাগল। আর ঠিক তখনই থলেটা নিয়ে খুব ঝাঁকুনি দিল, প্রচণ্ড শব্দ হতে লাগল কাঠের টুকরো-গুলোতে। থলে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে শিং দিয়ে ভেড়ার পেছনে মারল এক গুঁতো। ধাক্কা সামলাতে না পেরে ভেড়ার পা হড়কে গেল, আর প্রচণ্ড শব্দ করে ভারি দেহটা গিয়ে পড়ল নেকড়েদের পিঠের ওপরে।

ছাগল চিৎকার করে উঠল, 'বাঃ, বাঃ! সাবাস ডিনাস! ঠিক জায়গায়।

পড়েছো, বেশ তৈরি হয়ে লাফিয়ে পড়তে পেরেছো। এইবার সব কটা নেকড়েকে মেরে টুকরো টুকরো করে দাও। একটাকেও পালাতে দিও না, সবকটাকে মেরে ফেল।' একদিকে গলায় ভীষণ চিৎকার করছে ছাগল, আর আরও জোরে জোরে থলেটা ঝাঁকাচ্ছে। চারপাশে প্রচণ্ড শব্দ হতে লাগল, কেমন যেন ভয়-পাওয়ানো পরিবেশ।

আচম্‌কা ভেড়ার আক্রমন, ওপরে প্রচণ্ড হাড়-কাঁপানো শব্দ, ছাগলের চিৎকার সব মিলে অদ্ভুত অবস্থা। নেকড়েরা ভয় পেয়ে এ ওর দেহের ওপরে লাফিয়ে পড়ল, বিশৃঙ্খল অবস্থায় তারা নিজেরাই নিজের দেহ ক্ষতবিক্ষত করল। প্রত্যেকটা নেকড়ে নিজেকে বাঁচাতেই ব্যস্ত হয়ে পড়ল, নিজেকে বাঁচানোই এখন জরুরী প্রয়োজন। প্রতিরোধ ভুলে তারা পালাবার পথ খুঁজল। তারা প্রত্যেকেই তখন ভাবতে শুরু করেছে, 'এরা নিশ্চয়ই সেই সাংঘাতিক দুটো জন্তু। সর্বনাশ!'

অল্পক্ষণ পরেই গাছের তলাটা ফাঁকা হয়ে গেল। সেখানে রইল শুধু ভেড়া আর গাছের নিচু ডালে ছাগল।

সেইদিন থেকে ডুহি ছাগল আর ডিনাস ভেড়া সুখে সেই বনে বাস করতে লাগল। আর কোনোদিন কোনো নেকড়ে তাদের ধারে-কাছেও ঘেঁষেনি।

অভিপ্রায়

বন-নদী-পাহাড় ঘেরা গ্রামীন মানুষকে সামাজিক ও প্রাকৃতিক নানা প্রতিকূলতার সঙ্গে সবসময় লড়াই করে বাঁচতে হয়। একদিকে সমাজের ক্ষমতাশালী মানুষ ও অন্যদিকে নিষ্ঠুর প্রকৃতি সাধারণ মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। কিন্তু বাঁচার তাগিদ, প্রয়োজনের খাতিরে মানুষকেও নানা কৌশল অবলম্বন করতে হয়। হিংস্র জন্তুর হাত থেকে বাঁচার জন্য মানুষের ধারাল দাঁত বা নখ নেই। কিন্তু বাড়তি অস্ত্র ও বুদ্ধি প্রয়োগ করে মানুষ সাহসিক লড়াই চালায়। শত্রু যদি বলশালী হয় তাকেও পর্যুদস্ত করতে মানুষ বিচিত্র কৌশল প্রয়োগ করে থাকে। ফিনল্যাণ্ডের এই পশুকথাটি রূপকের মাধ্যমে সেই অভিপ্রায়ই প্রকাশ করেছে।

মানুষ সাধারণত বলশালীর চরিত্র আঁকতে তাকে বোকা বলে চিহ্নিত করে। আসলে মনের ক্ষোভ জ্বালা ও বেদনা তাচ্ছিল্যের মধ্য দিয়েই সে প্রকাশ করে। তাই ছাগল-ভেড়ার চেয়ে সবদিক দিয়ে নেকড়ে বলশালী বলেই তাকে বোকা এবং

ভীরু আখ্যা দিয়ে তারা মানসিক তৃপ্তি লাভ করেছে। লোককথার এ এক সার্বজনীন মনোভাব।

যে কূট ও নিচ সে তার নিজের স্বার্থের অনুকূলে কোনো-না-কোনো যুক্তি খাড়া করবেই। অর্থাৎ দুরাত্মা সবসময়ই ছলনার আশ্রয় নেয়। মানব সমাজে এ অভিজ্ঞতা প্রতিদিনের। তাই ছাগল আর ভেড়ার ক্ষতি করার বাসনায় নেকড়েরা তাদের ওপরেই দোষ চাপিয়েছে। 'ওদের যদি খারাপ কিছু ঘটে যায় তাহলে আমার কোনো দোষ নেই, ওদেরই দোষ'—এটা শুধুমাত্র ছলনা ছাড়া আর কিছু নয়।

মানুষ ক্ষুধার তাড়নায় নিরাপদ আশ্রয় ছেড়েও বিপদের ঝুঁকি নিতে বাধ্য হয়। গ্রামে যখন খাদ্য মেলে না, জমিতে যখন ফসল থাকে না, তখন অন্নের জন্য মানুষকে অন্যত্র যেতে হয়। অনিশ্চয়তা ও বিপদ থাকলেও কোনো উপায় তো নেই। ছাগল ও ভেড়া কে তাই পেটের দায়ে বিপদসঙ্কুল অরণ্যে প্রবেশ করতে হয়েছে। মৃত্যু হতে পারে জেনেও তাদের কোনো উপায় নেই। এও তো স্বাভাবিক।

মানুষ কৌশল ও বুদ্ধি প্রয়োগ করে তার অসহায়ত্ব থেকে বাঁচার তাগিদে। ছাগল নেকড়েদের ভয় পাওয়ানোর জন্য থলে ভরে কাঠ নিয়েছে। মুখেও ভয় দেখিয়েছে, থলেতে আছে নেকড়ের মাথার খুলি ও হাড়। শুধু তাই নয়, চরম বিপদের মুহূর্তেও সাহস রাখতে হবে। 'আমি যে দুর্বল একথা শত্রুকে জানতে দিতে নেই। কেননা, বুদ্ধি খাটিয়ে আমাদের বাঁচতেই হবে।'

শত্রু বিপদে পড়লে অসহায় অবস্থায় নিজেকে বন্ধু বলে পরিচয় দেয়। অর্থাৎ নিজের জীবন বাঁচাতে সে নরম হয়। কিন্তু মানুষ জানে যে, শত্রু বিপদে পড়েই এমন মনোভাব দেখাচ্ছে, একারণেই তার সঙ্গে সন্ধির কথাবার্তা বলার সময়েও প্রস্তুত থাকতে হয়। তাই ছাগল বলেছে, 'ভিনাস তুমি তৈরি থেকো, কিন্তু এখুনি নেকড়েকে মেরে ফেলো না।' বহুবার ঠেকে-ঠেকে তবে পোড়-খাওয়া মানুষ এ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে।

মানুষের স্বার্থপরতার তুলনা নেই। নিজের প্রাণের বিনিময়ে বারোজনকে বলি দিতেও আমরা কুণ্ঠিত নই। আবার বিপদে পড়লে নিজের প্রাণ নিয়ে কোনো-রকমে পালাতে পারাটাই আমাদের লক্ষ্য। বারোটা নেকড়ে যখন প্রচণ্ড আক্রমনের মুখে পড়ল তখন মিলিত প্রতিরোধ না করে নিজের নিজের প্রাণ বাঁচাতেই তারা ব্যস্ত হয়ে উঠল। স্বার্থপর মানুষ এ ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারে না।

শত্রু যখন বলশালী হয় তখন আক্রমণের পদ্ধতিও অন্যরকম হওয়া প্রয়োজন। এমন ভাবভঙ্গি করতে হবে এবং এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যাতে শত্রু বুঝতে না পারে প্রতিপক্ষের শক্তি কতটা। শত্রুকে সুযোগ ও সময় না দিয়েই আচমকা

আক্রমণ চালাতে হয়। তাকে প্রস্তুত হবার সময় দেওয়া চলবে না। আর এই আচমকা আক্রমণে শত্রুপক্ষে যত বিশৃঙ্খলা এবং বিচ্ছিন্নতা ঘটবে ততই যুদ্ধ জেতা সহজ হবে। কেননা অসংগঠিত বিশৃঙ্খলবাহিনী প্রতিরোধের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, নিজেদের প্রাণ বাঁচাতেই ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ছাগল এমন পরিবেশ সৃষ্টি করেছে যাতে শত্রুরা ভয় পেয়ে যায়, আর সেই মুহূর্তেই চালিয়েছে আক্রমণ। ভেড়ার পড়ে যাবার পরেই নেকড়েদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা এসেছে। তার ফলেই যুদ্ধ জয়। যুগ যুগ ধরে শত্রুর সঙ্গে মোকাবলা করতে করতে শত্রু সম্পর্কে এই জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা ফিনল্যাণ্ডের লোকসমাজ অর্জন করতে পেরেছে।

নরওয়ে

দেশ পরিচয়

স্ক্যানডিনেভিয়া উপদ্বীপের অন্যতম দেশ নরওয়ে। সমুদ্র ও পাহাড়ে ঘেরা এই দেশ একটি দুর্ভেদ্য দুর্গের মত। প্রকৃতিতে রয়েছে মনোরম বৈচিত্র্য। নরওয়ের মানুষেরাও এই বিচিত্র প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রকৃতির মতই সরল অথচ ঋজু বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

নরওয়ের উত্তরে আর্কটিক সাগর, দক্ষিণে উত্তর সাগর, ডেনমার্ক, পশ্চিমে অতলান্তিক মহাসাগর এবং পূর্বে রয়েছে সুইডেন।

নরওয়ের মানুষের সুঠাম দেহ, লম্বা গড়ন, নীল চোখ, হলুদ চুল। সৎ তাদের জীবনাচরণ, স্পষ্ট খোলাখুলি তাদের কথাবার্তা। নাগরিক জটিলতা ও ক্ষুদ্রতা তারা এড়িয়ে চলতেই অভ্যস্ত। মুক্ত উদার প্রকৃতির মধ্যে স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠার জন্য এবং ঐতিহ্যকে সযত্নে লালিত করার ফলেই সেখানকার মানুষের হৃদয় বড় কোমল, সত্যিকার দয়ায় ভরা তাদের অন্তর। তাদের মতন পশুপাখিকে এমন গভীরভাবে ভালবাসতে আর কোনো দেশের মানুষ জানে না। এই দেশের পাখিরা তাই নির্ভীক, পশুরা অনেক সহজ। অথচ এই কোমল হৃদয় মানুষেরা কি প্রাণপাত পরিশ্রমই না করতে পারে।

প্রকৃতি অপূর্ব মনোরম হলেও খাদ্য উৎপাদনের ব্যাপারে কিন্তু বড়ই প্রতিকূল। সমুদ্রের তীরভূমি ও পাহাড়ী জমিতে শস্য চাষ হয় না, প্রায় উষর বললেই চলে। পাহাড়গুলোর অধিকাংশ অত্যন্ত খাড়া। তাই নরওয়ের মূল সম্পদ তার বনভূমি। কাগজ ও অন্যান্য বনজাত শিল্প তাই গড়ে উঠেছে। বনভূমির বিরাট অংশে চাষ-আবাদও হয়। এছাড়া নরওয়ের মানুষের অন্যতম জীবিকা সমুদ্রে তিমিশিকার, পাহাড়ী উত্তাল নদীতে মৎস্যশিকার, বরফ সরে যাওয়ার পরে পাহাড়ী এলাকায় পশুচারণ। নরওয়েবাসীরা অসাধারণ দক্ষ নাবিক এবং এ ব্যাপারে গোটা দুনিয়াজোড়া তাদের খ্যাতি। সমুদ্রে জাহাজের সংখ্যায় ও কর্তৃত্বে তারা বাণিজ্য-জগতের অন্যতম দক্ষ শক্তি। দেশে কিছু কয়লা হয়। সামুদ্রিক সীল শেয়াল ও মরুভালুক শিকার করে তাদের চামড়া রপ্তানি করাও একটি অন্যতম উপজীবিকা।

এই সুন্দর দেশের বনভূমি, সমুদ্রের খাঁড়ি, উত্তাল নদীপথ, বনে ঘেরা ফসলের জমি, এখানে সেখানে পশুচারণ ভূমি এবং পশুশিকারের জন্য অরণ্য-গভীরে যেসব সরল দুঃসাহসী পরিশ্রমী নরওয়েবাসী কাজ করে, তাদেব প্রাণভরা লোকগীতি লোককথা বীরগাথা ও দূর সমুদ্রের সাহসী অভিযানের অপরূপ গল্পগুলি প্রতিটি মানুষকে বিস্মিত করবে। জীবনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার ফলেই তাদের লোকসাহিত্যও তাদেরই বিচিত্র কর্মময় জীবনের মত বৈচিত্র্যে পূর্ণ। পশুকথা নরওয়ের বিরাট সম্পদ, কেননা পশুর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক বড নিবিড়।

নরওয়ের উপর ডেনমার্ক ও সুইডেনের রাজনৈতিক প্রভাব ছিল উনিশ শতকের গোড়া থেকেই। উনিশ শতকেব মাঝামাঝি নাগাদ দেশে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হলেও ১৮৯৮ সালে সার্বজনীন ভোটাধিকার চালু হবার পর থেকেই পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি সোচ্চার হয়ে ওঠে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নরওয়ে নিরপেক্ষ থাকতে পেরেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ১৯৪০ সালের ৯ এপ্রিল জার্মান নাৎসী বাহিনী হঠাৎ আক্রমণ চালালে ইঙ্গ-ফরাসী সৈন্যবাহিনীর সহায়তায় বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ গডে তোলে নরওয়ের মানুষ। নার্ভিক অঞ্চল তারা পুনরুদ্ধার করে এবং আট সপ্তাহ ধরে তীব্র লড়াই করে সেটা নিজেদের দখলে রাখে। রাজধানী অস্লো শহরে জার্মান প্রভাবিত প্রশাসন কায়েম হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে নরওয়ে আবার স্বাধীনতা ফিরে পায়।

উত্তর ইউরোপের দেশ এই নরওয়ের আয়তন ১১৯,০৮৫ বর্গ মাইল এবং লোকসংখ্যা ৩,৫১০,১৯৯।

পশুকথা

মা ছাগল ও তার তিনটে বাচ্চা

এক যে ছিল খরগোশ। সেদিন তার ফূর্তি দেখে কে! গাছের কোটর থেকে সে ছুটে গেল সবুজ মাঠে। কচি ঘাসে মাঠ রয়েছে ভরে। সোনালী সূর্য্যের আলোয় সবুজ মাঠ চিক্‌চিক্ করছে। খরগোশ লাফ দিয়ে পড়ল সেই মাঠে। সে দু'বার ডিগবাজি খেল, বার কয়েক তিবৃতিব্ করে গড়িয়ে নিল, তারপর সারা মাঠের এখানে-

ওখানে শুধুই লাফিয়ে লাফিয়ে ঘুরল। থেমে পড়ল মাঠের মাঝখানে, গুনগুন্ করে খুশির গান গেয়ে উঠল। হঠাৎ গান থামিয়ে পেছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াল, এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল, মন দিয়ে কি যেন শুনতে চেষ্টা করল।

এমন সময় মাঠের ওপার থেকে ঘাস শুঁকতে শুঁকতে সেখানে এল এক শেয়াল। মুখ তুলে হাসিহাসি ভাব নিয়ে শেয়াল বলল, 'কি ব্যাপার খরগোশ! এত খুশিখুশি দেখাচ্ছে কেন?'

কান নেড়ে খুশিতে উপচে পড়ে খরগোশ জবাব দিল, 'সুপ্রভাত। আজ বড় ভালো দিন। আমার আনন্দ হবে না? আজকে যে আমি বিয়ে করতে যাবো। বিয়ের আনন্দে আজ আমি তোমায় সব কথা বলব। আজ আমার বিয়ে। কি মজা, কি মজা!'

শেয়লাও আনন্দে বলল, 'বাঃ! তাহলে আজ সত্যি তো খুব আনন্দের কথা।'

খরগোশ মাথা নেড়ে অঙ্গভঙ্গি করে বলল, 'না, ঠিক তা নয়। বিয়েটা সবসময় খুব আনন্দের নাও হতে পারে। মনে কর, আমার যে বৌ হচ্ছে সে খুবই বদমেজাজের হতে পারে; কিংবা ধরো, সেই বৌ খুব দজ্জাল হতে পারে, মানে একটা জ্যান্ত রাক্ষসী আর কি।'

মনমরা হয়ে শেয়াল বলল, 'খরগোশ, তাহলে তো ব্যাপারটা খুব সুবিধের মনে হচ্ছে না। তুমি তো তাহলে খুব ফ্যাসাদে পড়বে। তাহলে ।'

খরগোশ সামনের হাতটা নেড়ে বলল, 'না, ঠিক তা নয়। বৌ যদি এরকম হয়ও, তবু ব্যাপারটা তুমি যতটা খারাপ ভাবছ, তা ঠিক নয়। কেন বলতো? বৌকে বিয়ে করার সময় আমি বিরাট যৌতুক পাবো। কেননা, আমার বৌয়ের নিজের একটা মস্ত বাড়ি আছে। তাই মনে রেখো, খুব একটা চিন্তার কিছু নেই।'

শেয়াল আবার খুশি হয়ে উঠল। হেসেহেসে বলল, 'তাহলে তো খুব ভালো কথা। খুব ভালো জিনিস তুমি পেয়ে যাবে। সত্যি চিন্তার কিছু নেই।'

ঘাসে আধশোয়া হয়ে খরগোশ বলল, 'না, ঠিক তা নয়। তুমি যেভাবে ভালো ভাবছো, তা নাও হতে পারে। ধরো, আগুন লাগল। সেই আগুনে আমাদের ঘর গেল পুড়ে। আর সেই সঙ্গে ঘরের মধ্যে আমাদের যা কিছু ছিল তাও পুড়ে ছাই হয়ে গেল। এটা হতেই পারে। তাই চিন্তার তো কিছু থেকেই যাচ্ছে।'

মুখ কাঁচুমাচু করে শেয়াল করুণভাবে বলল, 'তাহলে তো খুব খারাপ ব্যাপার হয়ে যাবে। খুব চিন্তার কথা।'

হঠাৎ দু'পায়ে ভর দিয়ে লাফিয়ে উঠল খরগোশ। পেছনের পায়ে বসে খুশিতে ডগমগ হয়ে বলল, 'না, ঠিক তা নয়। তুমি যতটা খারাপ ব্যাপার ভাবছো ঠিক ততটা খারাপ নাও হতে পারে। চিন্তার এমন কিছু নেই। কেন বলতো? কেননা, বাড়ি আর জিনিসপত্তরের সঙ্গে আমার বৌও পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। আর তখন আমি আবার ·…।'

কথা শেষ না করেই খরগোশ আনন্দে সবুজ ঘাসে ডিগবাজি খেতে লাগল।

অভিপ্রায়

সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কুপ্রথাসমূহ মানুষের মূল্যবোধগুলিকে ভোঁতা করে দেয়। অর্থনৈতিক এমন সব ব্যবস্থা গড়ে ওঠে যার ফলে সম্পত্তি ও অর্থের ওপরেই সামাজিক মর্যাদা নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের স্বাধীনতাকে খর্ব করার অপচেষ্টাও চলতে থাকে। যত মানুষ স্বাধীনতা হারাবে, শোষন ততই দৃঢ় হবে। এই মানসিকতা থেকেই নারীজাতিকেও সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। নারীর ব্যাক্তিত্ব বিকাশের সমস্ত পথ রুদ্ধ করা হয়, তার মন বলে যে কিছু রয়েছে তাকে অস্বীকার করা হয়। নিজস্ব ভালোলাগা মন্দলাগার ক্ষেত্রে নারী অবহেলিত। পুত্রের জন্ম দেবার জন্যই পুরুষ নারীকে গ্রহন করে। নারী সম্পত্তি বলেই জড় পদার্থের মত যখন খুশি তখন তাকে ত্যাগ করারও অধিকার জন্মায়।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজে পুরুষ বিয়ে করে আর নারীদের বিয়ে হয়। নারীর বিয়ে হয়, দয়া করে তাকে ঘরনী করা হয়। নারীর অর্থনৈতিক কোনো স্বাধীনতা থাকে না বলেই সেও নত হয়ে থাকতে বাধ্য হয়, সে শুধুই কৃপাপ্রার্থীনী। আর কৃপা করে তাকে গ্রহন করা হচ্ছে বলেই পুরুষ অযৌক্তিক যৌতুক দাবি করে। নারীর সামাজিক মূল্য নেই, তাই এইভাবে পুরুষের ক্রীতদাসীতে পরিণত হতে সে বাধ্য। কিন্তু বিয়ে উভয়ে উভয়কে করছে—এ বোধ ও চেতনা এই ধরনের সমাজে জাগে না, সুবিধাভোগীরা তা জাগতে দেয় না।

পুরুষ যেখানে সমাজ শাসন করছে এবং নারী যেখানে সম্পত্তি, সেই অবস্থায় যৌতুকের জন্য, লালসা চরিতার্থ করতে পুরুষ বারবার বিয়ে করে। সম্পত্তি আহরণের

এই রসিক-বুদ্ধিতে [illegible] ব্যাখ্যা দেবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। পরিচিত হয় সমাজের এর নগ্নতম বহিঃপ্রকাশ [illegible] দেখেছি, পৃথিবীর সমস্ত পুরুষশাসিত সামন্ততান্ত্রিক সমাজেই নানাবিধ রূপে এর দেখা মিলবে।

এই অমানবিক করুণ অবস্থাকে নির্মল হাসির মাধ্যমে প্রকাশ করেছে নরওয়ের লোকসমাজ। কিন্তু এই হাসির পেছনে রয়েছে বেদনাময় এক অভিজ্ঞতা।

বিয়ে মানুষের জীবনে এক নতুন আনন্দের জোয়ার বয়ে আনে, জীবনকে পূর্ণতায় পৌঁছে দিতে সাহায্য করে। তাই বিয়ের আগে মন খুশিতে ভরে ওঠাই স্বাভাবিক। কিন্তু খরগোশের সমস্ত চিন্তা যেখানে যৌতুককে কেন্দ্র করে, সেখানে তার আনন্দ নিশ্চয়ই নতুন জীবনে প্রবেশের জন্য নয়। কেননা, বৌ বদমেজাজী বা দজ্জাল হলেও ক্ষতি নেই ; বাড়ি যৌতুক পাবে, এতেই তার মন ভরে রয়েছে। সামন্তসমাজে এই ধরনের প্রেমহীন বানিজ্য-বিবাহ তো স্বাভাবিক।

অনেক মেয়ে যে সংসারে তার স্বভাবের জন্যই অপ্রিয় হয়ে ওঠে তার কথাও এতে রয়েছে। বহু মেয়ে অত্যন্ত রুক্ষস্বভাবের ও ঝগড়ুটে হয়, এ ইঙ্গিতও রয়েছে।

খরগোশের দজ্জাল বৌয়েও খুব বেশি আপত্তি নেই। কেননা, সে বিরাট যৌতুক পেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তার চেয়েও অমানবিক নৃশংস মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছে এখানে। 'আগুনে পুড়ে বৌ মারা যাবে'—এই কল্পনার মধ্যে কোনো বেদনা ফুটে ওঠেনি। একটি বৌয়ের এইভাবে মৃত্যু ঘটার মধ্যে কোনো বিশেষত্ব নেই, এটাই যেন স্বাভাবিক। আর কি অনন্ত মূল্যবোধ! বৌয়ের মৃত্যু ঘটলে খরগোশ কি করবে? জীবনের সবচেয়ে কাছের সঙ্গীর মৃত্যুতে সে কি শোক-বিহ্বল হয়ে পড়বে? না। 'আর তখন আমি আবার ......' বাক্যটি শেষ করতে পারে নি স্বার্থপর সামন্ত-সন্তান খরগোশ। আবার নতুন যৌতুক ও নতুন নারীদেহ উপভোগের চিন্তায় এমনি করেই সামন্তসমাজের সুবিধাভোগী পুরুষ উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। আপনজনের মৃত্যুতে শোকগ্রস্ত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু এক জীবন খোয়া গেলে আরেক জীবন করায়ত্ত করা যখন একটুও কঠিন নয়, তখন [illegible] বিচলিত হওয়ার কোনো কারণ নেই।

[illegible] এই [illegible]।

রুমানিয়া

দেশ পরিচয়

ভৌগোলিক অনেক ভাঙ্গাগড়ার পরে আজকের রুমানিযার আকৃতি অনেকটা পূর্ণিমার চাঁদের মত। এই এক অসাধারণ সংগ্রামী দেশ যে তুর্কি-অধীনতার প্রথম দিন থেকেই উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছে। বিশেষ করে এখানকার কৃষক জনগণ সেই মধ্যযুগ থেকে বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে আপোসহীন লড়াই চালিয়ে এসেছে। বারবার তারা পরাভূত হয়েছে, অত্যাচারে জর্জরিত হয়েছে—তবু মাথা নত করেনি।

রুমানিযার উত্তরে সোভিযেত ইউনিযনের ইউক্রেন, দক্ষিণে বালগেরিয়া, পশ্চিমে হাঙ্গেরি ও যুগোশ্লাভিযা এবং পূর্বে সোভিযেত ইউনিযনের মোলডাভিয়া ও কৃষ্ণ সাগর। সাত হাজার ফুট উঁচু কার্পাথীয় ও ট্রানসিলভানীয় আল্পস্‌ পর্বতমালা উত্তর থেকে মধ্য-দেশ হযে দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে একটা বৃত্তের আকারে চলে গিযেছে।

প্রাকৃতিক সম্পদে দেশ পূর্ণ। গভীর-অরণ্যভূমি মিথেন-গ্যাস তেল লবন কয়লা লোহা তামা সোনা ও রূপায দেশ সমৃদ্ধ। মূল্যবান ইউরেনিযামের ভাণ্ডারও রয়েছে। কাঠ প্রধান সম্পদ হলেও গম আলু বিট ও আঙ্গুর হয়। সম্প্রতি চাল ও তুলা চাষের ব্যাপক চেষ্টা চলছে। গবাদি-পশু ভেড়া শুযোর প্রতিপালনে দেশ এগিয়ে রয়েছে।

রুমানিযার ভাষা ও সংস্কৃতি নানা জাতির সংশ্রবে গড়ে উঠেছে। তাই এখানে মিশ্র ভাষা ও সংস্কৃতির দেখা মিলবে। লাতিন শ্লাভ তুর্কি হাঙ্গেরীয় অবর গথ প্রভৃতি ভাষা ও সংস্কৃতি মিলেই বর্তমান রুমানিয়া গড়ে উঠেছে।

দেশের বিপুল সম্পদের জন্য তুর্কি গ্রীক ও রুশীয় শক্তি বারবার দেশের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে। দেশের মানুষও এই অবিচারের বিরুদ্ধে সমানে লড়াই করে গিয়েছে। ১৮২১ সালে গ্রীকদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভ্যুত্থান হয়। ১৭৮৯ সালে ফরাসী বিপ্লবের পর থেকেই রুমানিয়ার অসংখ্য বুদ্ধিজীবী উদারনৈতিক মানুষ ফরাসী দেশে গিয়েছেন সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার পাঠ নিতে। ফিরে এসেছেন দেশে এবং নব-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছেন স্বদেশবাসীকে। কৃষকের হাতে জমি ফিরিয়ে দেবার এক মহান আন্দোলন হয সেই ১৮৪৮ সালে। কিন্তু তুর্কি ও রুশীয় জারের যৌথ আক্রমণে সেই আন্দোলন ব্যর্থ হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রথমদিকে নিরপেক্ষ থেকেও তাকে যুদ্ধে জড়িয়ে

পড়তে হয়। ১৯১৭ সালে দেশের বেশির ভাগ অংশ চলে যায় অষ্ট্রো-জার্মান কর্তৃত্বে। ১৯৩০ সালে নতুন রাজার অধীনে সেখানে স্বৈরতন্ত্র কায়েম হয়। দেশের সমস্ত সম্পদ চলে যায় নাৎসী জার্মানীতে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই সেখানকার কম্যুনিস্ট পার্টি অসাধারণ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। গুপ্তভাবে তারা দেশের শ্রমিক কৃষককে একত্রিত করতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ১৯৪৪ সালে সোভিয়েত সৈন্য রুমানিয়ায় পৌঁছলে নাৎসী-বিরোধী সংগ্রাম নতুন রূপ নেয়। ১৯৪৫ সালের নভেম্বরে দেশে মূলতঃ কম্যুনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষিত হয়।

দেশে প্রভূত শিল্পোন্নয়ন ঘটলেও আজও দেশের তিন-চতুর্থাংশ মানুষ কৃষিজীবী। নদী ও পাহাড়ের দেশ রুমানিয়ার কৃষক জনসাধারণ জাতীয় ঐতিহ্যকে বহন করে চলেছে বলেই বহু রাজনৈতিক ভাঙাগড়ার মধ্যেও তাদের উন্নত লোকসংস্কৃতি বেঁচে রয়েছে। রুমানিয়া বিশ্বখ্যাতি লাভ করেছে তার লোকশিল্প লোকগীতি ও লোকনৃত্যের বিপুল সম্ভারের জন্য। রুমানিয়ার পশুকথাগুলির একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে—তা হচ্ছে সংগ্রামী মনের প্রকাশ। আঘাত খেয়ে পালিয়ে না এসে তার যোগ্য প্রতিশোধ নিতে হবে। প্রতিশোধ নেওয়ার মধ্যেও জঙ্গী-ভাব রয়েছে। দীর্ঘদিনের সংগ্রাম লোকজীবনকে প্রভাবিত করেছে, তাই তাদের গল্পেও তার প্রকাশ ঘটতে বাধ্য।

ইউরোপের দক্ষিণ-পূর্বাংশের দেশ রুমানিয়ার আয়তন ৯১, ৯৩৪ বর্গ মাইল এবং লোকসংখ্যা ১৮, ২৫৫,৫০৪।

পশুকথা

মা ছাগল আর তার তিনটে বাচ্চা

অনেক অনেককাল আগে (কতকাল আগের কথা তা কিন্তু জানতে চাইবেন না) নীল সমুদ্রের কোলে পাহাড়ী জঙ্গলে বাস করত এক মা-ছাগল। তার ছিল তিন তিনটে বাচ্চা। বড় ও মেজ ছেলের বুদ্ধি ছিল কম, কিন্তু ছোট ছেলে যেমন ছিল করিৎকর্মা আর তেমনি ছিল তার বুদ্ধি। কথায় বলে, হাতের পাঁচটা আঙুল কখনও সমান হয় না।

একদিন মা তার বাচ্চাদের কাছে ডেকে বলল, 'সোনার বাছারা আমার! আমি জঙ্গলে যাচ্ছি, বাড়িতে খাবার কিছুই নেই, কিছু খাবার নিয়ে আসি। সারারাত

তোমরা তো কিছু খাওনি। আমি চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা ভালোভাবে দরজা বন্ধ করে রাখবে।' সবাই সবার কথা শুনবে, একদম দুষ্টুমি করবে না। যতক্ষণ আমার গলা না পাবে, ততক্ষণ দরজা খুলবে না। চারপাশে আমাদের শত্রু রয়েছে। আমি যখন ফিরে আসব, তখন আমি দোরের কাছে দাঁড়িয়ে বলব :

যে কথা বলেছি আগে, সোনা বাছারা আমার,
মায়ের গলা শুনবে আগে, খুলবে তবেই দুয়ার।
খিদের তরে খাবার আনে,
মা যে তাদের, বা খুস্ মনে
পাতা রয়েছে মুখে,
দুধ রয়েছে বাটে।
পিঠের 'পরে থলে,
তাইতে আছে লবণ।
পায়ের 'পরে দোলে,
গমের পিঠে নরম।
হাতের ফাঁকে ফুল,
দোলে দোদুল দুল

আমি কি বললাম তা তোমরা বুঝতে পেরেছো?'

এক সঙ্গে গলা মিলিয়ে বাচ্চারা বলল 'হ্যাঁ, মা।'

মা বলল, 'তোমরা একা থাকছ, আমি ভরসা করে যেতে পারি তো?'

বড় ছেলে ছোট শিং নেড়ে বলল, 'মা তুমি ভয় পেয়ো না। আমরা ঠিক থাকবো। আমরা এখন বড় হয়েছি না? কিছু বললে আমরা ঠিক বুঝতে পারি, আমরা যা বলি তাই করি। তাই না?'

মা আদরের চোখে বলল, 'বাঃ! এই তো তোমরা বুঝেছো। তাহলে এসো, তোমাদের চুমু দি। শত্রুর হাত থেকে ঈশ্বর তোমাদের রক্ষা করুন।'

জলভরা চোখে ছোট ছেলে বলল,' মা, তুমিও ভালোভাবে ফিরে এসো। জঙ্গলেও তো কত বিপদ! তুমি খাবার নিয়ে তাড়াতাড়ি এসো।'

মা বেরিয়ে যেতেই ছেলেরা ভালোভাবে দরজা আটকে দিল। ছোট ছেলে উঁচু হয়ে দেখল, ঠিকমত দরজায় কাঠ লেগেছে কিনা। কথায় বলে, দেয়ালেরও কান আছে, জানলারও চোখ আছে। একটা দুষ্টু নেকড়ে অনেকক্ষণ ধরে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে ছিল। সে সব শুনেছে। মায়ের চলে যাবার অপেক্ষায় ঘাপটি মেরে বসে ছিল সে।

'এইবার! এবার আমার পালা। ভুল বুঝে ওরা যদি দরজা খুলে দেয়, তবে আমায় আর পায় কে। ওদের ছাল ছাড়িয়ে মজা করে নরম তুলতুলে মাংস খাব। আহ্!' ভাবতেই নেকড়ের জিবে জল এসে গেল।

আস্তে আস্তে নেকড়ে দরজার কাছে গেল, পরিষ্কার গলায় বলল :

যে কথা বলেছি আগে, সোনা বাছারা আমার,
মায়ের গলা শুনবে আগে, খুলবে তবেই দুয়ার।
খিদের তার খাবার আনে,
মা যে তোদের, রাখিস মনে।
পান্না রয়েছে মুখে,
দুধ রয়েছে বাঁটে।
পিঠের 'পরে থলে,
তাইতে আছে লবন।
পায়ের 'পরে দোলে
গমের পিঠে নরম।
হাতের ফাঁকে ফুল,
দোলে দোদুল দুল।

বাছারা আমার, আমি এসেছি, তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দাও।'

বড় ছেলে লাফিয়ে উঠল। ভাইদের বলল, 'ঐ শোনো, মা আমাদের ডাকছে। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দাও। মা যে আমাদের জন্য খাবার এনেছে। উঃ, কতক্ষণ খাইনি।'

ছোট ছেলে বকে উঠল, 'এত বোকা কেন তুমি? অত তাড়াতাড়ি কখনও দরজা খুলতে আছে? কোনো বিপদ যদি হয়? কে আমাদের বাঁচাবে? ও কক্খনো আমাদের মা হতে পারে না। আমি মায়ের গলা খুব চিনি। মা কি এত জোরে জোরে বিচ্ছিরিভাবে কথা বলে? মায়ের গলা কি অমন মোটা? আমাদের মা কত সুন্দর করে আদর করে আমাদের ডাকে। এর মধ্যেই ভুলে গেলে? দরজা খুলবে না কিন্তু।'

এই কথা না শুনে নেকড়ে ছুটল পাহাড়ের কোলে। খুব করে সে দাঁত আর জিব ঘষল পাথরে। নেকড়ে ভাবল, পাথরে ঘষলে গলার স্বর নরম হবে, ওরাও তখন মা বলে ভুল করবে।

আবার নেকড়ে ছুটে এল ছোবের কাছে। খুব নরম গলায় বলল,

'যে কথা বলেছি আগে, সোনা বাছারা আমার,

মায়ের গলা শুনবে আগে, খুলবে তবেই দুয়ার।
খিদের তরে……'

বড় ছেলে ছটফট করে বলে উঠল, 'দেখলে তো! এবার? কি আমি ঠিক কথা বলিনি? ঐ তো মা ডাকছে। ও যদি মা না হয় তবে আর কে ডাকবে? আমার বুঝি কান নেই? আমি দরজা খুলে দিচ্ছ।'

'দাদা, দাদা, আমার কথা শোনো। অমন করে দরজা খুলে দিও না। কেউ যদি এসে বলে, দরজা খুলে দাও, আমি তোমাদের খুড়িমা এসেছি; তুমি কি তখন দরজা খুলে দেবে? তুমি কি জানো না, সেই কবে আমাদের খুড়িমা মরে গিয়েছে? সে এখন জন্মেছে হয় কোনো বাটি হয়ে কিংবা কোনো থালা হয়ে,' আঁৎকে উঠে ছোট ছেলে বলল।

বড় ছেলে ভীষণ রেগে বলল, 'মিছিমিছি ভয় পেয়ে মাকে তোমরা দাঁড় করিয়ে রেখেছ। কতক্ষণ মা আমাদের দাঁড়িয়ে আছে। আর খিদের জ্বালায় আমরা মরছি। তোমরা যাই বল, আমি এই দরজা খুলে দিচ্ছি।'

এই কথা না শুনে ছোট ছেলে উনুন বেয়ে ওপরে উঠে গেল। ছাদের সঙ্গে কালিঝুলি মেখে চুপটি করে বসে রইল। জলের মধ্যে শান্ত মাছ যেভাবে থাকে, ঠিক সেভাবে। সে বাতাসে গাছের মত কাঁপতে লাগল। মেজ ছেলেও খুব ভয় পেয়েছে। একটা বিরাট বাটির নিচে ঢুকে পড়ল সে। মাটির মত চুপ করে পড়ে রইল, ভয়ে হাড় পর্যন্ত কাঁপতে লাগল তার।

বড় ছেলে গুটিগুটি দরজার কাছে গেল। ভাবল, খুলবে কি খুলবে না। শেষকালে, দরজার কাঠ খুলে দিল। আর ঠিক তখন? কি দেখতে পেল বড় ছেলে? সে দেখল, দুটো চোখ কয়লার মত জ্বলছে, মস্ত একটা লম্বা জিবে জল গড়াচ্ছে। কিছু বুঝবার আগেই তার গলায় কি যেন বিঁধে গেল। নেকড়ে এক কামড়ে বাচ্চার গলা ছিঁড়ে ফেলল, দেহের ছাল ফেলল ছাড়িয়ে। নিমেষের মধ্যে গোটাটা খেয়ে ফেলল। কি দারুণ ক্ষুধার্ত সে!

রক্তমাখা জিব চাটতে লাগল নেকড়ে। কিন্তু খিদে তো তার যায়নি। ঢুকে পড়ল সে ঘরের মধ্যে। আনাচে কানাচে খুঁজতে লাগল। কিন্তু আর কাউকে দেখতে পেল না। ঘরে কেউ নেই? ভাবতে লাগল নেকড়ে, 'আমার কি ভুল হল? কিন্তু আমি তো কয়েকজনের গলা শুনতে পেয়েছি। ভুল হল? নাঃ, তা কি করে হবে? তবে কোন্ চুলোয় গেল তারা? ঘরের মেঝে কি ফাঁক হয়ে গেল? ওরা কি সেই ফাঁকের মধ্যে উধাও হয়ে গেল? কোথায় গেল তারা? কোথায় তারা লুকোতে পারে?'

এধারে-ওধারে পায়চারি করতে লাগল নেকড়ে। লোভে সে আরও অস্থির হয়ে উঠল। কিন্তু কাউকে পেল না। ভাবল, 'বাড়িতে গিয়েই বা কি করব? কোনো কাজ তো আর নেই? অনেক ধকল গিয়েছে, একটু জিরিয়ে নি।' এই না ভেবে লোভী নেকড়ে বসে পড়ল বিরাট এক বাটির ওপরে।

যেই না বসা, অমনি চেপ্টে গিয়ে কঁকিয়ে উঠল মেজ ছেলে, 'আমাকে খেয়ো না, দয়া করে আমাকে মেরো না। বাঁচাও, বাঁচাও আমাকে।'

'তাই বল! তুমি এখানে। আমার তো ভুল হবার কথা নয়! এসো এসো, তোমায় একটা চুমু দি।' নেকড়ে কথা বলতে বলতেই বাটিটা উল্‌টে দিল। থর্‌থর্ করে পাতার মত কাঁপছে ছোট্ট বাচ্চা। কান ধরে টেনে দাঁত বসিয়ে দিল গলায়, গোটা ছাল ফেলল ছাড়িয়ে, নিমেষে যেন গিলে ফেলল নরম তুল্‌তুলে দেহটা। পড়ে রইল মুণ্ডুটা। কথায় বলে, আমরা নিজেরাই আমাদের নিজের নিজের দুঃখের জন্য দায়ী।

আবার খুঁজতে শুরু করল নেকড়ে। তার লোভ গিয়েছে বেড়ে। কিন্তু অনেক খুঁজেও কাউকে দেখতে পেল না। হঠাৎ তার মাথায় এক দুষ্টু বুদ্ধি চাপল। নেকড়ে জানলা খুলে দিয়ে ছাল-ছাড়ানো দুটো মাথা জানলায় বসিয়ে দিল। মনে হল, দাঁত বের করে বাচ্চার মাথাদুটো হাসছে। তারপর, এক জায়গায় জমে থাকা অনেক রক্ত ঘরের সমস্ত মেঝে ও দেয়ালে লাগিয়ে দিল। ভাবল, ওদের মা এসব দেখে আরও বেশি কাঁদবে। শেষকালে লেজ বেঁকিয়ে বনের পথে মিলিয়ে গেল নেকড়ে।

নেকড়ে বেরিয়ে যেতেই ছোট ছেলে নেমে এল উনুনের ওপর থেকে। গায়ে তার কালিঝুলি মাখা। সে তাড়াতাড়ি দরজা দিল এঁটে। গভীর কান্নায় ভেঙে পড়ল। সে সব দেখেছে ওপর থেকে। মেঝেতে পড়ে পড়ে কাঁদতে লাগল। তার ভাইদের এ কি হয়ে গেল! 'দাদা যদি অমন করে ভুল বুঝে দরজা খুলে না দিত, নেকড়ে তো তবে ঢুকতে পারত না। দাদার যে বড় খিদে পেয়েছিল। মা এখনও জানে না আমাদের কি হয়ে গিয়েছে'—বারবার সে এসব কথা বলছে আর কাঁদছে।

ভেতরে যখন ছোট ছেলে এমন করে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, মা তখন বাড়ির কাছে এসে পড়েছে। অনেকক্ষণ ধরে সে খাবার খুঁজেছে, অনেকটা পথ খাবার বয়ে এনেছে। তাই মা হাঁফাচ্ছে, জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে। বাড়ির আরও কাছে আসতে মা দেখল, জানলায় দুটো হাসিহাসি মুখ। জোরে জোরে সে বলে উঠল, 'আহারে! আমার বাছারা কতক্ষণ থেকে আমার পথ চেয়ে বসে আছে। ওদের যে

'খুব খিদে পেয়েছে। তাই, আমায় দেখতে পেয়ে কেমন জানলায় মুখ বাড়িয়ে হাসছে। আহা! আমার বাছারা! কতক্ষণ দেখেনি আমায়।'

বাড়ির খুব কাছে এসে মা কি দেখতে পেল? তার হাড়গুলোর মধ্যে দিয়ে এক ঠাণ্ডা প্রবাহ বয়ে গেল, পাগুলো ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে লাগল, তার সারা দেহ থরথর করে উঠল চোখের আলো ঝিমিয়ে এল। মা চীৎকার করে আছড়ে পড়ল দরজায়।

মায়ের গলা শুনে ছোট্ট ছেলে লাফিয়ে এল দরজায়, দরজা দিল খুলে। এখন তো সে আর শুধু ছোট ছেলে নয়, বড় ছেলে এবং মেজ ছেলেও। ঝাঁপিয়ে পড়ল মায়ের বুকে, হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। কাঁদতে কাঁদতে মায়ের গলা জড়িয়ে বলল 'মা মা, দেখ আমাদের কি হয়ে গেছে। আমাদের সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে।'

মা পাথর হয়ে গেছে। কিছুক্ষন অবাক হয়ে চেয়ে থেকে বলল, 'বাছা, কি হয়েছে?'

ছোট ছেলে অঝোরে কাঁদছে। চোখ মুছতে মুছতে সে সব কথা মাকে বলল। তার বুক ফেটে যাচ্ছে, তবু বলতে তো হবেই।

মা আছড়ে পড়ল মেঝেতে। বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়ল। বলল, 'আচ্ছা এমন কাজও করতে আছে! সে জানে আমি বিধবা, আমাকে বাইরে যেতে হবেই, ঘরে থাকে আমার ছোট ছোট ছেলেরা। আমি অনাথা, তাই এমন সুযোগ সে নিতে পারল। এই সুযোগ সে নিতে পারল? ঠিক আছে, আমিও নেকড়েকে শিক্ষা দেব। প্রতিশোধ আমিও নেব। সে যেমন কাজ করেছে আমি তাকে তার উপযুক্ত শাস্তি দেব। শয়তান নেকড়ে! তুমি ভেবো না আমি বিধবা বলে যা খুশি তাই করে যাবে। তুমি আমাকে যতটা নিরীহ ভাবলে, আমি কিন্তু তা নই। বহু বিপদে আমি পড়েছি, বিপদকে এড়িয়ে যাইনি কোনোদিন, জীবনে বহুবার বিপদের মুখোমুখী দাঁড়িয়েছি। বুড়ো শয়তান নেকড়ে, তোমাকেও আমি দেখাব কি করতে পারি। তুমিই এই শাস্তি ডেকে এনেছো, আর শাস্তি তুমি পাবেও।' পুত্রশোকে কাঁপতে কাঁপতে মা প্রতিশোধের কথা বারবার বলতে লাগল। কাঁদছে আর নেকড়েকে শাপ দিচ্ছে।

ছোট ছেলে ভয় পেয়ে বলল, 'মা, অমন কথা বলবে না। তার চেয়ে ঐ শয়তানকে না চটানোই ভালো। কি যে আবার করে বসবে।'

ছেলেকে কাছে ডেকে মা বলল, 'বাছা, ওভাবে কথা বলতে নেই। বাঁচতে হলে তোমাকে তো লড়াই করতেই হবে, কেউ অন্যায় করলে প্রতিশোধও নিতে হবে। বাছা, একটা কথা মনে রাখবে, তুমি যদি নিজে রুখে না দাঁড়াতে পারো তবে কেউ তোমায় সাহায্য করবে না। আমি এমন ব্যবস্থা করব যাতে নেকড়ে আর কোনোদিন

আমাদের বাড়ির আনাচে-কানাচে ঘুরঘুর করতে না পারে।'

মা সুযোগের অপেক্ষায় রইল। কাজের ফাঁকে ফাঁকে সে ভাবে। রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে সে ভাবে। সবসময় তার এক চিন্তা। নেকড়েকে মজা দেখাতে হবেই।

অনেক ভেবে সে বুদ্ধি বের করেছে। তার বাড়ির খুব কাছেই রয়েছে একটা গভীর গর্ত—এটাই তার একমাত্র আশা-ভরসা।

একদিন ভোরবেলা উঠেই মা খুব কাজে লেগে গেল। ডিম দুধ ময়দা দিয়ে সে ভালো ভালো মুখরোচক সব খাবার বানাল। সব খাবার থালাবাটিতে সাজিয়ে রাখল সুন্দর করে। তারপরে উনুনের সমস্ত জ্বলন্ত কয়লা এনে ঢেলে দিল সেই গর্তে। গাছের পাতা ও শুকনো ডাল এনে ফেলল তাতে, যাতে ধিকিধিকি আগুন জ্বলতে থাকে। তারপরে লতা গুল্ম আর উইলো গাছের ছোট ছোট ডাল এনে গর্তের পাশে গেঁথে দিল। অল্প মাটি জলে গুলে তার ওপর ছড়িয়ে দিল। শেষকালে খড়ের তৈরি একটা মাদুর বিছিয়ে তৈরি করল সুন্দর একটা বসবার আসন। এর আগেই সে মোমের একটা চেয়ার বানিয়ে রেখেছিল, সেটাকে মাদুরের ওপর বসিয়ে রাখল।

সমস্ত কিছু করে মা রওনা দিল নেকড়ের গুহার পথে। ঘন বনের এক অন্ধকার ঝোপের পাশে দেখা হল নেকড়ের সঙ্গে।

'সুপ্রভাত নেকড়ে। আপনি গুহা ছেড়ে এতদূরে এসে কি করছেন?' মা মাথা নামিয়ে নমস্কার করে জিজ্ঞেস করল।

নেকড়ে সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'সুপ্রভাত। কেমন চলছে তোমার দিন?'

মা আস্তে আস্তে বলল, 'আর আমার দিন! বিশেষ কাজেই আপনার কাছে আসতে হল। আমি আজও ভেবে পেলাম না, আমি যখন বাড়িতে ছিলাম না তখন কে যেন আমার বাড়িতে ঢুকে আমার সব শেষ করে দিয়ে গিয়েছে। সে খুব চালাকি করে গিয়েছে।'

'কি চালাকি বলতো?' নেকড়ে অবাক হল।

মা বলল, 'আমার ছেলেদের একা পেয়ে তাদের ভুল বুঝিয়ে সে আমার ঘরে ঢুকে পড়ে। তারপর তাদের টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে খায়। কত কেঁদেছি আমি। আমার মতো অনাথা বিধবা আর কে আছে?'

'ওভাবে কথা বলতে নেই বোন।' নেকড়ে সহানুভূতির স্বরে বলে উঠল।

মা বলল, 'আমি বলি আর না বলি, আমার কাছে একই ব্যাপার। আমার ছেলেরা আজ আর নেই। কিন্তু তাদের আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা তো আমাদের করতেই হবে। তাই আমি শ্রাদ্ধের সামান্য ব্যবস্থা করেছি। আপনাকেও নেমতন্ন

করতে এসেছি। এইভাবেই হয়তো আমি একটু শান্তি পাবো, কিছুটা সান্ত্বনা পাবো।'

নেকড়ে নড়েচড়ে বসল। বলল, 'নিশ্চয়ই বোন, আমি নিশ্চয়ই যাবো। তবে, তাদের বিয়েতে যদি আমি নাচতে পারতাম তবেই আমি খুশি হতাম বেশি।'

মা বলল, 'আপনাকে আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু ঈশ্বরের কাছে আমাদের তো নত হতেই হবে, তাঁর ইচ্ছেকে মেনে নিতেই হবে।'

এই বলে মা বাড়ির পথে রওনা দিল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে কাঁদছে, পেছনে চলেছে নেকড়ে। নেকড়ে এমন ভান করতে লাগল যেন তার চোখও জলে ভরে গিয়েছে। মনমরা গলায় সে বলে উঠল, 'বোন, অত দুঃখ পেয়ো না। একদিন তো আমাদের সবাইকেই ওখানে যেতে হবে।'

মা বলল, 'সেকথা ঠিকই। কিন্তু বাছারা আমার বড কচি ছিল।'

'বোন, ঈশ্বর শিশুদেরই বেশি পছন্দ করেন।'

'ঈশ্বর যদি নিয়ে থাকেন তো ভালো। কিন্তু ঐভাবে নৃশংস হত্যা! আমি যে সহ্য করতে পারি না।'

এইভাবে কথা বলতে বলতে তারা বাড়ির কাছে পৌঁছে গেল। সামনেব দু'পা তুলে মাথা নত কবে মা বলল, 'আসুন, এখানে বসুন। ঈশ্বর যতটুকু আমাকে দিযেছেন সেটুকু ভাগ করে নিযে আমাকে শান্তি দিন।' মা দেখিয়ে দিল মাদুরের ওপবে রাখা মোমের চেয়ার।

ঘর থেকে মা নিয়ে এল এক থালা মিষ্টিখাবার। নেকড়ের হাতে দিল সেটা। থালা হাতে নিয়েই সে খাবার গিলতে লাগল। মুখভর্তি খাবার নিয়ে নেকডে বলল, 'ঈশ্বর, ওদেব আত্মাব শান্তি হোক, ওরা সুখে থাকুক। কেননা, বোন, তুমি বড় ভালো ভালো খাবাব বানিয়েছ।'

মায়ের আতিথেযতায লোভী নেকড়ে মুগ্ধ। খাচ্ছে আর খাচ্ছে আর হঠাৎ গড়িয়ে পডেছে নেকড়ে। গর্তের মধ্যে ঢুকে পডছে নেকড়ে। নিচের আগুনের তাপে মোমের চেযার গেল গলে। উইলোর ডালগুলো ছিল সরু, নেকড়ের চাপে সেগুলো গেল মটমট করে ভেঙে। সেগুলো তো খুব শক্তভাবে মাটিতে গেঁথে রাখা হয়নি! গর্তে ঢুকে পডছে নেকড়ে।

মা লাফিয়ে উঠল। বলল, 'নেকড়ে, আরও ভালো করে পিঠে খাবে না তুমি? আমার সঙ্গে খুব চালাকি করেছো, এবার আমার পালা।'

কাতর হয়ে নেকড়ে বলল, 'উঃ উঃ! দয়া করে টেনে তোল আমায়। পা ধরেই টেনে তোল। আমার বুক পুড়ে গেল, বড্ড পুড়ে যাচ্ছে।'

মা বলল, 'না না নেকড়ে, তোমাকে ভুলব কেমন করে? আজ তোমার বুক পুড়ছে, আমার ছেলেদের মৃত্যুতে সেদিন এমনি করেই আমার হৃদয় পুড়ে খাক্ হয়ে গিয়েছিল। ঈশ্বর কচি শিশুদের বড্ড পছন্দ করেন, আমি কিন্তু বুড়োদেরই বেশি পছন্দ করি। তারা যখন খুব ভালোভাবে পুড়ে সেদ্ধ হয় তখন আরও ভালো লাগে। ঐ গর্তে পড়ে থাকো নেকড়ে, বেশ ভালোভাবে পুড়ে তৈরি হও, তবেই না?'

নেকড়ে চিৎকার করে বলল, 'হায়! আমি পুড়ে মরছি, ঝলসে যাচ্ছি, আমি মরে গেলাম। বাঁচাও, বাঁচাও।'

মা বলল, 'ওখানেই পুড়ে মর। কি হবে তোমার বেঁচে থেকে? কোনো ভালো কাজেই তো তুমি লাগবে না। তোমার মরণই ভালো। ভুলে গেলে নেকড়ে, তুমি আমার কি করেছ? একদিন তুমি আমার ভাইয়ের মত ছিলে, বন্ধুর মতন ছিলে। সেদিন তোমার মাথার দিব্যি দিয়ে বলেছিলে, তুমি আমার ছেলেদের রক্ষা করবে। ভুলে গেলে সেকথা? সেই তুমি আমার দুর্দিনে আমার ছেলেদের ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়েছ। আমি কি করে সেকথা ভুলব নেকড়ে?'

জিব বেরিয়ে পড়েছে নেকড়ের। কাতরভাবে সে বলল, 'এখন আমার ভেতরটাও পুড়ে যাচ্ছে। দয়া করো আমায়। আমি আর কিছু করব না। এমন করে আমায় শাস্তি দিয়ো না।'

'যেমন কর্ম তেমন ফল। আমার হৃদয় পুড়েছে, এখন তোমারও পুড়ুক,' এই না বলে মা ও ছেলে মিলে এক আঁটি খড় এনে ফেলে দিল গর্তের মধ্যে। নেকড়ে ঢাকা পড়ল খড়ে। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল সেই শুকনো খড়। বড় বড় পাথর নিয়ে এল তারা, নেকড়ের মাথায় প্রচণ্ড জোরে ফেলতে লাগল। আগুনে ঝলসে ঝলসে, পাথরের আঘাতে আঘাতে নেকড়ে একটু পরেই স্থির হয়ে গেল। গাছের গুঁড়ির মত, নদী তীরের পাথরের মত স্থির হয়ে রইল নেকড়ে। এমনি করেই মা তার বাছাদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিল।

আশেপাশের সব ছাগল ধোঁয়া দেখে এবং চিৎকার শুনে ছুটে এল। এসে শুনল, নেকড়ে পুড়ে মরে গিয়েছে। তাদের খুশি তখন দেখে কে! মাকে জড়িয়ে ধরে তারা অনেক বাহবা দিল। তারপরে একসঙ্গে মিলে খাওয়াদাওয়া করল, আনন্দ করল, আর গোল হয়ে দুলেদুলে নাচল। এমন আনন্দ কে কবে দেখেছে?

অন্যায় ও অবিচার যত বেশি সহ্য করা যায় ততই তা মাত্রা ছাড়ায়। প্রতিবাদ এবং সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তুললেই অন্যায়কারী পিছু হটতে বাধ্য হয়। সমাজে একশ্রেণীর মানুষ সুবিধাভোগের জন্য অন্যের প্রতি অবিচার করে, স্বার্থপরতা তাকে হীন ও কদর্য করে তোলে। তার এই কুৎসিত প্রবণতাকে আঘাত না করলে তার লোভ বেড়েই যাবে। আর তাছাড়া, সত্যিকারের মানুষ হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে হবে, প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে, প্রতিশোধ নিতে হবে। একজন সর্বনাশ করবে এবং তার কোনো শাস্তি হবে না, এটা সুস্থ সমাজে চলতে পারে না। পুত্রহারা মায়ের প্রতিশোধের মধ্য দিয়ে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা এই পশুকথায় প্রকাশ করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সন্তানের প্রতি মায়ের মমতা আর অসীম আকুতি ফুটে উঠেছে। মা ও সন্তানের মধুর সম্পর্কটি অসাধারণ নৈপুণ্যে জীবন্ত হয়ে উঠেছে এখানে।

মায়ের আকুতি কিভাবে প্রকাশ পেয়েছে? বিধবা মা সন্তানদের বাড়িতে রেখে যেতে বাধ্য হন। স্বামী নেই, তাকেই খাবার সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে হয়। কি নিদারুণ মানসিক উৎকণ্ঠা তার! ছেলেরা একা থাকবে বারবার তাই সাবধান করে দিতে হয়। আশেপাশে বিপদের তো শেষ নেই। রাত থেকে ছেলেরা কিছুই খায় নি, তাই বিপদ থাকলেও যে তাকে বাইরে যেতে হবে। দরিদ্র পরিবারের বাস্তব চিত্র এটা। যারা দিন আনে দিন খায়, তাদের এ ছাড়া অন্য গতি নেই।

বড় ছেলে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিতে গিয়েছে। খিদের জ্বালায় মায়ের পথ চেয়ে এমনি করেই বসে থাকে দরিদ্র ঘরের ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। খিদে যে আর সহ্য হয় না, মা কখন ফিরবে! গ্রামের দরিদ্র পরিবারে প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা তো এটাই।

মা বাইরে যাচ্ছে, সেখানেও তো বিপদ আর অনিশ্চয়তা কম নয়! তাই ছেলেরাও মায়ের জন্য কাতর হয়ে থাকে। মা ভাবে, ঈশ্বর তাদের রক্ষা করুন। বস্তুতঃ মার এছাড়া আর কোন ভরসা আছে?

মা ফিরে আসার সময় ছেলেদের হাসিহাসি মুখ দেখে কত খুশি হন। আবার কষ্টও পান, বাছারা কতক্ষণ খায়নি।

পুত্রশোকাতুরা মায়ের হৃদয়ের গভীর বেদনা ফুটে উঠেছে তার কান্না ও স্তব্ধতার

মধ্যে দিয়ে। কিন্তু এখানেই বিশেষত্ব পশুকথাটির। মা প্রতিশোধ নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কেননা, অভিজ্ঞতায় তিনি জেনেছেন, নিজের বিপদে নিজেই যদি অত্যাচারীর বিরুদ্ধে রুখে না দাঁড়ায় তবে কেউ সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে না। ছোট ছেলে ভয় পেয়েছে, এটাই তো স্বাভাবিক। মা তাকে সাহস জুগিয়েছে।

অত্যাচারী যে কত নৃশংস ও হৃদয়হীন হতে পারে আমরা তাও দেখলাম। শিশুকে হত্যা করেই সে ক্ষান্ত হয় না, এক অদ্ভুত মানসিক বিকৃতিও তাকে কদর্য স্বভাবের করে তোলে। কষ্ট দেওয়ার মধ্যেই তার আনন্দ। তাই নেকড়ে বাচ্চাগুটির মাথা জানালায় রেখে দিয়েছে। এ হল শোষক-অত্যাচারীর ধর্ষকামী (Sadist) মনোভাবের প্রকাশ। গ্রামীণ কৃষক তার চারিপাশে এইসব বীভৎস মানসিক বিকৃতির বহু পরিচয় পেয়েছে। এইসব শত্রুর মনোবল কম, তাই তারা দুর্বল মুহূর্তের সন্ধানে থাকে। মা বেরিয়ে যেতেই শত্রু তার ঘরে ঢুকেছে। আবার, সমাজের অত্যাচারী নিজের সুবিধার জন্যই বন্ধুত্ব বা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পাতায়। এর পেছনে কিন্তু হৃদয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক নেই বলেই প্রয়োজনে এইসব ঠুনকো মূল্যবোধকে ভেঙে সে অত্যাচার চালাতে দ্বিধা করে না। নেকড়ে মা-ছাগলের সঙ্গে বোন বা বন্ধু সম্পর্ক পাতালেও, তা ভাঙতে তার কোনো দ্বিধা জাগেনি। সাধারণ মানুষ এভাবেও ঠকে। বিশ্বাস করে মানুষ ভুল করে। কেননা, বিশ্বাসের পাত্রটি যে অন্য স্বভাবেরও হতে পারে—এ ধারণা মানুষের থাকে না। তাই বিশেষ করে অন্য শ্রেণীর ওপরে বিশ্বাস রাখতে নেই। নেকড়ে বিশ্বাসভঙ্গ করে যে কাজ করেছে তাতে মা যদি প্রতিশোধ না নিত তবেই হোত অপরাধ। সবার সহানুভূতি মায়ের দিকেই যাবে। অনাথার শক্তি কম, তাই বুদ্ধির খেলায় শত্রুকে পরাজিত করতে হয়েছে।

নেকড়ের গর্তে ঢোকার পরে মায়ের উল্লাসের মধ্যে পুত্রশোকাতুরা বিধবার প্রতিশোধের ছবি ফুটে উঠেছে। একদিকে ক্রোধ ও অন্যদিকে ঘৃণা এক অপরূপ ভঙ্গিমায় প্রকাশিত হয়েছে।

এতক্ষণ পর্যন্ত গল্পটিতে ব্যক্তিগত প্রতিশোধের কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে এটা আর শুধু ব্যক্তির আক্রোশে সীমাবদ্ধ থাকে নি। সমস্ত ছাগল এসে মাকে অভিনন্দন জানিয়েছে, মনের আনন্দে খেয়েছে, নেচেছে। তাদের তো কেউ মারা যায়নি, তবে এ কিসের অভিব্যক্তি? এখানেই গল্পটি বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। শ্রেণীশত্রুর মৃত্যুতেই তাদের এত আনন্দ। নেকড়ে সমস্ত ছাগল অর্থাৎ উৎপীড়িত শ্রেণীর শত্রু, তার মৃত্যুতে এই শ্রেণী কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। ব্যক্তিগত ঘৃণা এখানে সমষ্টিগত ঘৃণায়

পরিণত হয়েছে। শোষিতের অত্যাচার শুধুমাত্র ব্যক্তির জীবনকেই হাহাকারে ভরে দেয় না, নিপীড়িত সমাজের প্রত্যেকেই সমষ্টিগতভাবে এইসব অত্যাচারের শিকার হয়। তাই শ্রেণীশত্রুর বিনাশে, পুত্রহত্যাকারী নেকড়ের মৃত্যুতে মা-ছাগলই নিশ্চিন্ত হয়নি, সমাজের প্রত্যেকটি নিগৃহীত সদস্য আনন্দে আত্মহারা হয়েছে।

পশুকথা ঃ

আমেরিকা মহাদেশ

মেক্সিকো

দেশ পরিচয়

দেশের অফুরন্ত খনিজ সম্পদ, মূল্যবান বনজ সম্পদ কিভাবে একটি দেশের আভ্যন্তরিক শান্তি নষ্ট করতে পারে এবং দেশের সাধারণ মানুষকে শোষণ-নিপীড়নে জর্জরিত করে তুলতে পারে, উত্তর আমেরিকার মেক্সিকো দেশটি তার করুণ উদাহরণ। উপনিবেশবাদী দেশগুলো মেক্সিকোকে নিজেদের উপনিবেশ হিসেবে বা তাঁবেদারে রাখবার জন্য চারশো বছর ধরে এই দেশের ওপরে অকথ্য অবর্ণনীয় অত্যাচার করে চলেছে। ১৮২১ সালে স্পেনের থাবা থেকে দেশ উদ্ধার পেলেও, তারপর থেকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের লোভী দৃষ্টি দেশকে হতদরিদ্র করে তুলেছে।

মেক্সিকোর উত্তরে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণে প্রশান্ত মহাসাগর, পশ্চিমে ক্যালিফোর্নিয়া উপসাগর, নিম্ন ক্যালিফোর্নিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগর এবং পূর্বে রয়েছে মেক্সিকো উপসাগর, হোণ্ডুরাস ও গুয়াতেমালা। মেক্সিকোর অবস্থান মধ্য আমেরিকায়।

দেশের সম্পদ যেমন অফুরন্ত তেমনি উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান। সমুদ্রের তীরভূমিতে ঘন বিশাল অরণ্যে রয়েছে মেহগিনি আবলুস চন্দন আর গোলাপ কাঠ। খনিতে রয়েছে সোনা রূপো তামা সীসে লোহা ও পেট্রোলিয়াম। স্বাভাবিকভাবেই তাই ক্ষমতালোভী উপনিবেশবাদীরা এই দেশের কর্তৃত্বভার নেওয়ার জন্য সব রকমের অপচেষ্টা চালিয়েছে। দেশের মানুষকে অর্ধাহারে-অনাহারে রেখে সম্পদ লুটে নিয়ে গিয়েছে নিজের দেশে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও ঘটেছে অনেক উত্থান-পতন। ১৮২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র গড়ে ওঠে। কিন্তু আমেরিকার কূটকৌশলে বারবার অভ্যুত্থান ঘটেছে। একটি উদারপন্থী আন্দোলনের সূচনা হয় ১৮৮৫ সালে, শুরু হয় গৃহযুদ্ধ। এই সময় ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যথেষ্ট অশান্তির সৃষ্টি করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকা নগ্নভাবে শোষণ ও কর্তৃত্ব চালায়। ১৯১৭ সালে নতুন সংবিধান রচিত হয়, দ্রুত সামাজিক সংস্কারের চেষ্টা চলে। কিন্তু দেশ আমেরিকার উপনিবেশবাদী প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে না। ১৯৩৮ সালে আমেরিকা হল্যাণ্ড এবং ইংল্যাণ্ডের তেল কোম্পানীগুলিকে

জাতীয়করণ করবার পর থেকে বিরোধ চরমে ওঠে। আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্কে চিড ধরে। আজও বাইরের দেশের উস্কানি ও শোষণ এবং দেশের অন্তর্বিরোধ মেক্সিকোর মানুষকে সীমাহীন দারিদ্র্যের মধ্যে রেখে দিয়েছে।

বনভূমি সমুদ্রের-তীর নদী পাহাড দেশের প্রকৃতিতে এক বৈচিত্র্য এনেছে। এই প্রাকৃতিক পরিবেশে সেখানকার মানুষ একদিকে যেমন প্রাচীন এক উন্নত সভ্যতার জন্ম দিয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি সেই ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে অপূর্ব লোকসংস্কৃতিব সৃষ্টি করেছে এই দেশেরই লোকসমাজ। আজটেক ও মাযা সভ্যতা এই দেশেই গডে উঠেছিল। ধ্বংসপ্রাপ্ত সেই সভ্যতাব সামান্য নিদর্শন আজও আমাদের বিস্ময। সাত হাজার ফুট উঁচু মালভূমিতে এই সভ্যতার নিদর্শন দেশের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির গৌবব। বর্তমানে দেশের অধিকাংশ মানুষই কৃষি বনভূমি এবং খনিতে কাজ করে। চবম দাবিদ্র্যেব মধ্যে তাদেব দিন কাটে এই সমৃদ্ধময দেশে। তাসত্ত্বেও তাবা অন্তবের অনুভূতি দিযে গডে তুলেছে লোকসাহিত্যের এক বিশাল ভাণ্ডার। বৈচিত্র্য ও স্বতন্ত্বে অসাধাবণ তাদেব পশুকথাগুলি এই বিস্তৃত লোকসাহিত্যেবই এক উজ্জ্বল দিক।

মেক্সিকো প্রজাতন্ত্রের আযতন ৭৬১, ৮৩০ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ৩৩,৩০৪,২৫৩।

পশুকথা

ছোট্ট রবিন পাখি

সবুজ ঘন বনের সুন্দর ছোট্ট পাখি রবিন। অপূর্ব তার গড়ন, চঞ্চল তার চলাফেরা। এক ডাল থেকে আরেক ডালে সে উডে বেড়ায, মনের আনন্দে ছোট্ট দুটো ডানা নাড়ে, ঠোঁট দিয়ে পালক আঁচডায়, অবোধ কাকলিতে বনভূমি মাতিয়ে তোলে। ছোট্ট পাখি বিশাল বনে সবুজের গভীরে অবাক হযে চেয়ে থাকে, ভয় পায়, চমকে ওঠে। তবু বন থেকে বনান্তরে সে উডে বেড়ায, কেউ বাধা দিতে পারে না।

কিন্তু সব দিন সমান যায় না। আঁধার করে যখন বর্ষা নামে কিংবা হাড়-কাঁপানো শীত আসে—তখন বডই কষ্ট ছোট্ট রবিনের। ঘন পালকের মধ্যে ঠোঁট গুঁজেও শীত মানে না, পাতার আড়ালে দেহ ঢাকলেও বৃষ্টি রোখা যায় না। তাই বর্ষার দিনগুলোতে গাছের গুঁড়ির ফোকরে তার দিন কাটে, রাত কাটে—খাবার জোটানো ভার। আর

শীতের দিনে অনবরত উড়ে উড়ে দেহ গরম রাখতে হয়, রাতে বড়ই কষ্ট।

এমনি এক শীতের দিনে ঝলমলে রোদের সকালে রবিন উড়তে উড়তে বনের শেষপ্রান্তে চলে গেল। হাঁপিযে গিয়েছে সে, তাই এক গাছেব নিচে ঝরাপাতার স্তূপের ওপব বসে বিশ্রাম নিতে লাগল। দূরে পাহাড-উপত্যকায় ঘন ঝোপে ঝোপে কেমন কুয়াশা কুয়াশা ভাব। ছোট্ট রবিন অবাক হয়ে দেখে আর ভাবে।

এমন সময় রবিনের বুকের নিচে রোদ-পোয়ানো গরম ছোঁয়াচ লাগল। খুব আরাম! ছোট্ট রবিন বেঁটে পাতার জঞ্জাল সরিয়ে দেখল এক টুকরো আগুন। বিস্ময়ে আনন্দে আবিষ্কারেব্ চমকে রবিন কেমন দিশেহারা হযে পডল। যে জিনিস সে পেয়েছে তা যে সব রাজার ধনদৌলতের চেয়েও বেশি দামী। এ যে সত্য, এ যে অমূল্য।

ঠোঁটের ফাঁকে আগুনের টুকবোকে নিয়ে সে উডে চলল। চলছে, চলছে—গাছের মাথাব ওপব দিয়ে সে উডে চলছে। ছোট্ট ডানাদুটো তার টন্‌টন্ করছে, কিন্তু কোথাও সে বিশ্রাম নিতে চায় না। সোজা চলে যেতে চায় তার নিজেব ডেরায। কিন্তু ছোট্ট পাখির ছোট্ট দুটো ডানা, অত ধকল কি সইতে পারে! তার ওপরে দিনের শেষের রাঙা সূর্যও পাহাড়ের কোলে ঢলে পড়ছে। আব পাবে না রবিন। এক গাছের ডালে ক্লান্ত দেহে সে বসে পড়ল। কিন্তু অন্ধকারে তার ঠোঁটেব আলো যে জলছে? কেউ যদি দেখে ফেলে? কেউ যদি কেডে নেয তাব অনেক কষ্টে-পাওয়া আগুন? এদিকে সকাল থেকে উডে উড়ে তার যে এখন বড্ড ঘুম পেয়েছে। তাই আগুনকে বুকের তলায় লুকিয়ে রেখে ছোট্ট রবিন ঘুমিয়ে পড়ল।

সাত সকালে সূর্য আকাশে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই রবিন আবার উড়ে চলল। নিজের বনের মধ্যে এসে সে সেই আগুনকে শুকনো এক গাছের ফোকরে ঢুকিয়ে দিল, সব্বাই যাতে দেহ গরম করতে পারে। যে আরাম আর আনন্দ রবিন অনুভব করেছে, তা ছড়িয়ে পড়ুক সব জায়গায়। তাই শুকনো কাঠে কাঠ ঘষলে আজও আগুন জ্বলে।

ঠোঁটে বেখেছিল সেই আগুন, বুকের তলায় ছিল সেই আগুন তাই ছোট্ট রবিনের ঠোঁটদুটি হল রাঙা আর তুলতুলে বুক হল রক্তিম।

অভিপ্রায়

সমাজবদ্ধ মানুষ যুক্তিপূর্ণ চিন্তা ও শিক্ষার অভাবে সাধারণত নতুন ভাবনাকে গ্রহণ করতে চায় না। প্রথাগত চিন্তা-ভাবনা ও সংস্কারকে আঁকড়ে ধরে জীবন কাটাতেই তারা অভ্যস্ত। এক ধরনের সীমাবদ্ধ ঐতিহ্যপ্রিয়তা সমাজে ক্রিয়াশীল বলেই তারা

প্রথা-রীতিনীতি-সংস্কারকেই ধ্রুব সত্য বলে মনে করে। বিশেষ করে সমাজের যারা ধারক অর্থাৎ সুবিধাভোগী-শ্রেণী ও প্রবীণরা এই প্রথাগত চিন্তাকে বজায় রাখতে সব সময়ই সচেষ্ট থাকে। সুবিধাভোগী শ্রেণী জানে, নতুন কোনো চিন্তা সমাজে প্রবেশ করলে তাদের আসন টলতে পারে, মানুষ প্রশ্ন করতে সচেষ্ট হয়। তাই নতুন ভাবনাকে পর্যুদস্ত করতে তারা হীনতম কৌশল অবলম্বন করতেও দ্বিধা করে না।

পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসে নতুন ভাবনার উন্মেষকালের বাধাগুলো সম্পর্কে আমরা অবহিত আছি। বহু কষ্ট, বহু সংগ্রাম, বহু প্রতিকূলতার মধ্যেই সমাজে নতুনকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। আলোচ্য পশুকথাটিতে মেক্সিকোর কৃষকেরা এই সত্যটিকে রূপকচ্ছলে ফুটিয়ে তুলেছে। রবিন পাতার ফাঁকে যে আগুন পেয়েছে তা দিয়েছে সকলকে। কিন্তু এই আগুন আনতে তাকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। ডানা তার টন্‌টন্ করছে, কিন্তু সে বিশ্রাম নিতে চায়নি। পাছে কেউ কেড়ে নেয় তার আগুন। সত্যকে প্রচার করতে গেলে বাধা তো আসবেই। সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে কষ্ট তো সহ্য করতেই হবে। নইলে সমাজ কিভাবে নতুন ভাবনায় সমৃদ্ধ হবে?

যারা সত্যসন্ধানী, তারা যখন কোনো অমূল্য সম্পদ পান, তা কখনও নিজের ভোগের জন্য সীমিত করে রাখেন না। ব্যক্তিস্বার্থ তার কাছে তুচ্ছ, একার উপলব্ধি সার্বজনীন করাতেই তার আনন্দ। এতেই তার সত্যোপলব্ধি। তাই রবিনের একার আগুন সবার হয়েছে। শোষকশ্রেণী সম্পদ ও চিন্তাকে নিজের জন্যই রেখে দেয়, সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষ সবার মধ্যে বিলিয়ে দিয়েই ধন্য হয়, পূর্ণতা পায়।

সত্য চিন্তাকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে অবর্ণনীয় সব অত্যাচার সহ্য করতে হয়। চার্বাক সক্রেতিস জোয়ান-অব-আর্ক গ্যালিলিও চার্লস ডারউইন মার্কস-এঙ্গেলস-এর মত অসংখ্য সত্যসন্ধানী মানুষকে সামাজিক ও রাজনৈতিক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে, মৃত্যুবরণও করতে হয়েছে অনেকক্ষেত্রে। গ্রীক পুরাণে রয়েছে, প্রমিথিউস মানুষের জন্য আগুন চুরি করে আনলে, দেবরাজ জিউস তাকে পাহাড়ের চূড়ায় শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রাখে। আজও সে প্রথারই পুনরাবৃত্তি ঘটছে।

রবিন আগুন এনেছে, তাই তাকেও দগ্ধ হতে হয়েছে। ঠোঁটে রেখেছিল সেই আগুন, তার বুকের তলায় ছিল সেই আগুন। তাই ছোট্ট রবিনের ঠোঁটদুটি হল রাঙা আর তুল্‌তুলে বুক হল রক্তিম। সমাজবিকাশের ধারায় এই কষ্ট-স্বীকারের দৃষ্টান্তের অভাব নেই।

মেক্সিকোর সাধারণ কৃষকসমাজ তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের গভীর উপলব্ধি থেকে পশুকথাটির জন্ম দিয়েছে বলেই এমন আন্তর্জাতিক মানসিকতার প্রকাশ ঘটাতে তারা সক্ষম হয়েছে। পশুকথাটিও তাই হয়ে উঠেছে একটি বিস্ময়কর সৃষ্টি।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

দেশ পরিচয়

রাজনৈতিকভাবে যুক্ত থাকলেও এই বিরাট দেশের বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। ভৌগোলিক ও সামাজিক বিভিন্নতা এক অংশ থেকে অন্য অংশকে পৃথক করে রেখেছে। আমেরিকায় যেমন বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষ রয়েছে, তেমনি মিশ্র জাতিও রয়েছে অনেক। আমেরিকার দেশীয় শ্বেতাঙ্গের সংখ্যা তেরো কোটি, বিদেশে জন্মেছে এমন শ্বেতাঙ্গ এক কোটি, নিগ্রো দুই কোটি, রেড ইণ্ডিয়ান চার লক্ষ, জাপানী দেড় লক্ষ। আমেরিকার আদি-অধিবাসীর সংখ্যা পাঁচ লক্ষের মত, তবে তাদের অনেকের সঙ্গেই শ্বেতাঙ্গ, নিগ্রো ও মেক্সিকোবাসীর বেশ পরিমাণ মিশ্রণ ঘটেছে। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতক থেকে আমেরিকায় প্রধানতঃ গ্রেট ব্রিটেন স্কটল্যাণ্ড আয়ার জার্মানি ইতালি পোল্যাণ্ড রাশিয়া অষ্ট্রিয়া হাঙ্গেরী প্রভৃতি দেশ থেকে মানুষ গিয়ে স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকে।

আলোচ্য পশুকথাটি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিমে আরিজোনা ও নিউ মেক্সিকোর পুয়েবলো ইণ্ডিয়ান আদিবাসীদের মধ্য থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

আরিজোনা ও নিউ মেক্সিকো পাশাপাশি রাজ্য। আরিজোনার উত্তরে উটাহ্, দক্ষিণে মেক্সিকো, পশ্চিমে ক্যালিফোর্ণিয়া ও নেভাদা এবং পূর্বে নিউ মেক্সিকো। নিউ মেক্সিকোর উত্তরে কলোরাডো, দক্ষিণে মেক্সিকো, পশ্চিমে আরিজোনা এবং পূর্বে ওকলাহোমা। আরিজোনার আয়তন ১১৩,৯০৯ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা ১, ৩০২, ১৬১। নিউ মেক্সিকোর আয়তন ১২১, ৬৬৬ বর্গ মাইল ও লোকসংখ্যা ৯৫১, ০২৩।

প্রভূত সম্পদের দেশ আমেরিকা। খনিজ বনজ প্রাকৃতিক-সম্পদ জমির-ফসল, পশুসম্পদ শিল্প বানিজ্য প্রভৃতি সমস্ত ক্ষেত্রেই পৃথিবীর অগ্রসর দু-একটি দেশের সঙ্গেই একমাত্র তার তুলনা চলে। কিন্তু অসম-বন্টন এবং দৃষ্টিভঙ্গির জন্য সেখানে একদিকে যেমন রয়েছে প্রাচুর্য, তেমনি অন্যদিকে রয়েছে আর্থিক দীনতা ও সামাজিক বৈষম্য।

আরিজোনা ও নিউ মেক্সিকোর পুয়েবলো ইণ্ডিয়ানরা অনেকাংশে বিচ্ছিন্ন হয়ে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবিচার সহ্য করে বসবাস করে। স্পেনীয়বাসী নাবিকেরাই এদের নাম দিয়েছে 'পুয়েবলো' অর্থাৎ মানুষ।

এই পুয়েবলোদেব পাঁচটি শাখা রয়েছে—তানো কুইরে হোপি জেমেজ ও জুনি। এই শাখার মধ্যে আবার অনেকগুলি উপশাখা রয়েছে। যেমন, সান-জুয়ান নামৃবে লাগুনা তাওস সান্তা-ক্লারা প্রভৃতি। পাঁচটি শাখা ভিন্ন ভিন্ন উপভাষায় কথা বলে।

এই আদিবাসী গোষ্ঠী শীতকাল ছাড়া অন্য কোনোকালে গল্প শোনায় না। যদি কেউ শোনায় কিংবদন্তী রয়েছে, তাদের জমির ফসল তুষারপাতে নষ্ট হয়ে যাবে কিংবা কোনো বিষধর সাপ তাদের কামড়াবে। প্রশ্ন আসে, এই বিশ্বাস তাদের সমাজমনে কেন দানা বাঁধল? এই নিষেধ ও বিশ্বাসের পেছনে কাজ করছে তাদের কষ্টকর জীবনের সংগ্রাম। তাদেব ফসলেব জমি শুকনো ও অনুর্বব। এই জমিতে ফসল ফলাতে বসন্ত গ্রীষ্ম ও শরৎকালে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে হয। পবিবাবের সবাইকেই ব্যস্ত থাকতে হয ক্ষুধার অন্ন ফলাবার কাজে। সে পরিশ্রম যে কি নিদারুণ কষ্টের তা ভাবা যায না। তবু করতেই হয। তাই এই সময়ে আরামে বসে গল্প করা চলে না। আর চলে না বলেই এই নিষেধ যা বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে শীতের দিনে বুড়ো-বুড়িদের চারপাশে ঘিরে বসে ছোটরা—রাতের পব রাত চলে গল্পবলা, গল্পশোনা।

গ্রীষ্ম ও শীতে তারা নৃত্য কবে। নৃত্যেব মধ্যে তারা খাদ্য পাওয়াব আকাঙ্ক্ষা জানায়, ফসলের জন্য বৃষ্টিব কামনা কবে। শরৎকালে যে নৃত্য তার মধ্যে থাকে ফসল কাটা ও শত্রুর হাত থেকে ফসল রক্ষাব কামনা। শীতেব আর একটি নৃত্য, সহজে যেন শিকার মেলে। এই সময় তারা জীবজন্তুর হাবভাবেব অনুকরণ করে। অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবন যেখানে অনিশ্চযতায় ভবা, যেখানে কষ্টকব সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকতে হয়, সেখানে লোকসমাজের সমস্ত সাংস্কৃতিক বিষযই খাদ্য-সংগ্রহের কামনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে।

কিন্তু প্রাকৃতিক এই প্রতিকূলতার মধ্যেও আদিবাসী জনগণ তাদের মহান ও সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রক্ষা কবে চলেছে। পুয়েবলো ইণ্ডিয়ানদের লোকসঙ্গীত এবং লোককথা বিশ্বেব সমৃদ্ধতম লোকসাহিত্যের অন্যতম। অনুর্বর ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির মধ্যে কষ্টকর জীবনযাপনের ফাঁকে তারা অন্তরের সব আবেগ-অনুভূতি দিয়ে রসসমৃদ্ধ বৈচিত্র্যময় মৌখিক সাহিত্য সৃষ্টি করে চলেছে।

পশুকথা

পাখি ও পশুদের মধ্যে যুদ্ধ

অনেক অনেককাল আগে সব পশু মিলে পাখিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। সে এক

ভয়ানক যুদ্ধ। দু'দলই নিজেদের মধ্যে গোপনে বৈঠক করতে লাগল। যুদ্ধে কে কেমনভাবে লড়বে তাই নিয়ে অনেক শলা-পরামর্শ চলল।

পাখিরা বুঝল, তাদের চেয়ে পশুদের শক্তি বেশি। তাদের দাঁত ও নখ বেশি ধারালো, দেহের শক্তিও বহুগুণ বেশি। তাই যুদ্ধের জন্য তারা অস্ত্রের লড়াই ছাড়াও অন্য অনেক কিছু চিন্তা করল।

পাখিরা ছোট্ট একটা কালো পিঁপড়েকে ডাকল। সে পশু হলেও বিরাট শক্তিধর পশুরা তাকে মোটেই পাত্তা দেয় না। আর এই ভয়ানক যুদ্ধে সে কি-ই বা করতে পারে! পাখিরা তাকে ঢুকিয়ে দিল পশুদের রাজত্বে। সে এত ছোট যে কেউ তাকে দেখতে পেল না, তার ওপরে তার গায়ের রং কালো। সে মাটির সঙ্গে মিশে দিব্যি ঢুকে গেল শত্রুরাজ্যে। চুপটি করে লুকিয়ে থেকে পিঁপড়ে পশুদের সব ফন্দি-ফিকির আর যুদ্ধের কৌশল জেনে নিল। তারপর যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তেমনি চুপিচুপি পালিয়ে এল শত্রুর রাজ্য থেকে।

গুটি গুটি পাখিদের ডেরায় এসে বেশ পণ্ডিতের মত সে বলল, 'শোনো, পাখিরা। আমি সব জেনে এসেছি। পশুদের সব ফন্দি-ফিকির তোমাদের জানাচ্ছি। তোমাদের-বিরুদ্ধে পশুরা যে যুদ্ধ করতে আসছে, এবার সেই যুদ্ধে পশুদের যুদ্ধ-সর্দার হবে শেয়াল। আর তার লেজ হবে যুদ্ধের সংকেত বা বলতে পারো ইশারা। যতক্ষণ পর্যন্ত শেয়াল তার লেজকে আকাশের দিকে খাড়া করে রাখবে ততক্ষণ পশুরা সামনে এগিয়ে যাবে আর লড়াই চালিয়ে যাবে। কিরকম খাড়া থাকবে জানতে চাও? মাটির ওপরে যেমন গাছ দাঁড়িয়ে থাকে, ঠিক সেই রকম। আর শেয়াল যেই লেজ নামিয়ে নেবে অমনি পশুরা যুদ্ধ বন্ধ করে পালিয়ে যাবে। কিরকমভাবে নামিয়ে নেবে জানতে চাও? গাছের গোড়া কাটলে গাছ যেমন পড়ে যায়, ঠিক সেইভাবে। এইসব যুক্তি হয়েছে আব পশুরা তাই মেনে চলবে।'

পাখিদের যুদ্ধ-সর্দার হয়েছে ঈগল। যেমন তার তীক্ষ্নদৃষ্টি, তেমনি দ্রুতগতি ও নির্ভীক শিকারী সে। ঈগল একটা ছোট্ট পাখিকে বলল, 'ভাই, তুমি শিগ্‌গির গিয়ে মৌমাছিকে ডেকে আনো। দেরি যেন না হয়।'

মৌমাছি তক্ষুনি উড়ে এল ঈগলের কাছে, পাশে রয়েছে সেই ছোট্ট পাখি।

ঈগল মৌমাছিকে বলল, 'ভাই মৌমাছি, এই যুদ্ধে তোমাকে খুব বিপদের মধ্যেও একটা কাজ করতে হবে। সব কিছু নির্ভর করছে তোমার ওপর। অবশ্য আমরাও প্রাণ দিয়ে লড়াই করব। তুমি এক কাজ করবে। যখন পশুরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এগিয়ে আসবে আমাদের দিকে, যখন যুদ্ধের জন্য তারা খুব উত্তেজিত হয়ে থাকবে, ঠিক সেই

সময় তুমি উড়ে গিয়ে শেয়ালের লেজের ডগায় বসবে। আর দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে লেজের ডগা্য বসাবে কামড। একবার নয়, বারবার। আর তাতেই আমরা যুদ্ধে জিতে যাবো। আমাদেরই একজন তুমি, তাই বিপদ থাকলেও তুমি এটা করবেই।'

যুদ্ধ-সর্দারের আদেশ মেনে নিয়ে ঘন বনের গভীরে অদৃশ্য হয়ে গেল ছোট্ট মৌমাছি।

তীর-ধনুক-বর্শা ছুঁচলো লাঠি নিয়ে এগিয়ে আসছে পশুরা। সবার সামনে লেজ উঁচু করে চলেছে শেযাল, তাব দাঁতে তীর-ধনুক আর পিঠে তীবভরা তূণ।

পাখিরাও তৈবি। তারাও এনেছে একই ধরনের অস্ত্রশস্ত্র। সামনাসামনি হতেই বেধে গেল তুমুল লডাই। সে এক ভযানক যুদ্ধ।

বোঁ বোঁ করে মৌমাছি উডে এল ঘন ঝোপের আডাল থেকে। বাতাসে কযেকবার ঘুরে ঘুরে উডতেই সে শেযালকে দেখতে পেল। সব পশুর সামনে লেজ খাডা করে সে যুদ্ধ করছে। পোঁ করে একবার পাক খেয়েই মৌমাছি লাস্থ হয়ে বসল শেযালের লেজের ডগায়। আর তাবপর?

দেহের সমস্ত শক্তি মুখে এনে কামডে দিল লেজের ডগা, বিষ ঢেলে দিল ছোট মৌমাছি। শেযাল চমকে উঠল, ব্যথায় তার লেজ কেঁপে উঠল। তবু যুদ্ধ কবতে লাগল। আবার বিষেব তীব ফুটল লেজেব ডগায—আবার—আবার। মৌমাছি কামডেই চলেছে। লেজ অবস হযে আসছে, ব্যথায় লাফাতে ইচ্ছে করছে, শেযাল আব পারে না। শেষকালে শেয়াল যন্ত্রণায় চিৎকার করে লেজ নামিয়ে নিল। আব দৌড দিল উল্টোমুখী।

পশুরা অবাক হয়ে দেখল,শেযালের লেজ নামানো, শেয়াল পালাচ্ছে। তারা বুঝল, যুদ্ধে এগিযে যাওযা আর উচিত নয়, কেননা তাদের সর্দারেব লেজ নামানো। তারাও ছত্রভঙ্গ হযে শেযালের পিছু পিছু দৌড দিল।

আর এই ভয়ানক যুদ্ধে শেষকালে পাখিদেরই জয় হল।

অভিপ্রায়

মানবসমাজেব বিবর্তনের ধারায় স্বাভাবিকভাবে আদিম সাম্যবাদী সমাজ ভেঙে যাওয়ার পর থেকে যুদ্ধ মানুষের নিত্যসঙ্গী। অবশ্য আদিম সাম্যবাদী সমাজেও যুদ্ধ ছিল। সে যুদ্ধ ক্ষুধার বিরুদ্ধে খাদ্য সংগ্রহের, বুনো জন্তু এবং প্রতিকূল প্রকৃতির বিরুদ্ধে। বিশেষ করে খাদ্য সংগ্রহের জন্য তাদের প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে হয়েছে। ভেদাভেদ ও

হানাহানি অর্থাৎ শ্রেণীসংঘর্ষ না থাকলেও অন্নের প্রাচুর্য ছিল না, অনাহার-অর্ধাহার ছিল প্রতিদিনের সঙ্গী। কিন্তু এই সমাজ ভেঙে যাওয়ার পর থেকে গোষ্ঠীভুক্ত মানুষ বাঁচার তাগিদে নিয়ত সংগ্রাম করে চলেছে। অন্য গোষ্ঠীর সঙ্গে পশুশিকার, জমির ফসল, গাছের ফল, যুদ্ধবন্দী ও নারীসম্পদ নিয়ে তাদের প্রতিনিয়ত সংঘর্ষ হয়েছে। সমাজের প্রতিদিনের কাজকর্মের সঙ্গে এই যুদ্ধ জড়িত, তাই এইসব অভিজ্ঞতা নিয়ে যুদ্ধ-সম্পর্কিত অসংখ্য মৌখিক গল্প সৃষ্টি করেছে আদিবাসী মানুষ।

বহুদিনের তিক্ত অভিজ্ঞতায় তারা জেনেছে, শুধুমাত্র দৈহিক শক্তিতে যুদ্ধ জয় সম্ভব নয়। পৃথিবীর প্রতিটি অংশের অগুণতি লোককথার সারমর্ম হল, বুদ্ধি যার বল তার। বিশেষ করে আমরা দেখি, যারা দৈহিক শক্তিতে হীনবল এবং আকারে ক্ষুদ্র, তারা শেষ পর্যন্ত বুদ্ধির খেলায় বলশালীকে পরাভূত করে। এবং সব সময়েই এই বুদ্ধির যুদ্ধকে প্রশংসা করা হয়েছে। পশুকথায় দেখি, খরগোশ ইঁদুর মৌমাছি শেয়াল কাক প্রভৃতি তুচ্ছ প্রাণীরা সিংহ ভালুক বাঘ বলদ হাতির মত বিশালদেহী পশুদের বুদ্ধির কৌশলে পরাজিত করেছে। বর্তমান পশুকথাটি এই দিক দিয়ে অত্যন্ত উন্নতমানের একটি সৃষ্টি।

বুদ্ধি যুদ্ধের বিরাট অস্ত্র। কিন্তু এই বুদ্ধির প্রয়োগ ক্ষেত্রে যে যতটা কৌশলী হতে পারবে তারই জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি। এই ব্যাপারে শত্রুর দুর্বলতা ও পরিকল্পনা জানা সবচেয়ে আগে দরকার। শত্রু কিভাবে আক্রমণের পরিকল্পনা করেছে সেটা জানার সবচেয়ে উৎকৃষ্ট পথ গুপ্তচরবৃত্তি। বর্তমানকালে বিশ্বব্যাপী আধুনিক যুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি যেমন যুদ্ধের অন্যতম অস্ত্রে পরিণত হয়েছে, তেমনি আদিবাসী জনসমাজের মধ্যেও সেই সুপ্রাচীনকাল থেকেই যুদ্ধজয়ের জন্য এই কৌশল অবলম্বন করা হত।

পাখিরা যে মুহূর্তে বুঝেছে, তারা কম শক্তি নিয়ে লড়াই করতে বাধ্য হচ্ছে, সেই মুহূর্তে তারা পিঁপড়েকে পাঠিয়েছে শত্রুপক্ষের শিবিরে। কি অসাধারণ নির্বাচন! এমন একটি প্রাণী যে নিজের সম্প্রদায়ের কাছেই নিগৃহীত, তাই স্বাভাবিকভাবেই তার সম্প্রদায়ের প্রতি রয়েছে তীব্র ঘৃণা। সংবাদ-সংগ্রহে সে যে তৎপর হবে এ তো স্বাভাবিক।

কাউকে তুচ্ছ করতে নেই। ভয়ানক যুদ্ধে প্রত্যেকের সাহায্যই প্রয়োজন, সামান্য হলেও সে অসাধারণ দায়িত্ব পালন করতে পারে। ঠিক পিঁপড়ে যে ভাবে করেছে। যারা বোকা ও বলদর্পী তারাই সাধারণ মানুষকে অবহেলা করে।

গুপ্তচরকে কিভাবে কাজ করতে হবে? শত্রুপক্ষের শিবিরে সে ঢুকবে নিঃশব্দে

অর্থাৎ অতি সন্তর্পণে। কাজ করবে লুকিয়ে-চুরিয়ে যাতে কেউ সন্দেহ না করে। আবার তেমনি সন্তর্পণেই বেরিয়ে আসতে হবে পুরো গোপন সংবাদ নিয়ে। আবার শত্রুপক্ষের পরিকল্পনা ও দুর্বলতা জানা হয়ে গেলেও লড়াই কিন্তু করতে হবে প্রাণপণে। ঈগল মৌমাছিকে তাই বলেছে। অর্থাৎ সমস্ত দিকেই তৎপর থাকতে হবে। শত্রুকে নাজেহাল করতে সমস্ত অস্ত্রকেই ব্যবহার করা চাই।

অমিতবিক্রম পশুরা হেরে গেল। তাদের সংকেত জেনে ফেলেছে শত্রুপক্ষের পাখিরা আর সে কারণেই তাদের সৈন্যবাহিনীতে দেখা দিয়েছে বিশৃঙ্খলা। শেয়াল সংকেত দিতে বাধ্য হয়েছে কিন্তু পশুরা নিজেরা উদ্যোগী হয়ে যুদ্ধ চালাতে চায় নি। সেনাপতির পলায়নে সমস্ত বাহিনী তাই ছত্রভঙ্গ হয়েছে! বিশৃঙ্খল-দল কখনও জয়ী হতে পারে না। মৌমাছি দলপতির নির্দেশে বিপদের ঝুঁকি নিয়েও শত্রুর মনোবল ভাঙতে সচেষ্ট রয়েছে, আর পাখিরাও সুশৃঙ্খলভাবে যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছে।

পশুরা পররাজ্য আক্রমণ করেছে, পাখিরা স্বদেশভূমির স্বাধীনতা রক্ষা করছে। তাই পাখিরা যেমন আন্তরিকভাবে মরণপণ লড়াই করবে, প্রভুত্বকামী পশুরা কখনই তা পারবে না। তাদের মানসিক দৃঢ়তা পাখিদের চেয়ে কম হতে বাধ্য। আক্রমণকারী দেশের সেনাবাহিনী কখনই স্বদেশভূমি রক্ষাকারী মানুষের মতন মনোবল নিয়ে লড়তে পারে না। এটা ইতিহাসের শিক্ষা। তাই পাখিরা শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে।

সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী-ক্ষমতার অনন্ত অধিকারী আদিবাসী মানুষ এক অপূর্ব দক্ষতায় এই পশুকথাটি সৃষ্টি করেছেন।

বলিভিয়া

দেশ পরিচয়

লাতিন আমেরিকার দেশগুলো কয়েক শতাব্দী ধরে স্পেনীয় উপনিবেশবাদীদের দ্বারা শোষিত নিপীড়িত লুন্ঠিত ও অত্যাচারিত হয়ে এসেছে। তবু নিজেদের প্রাণ-সম্পদে সমৃদ্ধ ঐতিহ্যপ্রিয় লাতিন আমেরিকার আদি-অধিবাসীরা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য স্বকীয়তা বজায় রাখতে পেরেছে। আফ্রিকার দেশগুলোর মতই এই দেশগুলো যেন কয়েকটা রসাল ফল, আর যখন যেমন ইচ্ছা উপনিবেশবাদী শক্তি ঠুকরে ঠুকরে তার থেকে রস নিঙড়ে নিয়েছে। দেশের মানুষ পশুর মত দীন জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়েছে।

দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের বলিভিয়ার উত্তরে ব্রাজিল, দক্ষিণে আর্জেন্টিনা ও প্যারাগুয়ে, পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর এবং পূর্বে রয়েছে ব্রাজিল।

দীর্ঘ পরাধীনতার ফলে সেখানে বহু শ্বেতাঙ্গ স্থায়ীভাবে বাস করলেও দেশে মূলতঃ রয়েছে আদি-অধিবাসী জনগণ ও কিছু মিশ্র জনগোষ্ঠী। প্রজাতান্ত্রিক দেশ হওয়ার আগে দেশের মানুষ উপনিবেশবাদীদের অধীনে জীবনে ও কর্মে ছিল ক্রীতদাস। আদি-অধিবাসী ইণ্ডিয়ানরা সমস্ত ধরনের দৈহিক পরিশ্রমের কাজ করত আর মিশ্র জনগোষ্ঠীর কাজ ছিল তাদের তদারকি করা। ইণ্ডিয়ানরা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলেও পুরনো বিশ্বাস এবং লোকঐতিহ্যকে অস্বীকার করে নি। ইন্‌কা সভ্যতার অবশেষ তাদের জীবনাচরণে ও কৃষ্টিতে লক্ষ্য করা যাবে। এই বিশ্বাসের জন্য একদিকে যেমন তারা কখনও পুরোপুরি ইউরোপীয়দের সঙ্গে একাত্ম হতে পারে নি, অন্যদিকে তেমনি আজও পুরাতন শোষকদের আপন করে নিতে তারা রাজি নয়। তাদের স্বাতন্ত্র্যবোধ ও স্বাধীনতাপ্রিয়তা এক মহান ঐতিহ্যের অনুসারী।

উন্নত শহরগুলোর অত্যন্ত কাছেই রয়েছে এখানকার অনুন্নত গ্রামগুলো। দুটি স্থানকে দেখলে বিশ্বাস হয় না যে একই দেশে এমন বৈপরীত্য পাশাপাশি থাকতে পারে। গ্রামগুলিতে আজও দেখা যাবে প্রাচীন পোশাকে মাথায় পালক-গোঁজা বেশে উচ্ছল আনন্দে নাচে-গানে মুখর হয়ে ওঠা বলিভিয়ার আদি-অধিবাসী লোকসমাজকে। লোকসংস্কৃতি তাদের জীবনে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে রয়েছে।

দেশে রেলপথ ও অন্যান্য আধুনিক কাজকর্মে বাস্তুকাররা অতি পুরাতন ও রহস্যময়

ইন্‌কা সভ্যতার বিপুল ক্ষতিসাধন করেছে, ধ্বংসস্তূপ থেকে ব্যাপকভাবে পাথর নিয়ে এসেছে। তবু আজও প্রচুর প্রাচীর এবং ভগ্ন দ্বারপথ রয়েছে আর সেসবে ক্ষোদিত রয়েছে মানুষ ও পশুর অপরূপ চিত্রমালা।

বলিভিয়ায় প্রচুর সংখ্যক পর্বত থাকলেও মধ্যভাগে তৃণভূমিও রয়েছে। উত্তর-পূর্বাংশে রয়েছে বনভূমি। পার্বত্য এলাকায় টিন তামা রূপো ও অন্যান্য খনিজ পদার্থ আছে। রূপোর পাহাড় হল পোটোসি। বনভূমিতে রবার হয় পর্যাপ্ত পরিমাণে। সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হয় টিন। মূল্যবান কোকা হয়, যার থেকে তৈরি হয় কোকেন। আলপাকা ও এক ধরনের ছাগল থেকে উন্নতমানের উল তৈরি হয়, বিদেশে এর খুব চাহিদা।

দেশে এত সম্পদ থাকতেও দেশের অধিকাংশ মানুষ হত-দরিদ্র। আজকের বলিভিয়ার মানুষের অবস্থা দেখলে বিশ্বাস হয় না, এদেরই পূর্বপুরুষ ইন্‌কা সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। আজও দেশের সুবিধাভোগী শ্রেণী দেশের সম্পদের সিংহভাগ লুণ্ঠন ও ভোগ করছে।

শোষণে শোষণে জর্জরিত বলিভিয়ায় আজ তাই নতুন সংগ্রামের সূচনা হয়েছে। এই সংগ্রাম অর্থনৈতিক স্বাধীনতার স্বপক্ষে। দেশের অবস্থা আজ অগ্নিগর্ভ। ইন্‌কা সভ্যতার সূর্য-তনয়েরা রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

বলিভিয়ার আয়তন ৪২৪, ২০০ বর্গ মাইল ও লোকসংখ্যা ৩, ০১৯, ০৩১।

পশুকথা

ছোট্ট খরগোশ ও পশুরাজ

এক ছোট্ট খরগোশ খুব মজার মানুষ। ছোট্ট হলে কি হবে? বলিহারি তার সাহস। শুধু কি তাই? সে খুব মজা করতে ভালবাসে, চোখেমুখে তার কৌতুক। এই সাহসী কৌতুকপ্রিয় খরগোশ পশুদের কাছে যখন তখন যেখানে সেখানে পশুরাজের নামে নিন্দে রটিয়ে বেড়াচ্ছে। ভয়-ডর বলে কিছু নেই। অত শক্তিমান পশুরাজের বিরুদ্ধে সে শুধুই আজেবাজে কথা বলে ঘুরে বেড়ায়।

পশুরাজ শুনলেন খরগোশের কথা। এত বড় স্পর্ধা! ঠিক করলেন, খরগোশকে এক কামড়ে খেয়ে ফেলবেন।

শেয়ালকে ডেকে পশুরাজ বললেন, 'তুমি এক্ষুনি যাও। খরগোশকেবেঁধে আনো।

ওকে আমি খাব। আমার পথের কাঁটা সরিয়ে ফেলব। আমার বিরুদ্ধে নিন্দে? বড় বাড় বেড়েছে। যাও তুমি।'

শেয়াল মাথা নুইয়ে নমস্কার করে রওনা দিল। চলতে চলতে সবুজ তৃণপ্রান্তরে দেখা হল ছোট্ট খরগোশের সঙ্গে। শেয়াল বলল, 'খরগোশ, আমার সঙ্গে তোমায় যেতে হবে। তোমাকে ধরে নিয়ে যেতে পশুরাজ আমাকে আদেশ করেছেন।'

কয়েকবার ঠোঁট চুলবুল্ করে খরগোশ বলল, 'তা তো যেতেই হবে, পশুরাজের আদেশ। কিন্তু যাওয়ার আগে তুমি কি কয়েকটা মিষ্টি আপেল খেতে চাও না? খেয়েই দেখ না। ঐ মাঠের ওদিকে একটা আপেল গাছ আছে, আর আপেলের ভারে ডালগুলো সব নুয়ে গিয়েছে। কত আপেল! তুমি ঐ গাছে গিয়ে মনের সুখে পেট পুরে আপেল খেয়ে এসো। আমি এখানে তোমার জন্য বসে থাকছি। যাও, যাও। দেরি কেন?'

আপেলের নাম শুনেই শেয়ালের মনটা কেমন হয়ে গেল, পেটের মধ্যেও মোচড় দিয়ে উঠল। আহা! কতকাল ভাল খাবার খাই না, কতকাল আপেলের মুখ দেখি না। আঃ! কতকাল, কতকাল! শেয়াল ক্ষুধিত চোখে এগিয়ে গেল মাঠের ওদিকে, পেছনে পড়ে রইল খরগোশ। শেয়ালের দেরি সহ্য হচ্ছে না, সে ছুটল আপেল গাছের দিকে। খরগোশ লাফ দিয়ে পেছন ফিরল, অদৃশ্য হয়ে গেল দূর পাহাড়ী বনে।

শেয়াল আপেল খেতে লাগল। বড় সুমিষ্ট রসাল আপেল। বহুদিন এমন জিনিস খেতে না পেয়ে আরও ভাল লাগল। খাচ্ছে আর খাচ্ছে, সারারাত চলে গেল, তবুও সে খাচ্ছে। সকাল হতেই শেয়ালের হুঁশ হল, কিন্তু তক্ষুনি শুরু হল পেটের যন্ত্রণা। যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করতে করতে শেয়াল মাটিতে শুয়ে পড়ল, ঘাসের ওপর গড়াগড়ি দিতে লাগল। গড়াচ্ছে আর যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে, কাতরাচ্ছে আর গড়াগড়ি দিচ্ছে।

শেয়াল ফিরছে না দেখে পশুরাজ অবাক হলেন। শেয়াল কোথায় গেল? তার আদেশ কি সে মানে নি? তখন পশুরাজ ছোট্ট পাহাড়ী নেকড়েকে ডেকে বললেন, 'ছোট্ট পাহাড়ী নেকড়ে, তুমি যাও আর শেয়ালকে খুঁজে আনো। দেখ, কেন শেয়াল খরগোশকে আমার কাছে ধরে নিয়ে এল না? যাও, শিগ্‌গির যাও।'

ছোট্ট পাহাড়ী নেকড়ে মাথা নুইয়ে নমস্কার করে রওনা দিল। নেকড়ে চলছে, চলছে, দু'পাশে চোখ রেখে এগোচ্ছে। চলতে চলতে নেকড়ে দেখতে পেল, একটা আপেল গাছের তলায় ঘাসে শুয়ে শেয়াল যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। সে অবাক হল।

শেয়ালের কাছে গিয়ে নেকড়ে বলল, 'আরে, তুমি এখানে? দুষ্টু খরগোশ কোথায় গেল? ওকে ধরে নিয়ে তুমি কেন পশুরাজের কাছে যাওনি? কত দেরি হয়ে গেল। ওধারে পশুরাজ রেগে লেজ ঝাপটাচ্ছে।'

শেয়াল ভয় পেল। শুয়ে শুয়েই বলল, 'আমি খরগোশকে গিলে ফেলেছি। সে যাতে না পালাতে পারে তাই আস্ত গিলেছি। কিন্তু বন্ধু, কি বিপদ! সেই হতচ্ছাড়া খরগোশ এখন পেট থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আমার পেটের ভেতর খালি লাথি মারছে। আর দেখ আমার দশা। পেটের ব্যথায় আমি এখন মরছি। এখন কি করি? আমি তো বন্ধু আর হাঁটাচলা করতে পারছি না! বড়ই যন্ত্রণা! তুমি একটা কাজ করবে? ঐ যে দূরে পাহাড়টা দেখছ, ঐ পাহাড়ের ওপাশে এক ধরনের বুনো লতাপাতা আছে দেখতে পাবে। ঐ লতাপাতা খুব ভালো ওষুধ, ওগুলো চিবিয়ে খেলেই আমার পেটের ব্যথা একেবারে কমে যাবে। আর ব্যথা কমলেই আমরা দুজনে খরগোশকে নিয়ে পশুরাজের কাছে যেতে পারব।'

বন্ধুর যন্ত্রনায় নেকড়ে স্থির থাকতে পারল না। ছুটে গেল পাহাড়ের দিকে। পাহাড় ডিঙিয়ে ওপাশে গেল। দেখতে পেল, ঘন সবুজ লতাপাতায় জায়গাটা ভরে রয়েছে। দাঁত দিয়ে অনেক লতাপাতা ছিঁড়ে মুখ ভর্তি করল। পাতার রসে জিভ ভিজে গেল। চমকে উঠল পাহাড়ী নেকড়ে। এমন সুস্বাদু পাতা তো বহুকাল খাই নি? আঃ, কি অপূর্ব। কতকাল ভালোমন্দ খাই না। কতকাল, কতকাল! এমন ভালো জিনিসের মুখ কতকাল দেখি না! পেটের মধ্যেও মোচড় দিয়ে উঠল। ক্ষুধিত চোখে ছোট্ট পাহাড়ী নেকড়ে লতাপাতা খেতে লাগল, ভুলে গেল কেন সে এখানে এসেছিল। খাচ্ছে আর খাচ্ছে, সারারাত্ ধরে নেকড়ে লতাপাতাই খাচ্ছে। পেছনে দূরে আপেল গাছের তলায় শেয়াল শুয়ে শুয়ে যন্ত্রণায় ছটফট্ করছে।

পরের দিন আলো ফুটল, অন্ধকার কোথায় পালাল। শেয়াল ফিরল না খরগোশকে নিয়ে। নেকড়ে ফিরল না শেয়াল আর খরগোশকে নিয়ে। পশুরাজ আরও রেগে গেলেন। তার রাজ্যে হোল কি?

পশুরাজ রাঙাচোখ শিকারী পাখিকে ডাকলেন। পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচুতে সে থাকে, সবাই তাকে ভয় পায়। পশুরাজের খুব অনুগত এই শিকারী পাখি। সে এসে পশুরাজের সামনে মাথা নুইয়ে দাঁড়াল। খুব শক্ত কাজ না হলে পশুরাজ সহজে তাকে ডাকেন না। সে একথা জানে।

পশুরাজ বললেন, 'আমার অনুগত শিকারী পাখি, তুমি এক্ষুনি যাও। দেখ, কোথায় গেল শেয়াল আর পাহাড়ী নেকড়ে? আর জেনে এসো, কেন তারা এখনও খরগোশকে ধরে আনেনি? যাও, শিগ্‌গির যাও।'

শিকারী পাখি মাথা নুইয়ে নমস্কার করে উড়ে চলল তৃণভূমিতে। আকাশে

উড়ছে শিকারী পাখি, তার বাঙাচোখ রয়েছে নিচের দিকে। দেখতে পেল, দুষ্টু নিন্দুকে খরগোশ তৃণপ্রান্তরে কুটুস কুটুস্ করে ঘাস ছিঁড়ে খাচ্ছে। কোথায় আছে শেয়াল আর কোথায় আছে পাহাড়ী নেকড়ে—তাদের আর খোঁজ করল না শিকারী পাখি। হঠাৎ ওপর থেকে ঝড়ের বেগে সোঁ করে নেমে এল খরগোশের ওপরে, কিছু বুঝবার আগেই ধারাল নখে তুলে নিল খরগোশকে। খরগোশ আচমকা ধরা পড়ে গেল, পালাবার পথ পেল না। উড়ে চলল পশুরাজের কাছে।

খরগোশ দাঁড়িয়ে রয়েছে পশুরাজের সামনে। পশুরাজ বড় বড় চোখে তাকালেন খরগোশের দিকে, ধারাল দাঁতগুলো বের করলেন, জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটতে লাগলেন তারপর আস্তে আস্তে লেজ নাড়তে নাড়তে বললেন, 'খরগোশ, শেষঅব্দি তুমি ধরা পড়লে। পড়বেই এটা তো জানা কথা। অনেকদিন থেকেই তুমি আমার নিন্দে রটিয়ে বেড়াচ্ছ পশুদের কাছে আমার নামে যা খুশি তাই বলে বেড়াচ্ছ আমাকে নিয়ে তুমি মজা করেছ, পশুদের কাছে তুমি আমাকে ছোট করেছ। আমি খুব মজার মানুষ, তাই না? এবার বুঝবে। আমি তোমাকে গোটা গিলে ফেলব।'

খরগোশ বেশ বিপদে পড়েছে। কিন্তু তার সাহস ফুরোয়নি, বিপদে বুদ্ধিও কমে যায়নি। শান্তভাবে খরগোশ বলল, 'পশুরাজ, আমি বড় ক্লান্ত। আপনি যদি আমাকে খেয়ে ফেলেন তাহলে আমি মোটেই দুঃখিত হব না, বরং আনন্দিতই হব। কেননা, আমি বড় ক্লান্ত। কিন্তু আমাকে খাওয়ার আগে আপনার কি একটুও ইচ্ছে করছে না ঐ তৃণভূমির মোটাসোটা কয়েকটা কুকুরকে খেয়ে নিতে? আমি তো হাতের মুঠোয় রয়েছি। আঃ, কি নাদুস-নুদুস আর চর্বিতে ভরা ঐ ছোট্ট ছোট্ট কুকুর! আমি জানি, কোথায় তারা ঘুরে বেড়ায়। বোধহয়, আমিই শুধু তাদের খবর জানি আর সে পথ আপনাকে দেখিয়েও দিতে পারি। অবশ্য, আপনার যদি ইচ্ছে হয়।'

চর্বিতে ভরা নাদুস-নুদুস তৃণভূমির ছোট্ট ছোট্ট কুকুর—ছবিগুলো ভেসে উঠল পশুরাজের চোখের সামনে। খরগোশ তো রয়েছেই, এগুলো তো বাড়তি।

পশুরাজ এগিয়ে চলেছেন খরগোশের পেছনে পেছনে। আর কেউ নেই। শুধু পশুরাজ আর খরগোশ, খরগোশ আর পশুরাজ। তৃণভূমির পাশে ঘন ঝোপের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে খরগোশ পশুরাজকে ইশারা করল, যেন ঐ ঝোপেই রয়েছে। পশুরাজ লাফিয়ে পড়লেন ঘন ঝোপের লতাপাতার জালে।

খরগোশ জানত, ওখানে রয়েছে এমন বুনো লতাপাতা যে, কেউ সেখানে গিয়ে পড়লে আর বেরিয়ে আসতে পারবে না। যত চেষ্টা করবে, পা যাবে আরও বেশি

জড়িয়ে, দেহ আঁকড়ে ধরবে বুনো লতা। আর হোলও তাই। রাগে পশুরাজ যত লাফালাফি করতে লাগলেন ততই পড়লেন জড়িয়ে। ক্রমশঃ এ বাঁধন বেশি বেশি শক্ত হচ্ছে। লতার ফাঁদে পশুরাজের শক্তি কমে আসছে।

বনের সব খবর খরগোশ জানে। বনের সব জায়গায় সে ঘুরে বেড়ায। চলে যেতে যেতে খরগোশ পশুরাজকে বলে উঠল, 'পশুরাজ, মনের সুখে তৃণভূমির ছোট্ট ছোট্ট কুকুর খান আব আনন্দ করুন। চিরকালের জন্য আনন্দ করুন।'

অভিপ্রায়

ছোট ছোট গোষ্ঠীসমাজে গোষ্ঠীব সর্দাব অর্থাৎ সামন্তপ্রভুব ক্ষমতা অপরিসীম। সামাজিক প্রথা সংস্কার এবং প্রচলিত রীতিনীতি সমাজেব মানুষকে এমনভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে বেখেছে যে সেই শৃঙ্খলেব বাইবে কেউ যেতে পারে না। নানাবিধ কৌশলে উত্তরাধিকারসূত্রে গোষ্ঠীপতি যে ক্ষমতা করায়ত্ত করেছে, তাকে কোনোভাবেই সে ছাড়তে রাজি নয। বিলাস-বৈভব ও অত্যাচাব কবার অধিকাব তাকে স্বতন্ত্র মানুষে পরিণত কবে। অদৃশ্য দেবতা ছাড়া সমাজের ওপরে তার মত প্রভাব আর কারও নেই, সঙ্গে অবশ্য কোথাও কোথাও পুবোহিত সম্প্রদায় তার অত্যাচারেব ভাগীদাব হয়, যদিও কোনো কোনো সমাজে গোষ্ঠীপতি নিজেই পুবোহিত। স্বাভাবিকভাবেই, এই অনুকূল অধিকাব সহজে সে ছেড়ে দিতে রাজি নয়। প্রজারা যতই দুঃখকষ্টের মধ্যে থাকুক না কেন তাতে গোষ্ঠীপতিব কিছু এসে যায় না। এই প্রজাদের মধ্যে কোনো বেয়াদপ যদি প্রথাগত সামাজিক নিয়মশৃঙ্খলা ভেঙে সামন্তপ্রভুর বিরুদ্ধে দাড়ায়, তবে সেই স্পর্ধিত ব্যতিক্রম মানুষটির বিরুদ্ধে গোষ্ঠীপতি সৈন্য পাঠায়, তাকে হত্যা করে। সেই মানুষটিকে এমনভাবে শাস্তি দেওয়া হয় যাতে অদূর ভবিষ্যতে আর কেউ এরকম সাহস দেখাতে ভরসা না পায়। কিন্তু বিরুদ্ধতা যে ঘটে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কেননা, মানুষের সহ্য করার একটা সীমা রয়েছে। উৎপীড়ন বল্গাছাড়া হলে সে বল্গাকে রোধ করার মানসিকতাও গড়ে উঠতে বাধ্য। এই বক্তব্যই রয়েছে বলিভিয়ার ইণ্ডিয়ান আদিবাসীদের এই পশুকথাটিতে।

ছোট্ট খরগোশ এখানে প্রতিবাদী শক্তির প্রতীক। পশুরাজ হল গোষ্ঠীপতি। পশুকথাটিতে বলা হয়েছে, খরগোশ খুব মজার মানুষ, সে কৌতুকপ্রিয়। নিজে রটানোই

তার কাজ। কিন্তু একই সঙ্গে স্পষ্ট হয়েছে, খরগোশ সাহসী, ভয়ডর কিছু নেই, শক্তিমান পশুরাজের বিরুদ্ধে সে আজেবাজে কথা বলে। এই রকম মানুষকে আমরা চিনি। সাধারণ মানুষকে সে প্রতিরোধের কথা বলে, সামন্তপ্রভুর অত্যাচারের কথা বোঝায়। গল্পের শেষে রয়েছে, বনের সব খবর খরগোশ জানে। বনের সব জায়গায় সে ঘুরে বেড়ায়। সাধারণ মানুষের মধ্যে সে মিলেমিশে কাজ করে। গোষ্ঠীপতির রুদ্ররোষ এড়াতে গল্পকার প্রচ্ছন্ন রূপক ব্যবহার করেছেন, গল্পটিকে মজাদার করতে চেয়েছেন বাধ্য হয়ে। তাই খরগোশের চরিত্রে কৌতুকপ্রিয়তার স্পর্শ আনতে হয়েছে।

এই প্রতিবাদী মানুষটিকে বন্দী করে আনবার জন্য সামন্তপ্রভু সৈন্য পাঠিয়েছে। কিন্তু এরা কোন সৈন্য? যারা পেটের দায়ে গোষ্ঠীপতির অধীনে কাজ করতে বাধ্য হয়, কিন্তু পেট পুরে খেতে পায় না, ভালো খাবারের স্বাদগ্রহণ যাদের চিরকালের স্বপ্ন। তবু সামান্য খাদ্যের বিনিময়েই তাদের কাজ করতে হয়। তাই দেখি, দুই সৈন্য শেয়াল আর নেকড়ে বলেছে, আহা! কতকাল ভালো খাবার খাই না, কতকাল এসবের মুখ দেখি না। কতকাল, কতকাল! কি নিদারুণ ক্ষুধা, পেটের কি জ্বালা! মনিবের সমস্ত ভয় পর্যন্ত ভুলিয়ে দিয়েছে এই জমে থাকা ক্ষুধা। এ তো গল্পকথা নয়, সমাজ জীবনের নির্মম অভিজ্ঞতা এখানে কান্না হয়ে ঝরে পড়েছে।

অনাহার আর অর্ধাহারে যে পাকস্থলী শুকিয়ে গিয়েছে, চাহিদা মেটাতে না পেরে যে পেট কমজোরী হয়ে পড়েছে, একদিনের অতিভোজন সেখানে তো বিপর্যয় ডেকে আনবেই। যন্ত্রণা আর কাতরোক্তির মধ্যে সেই নিষ্ঠুর সত্য প্রকাশিত হচ্ছে। অসুখের একমাত্র সহায় বুনো-লতাপাতা। সেকথা বলতেও ভোলেনি তারা। একজনের বেদনায় সমব্যথী হয় অন্যজন, কেননা দুজনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান এক। তাই বন্ধু শেয়ালের যন্ত্রণা দেখে নেকড়ে স্থির থাকতে পারেনি। এই সমবেদনা রয়েছে বলেই গোষ্ঠীমানুষ নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও লড়াই চালিয়ে যেতে পারে।

কিন্তু সব সৈন্যই এক পর্যায়ের নয়। যে মানুষ শক্তিশালী নিষ্ঠুর ও বেশি কর্মক্ষম, গোষ্ঠিপতি তাকে সুযোগসুবিধা বেশি দেয়। আর এই বাড়তি সুযোগের জন্য তার আনুগত্যও থাকে বেশি। এরা সেনাবিভাগের ওপরতলার লোক। খুব শক্ত কাজেই এদের ডাক পড়ে। রাঙাচোখ শিকারী পাখি এই জাতীয় মানুষ। পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচুতে সে থাকে—এই বাক্যের মধ্যেই তার সামাজিক অবস্থানকে স্পষ্ট করেছেন লোকগল্পকার। এই সৈন্যটি যেমনি অনুগত তেমনি তৎপর।

প্রতিবাদী মানুষকে খুব সতর্ক থাকতে হয়, যে কোনো মুহূর্তে সে বন্দী হতে পারে। আচমকা আক্রমণ না করলে তাকে ধরাও খুব কঠিন। সুযোগসন্ধানী সৈন্যটি

সেকথা জানে। তাই অন্য দুজন সৈন্যকে সে আর খোঁজ করেনি, মূল শত্রুকে ধরে নিয়ে প্রভুর কাছে হাজির হয়েছে।

কিন্তু যে মানুষ শক্তিমানের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে সংগঠিত করার কাজে ব্যস্ত থাকে, তাকে হতে হয় অসীম সাহসী, বিপদের চরম মুহূর্তেও বুদ্ধি হারালে তার চলে না। কেননা, আত্মত্যাগ ও চিন্তায় সে অন্যদের চেয়ে বেশি অগ্রসর। খরগোশও মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে সাহস হারায়নি, বুদ্ধিও কমে যায়নি তার। নেতৃত্ব দেবার যোগ্য মানুষ এই খরগোশ।

অত্যাচারী তার শ্রেণী-স্বভাবেই লোভী হতে বাধ্য। কেননা, চূড়ান্ত লোভই তাকে অত্যাচারী ও শোষক করে তুলেছে। গোষ্ঠীপতি আরও জমি, আরও সম্পদ করায়ত্ত করতেই ব্যস্ত থাকে। এবং এই নিকৃষ্ট মানসিকতার জন্যই নাদুস-নুদুস, চর্বি, মোটাসোটা-কুকুর ইত্যাকার শব্দগুলো তাকে আরও বীভৎস করে তুলেছে।

সামন্তপ্রভু বা গোষ্ঠীপতি এমন ক্ষমতার অধিকারী যে তার আসন থেকে তাকে সরানো বড় সহজ কথা নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে তাকে হত্যা করেছে, কিংবা তার স্থান থেকে অপসারিত করেছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাস্তবে তা সম্ভব হয়নি। অথচ নিপীড়িত মানুষ মনে মনে অত্যাচারীর মৃত্যু কামনা করেছে। সংগঠন ও দৃঢ়তার অভাবে বাস্তবে যা ঘটতে পারেনি, চিন্তায় ও স্বপ্নে সেই মধুময় দিনের কল্পনা করতে তো কোনো বাধা নেই। উৎপীড়ক মরে গিয়েছে, তার শোষণ বন্ধ হয়েছে, সবাই পেট পুরে খাচ্ছে, শিশুরা ক্ষুধায় আর্তনাদ করছে না, অকারণে পিঠের চামড়া রক্তাক্ত হচ্ছে না চাবুকের আঘাতে—কল্পনা করতেও ভালো লাগে। জীবনে সে দিন আসেনি, কিন্তু চিন্তায় তো সেসব দিনের আনাগোনা চলে। তাই গল্পের মধ্যে নিষ্ঠুরভাবে পশুরাজকে হত্যা করেও তাদের স্বস্তি, তাদের মানসিক তৃপ্তি। লতার ফাঁদে পশুরাজের শক্তি কমে আসছে—পশুকথার মধ্য দিয়ে উত্তরপুরুষকে একথা বলতে পারার মধ্যেও মনের কামনা এবং ক্ষোভকে কিছুটা অন্তত প্রকাশ করা যাচ্ছে। পাহাড়-ঘেরা-বন ঘেরা আদিবাসী মানুষ, উৎপীড়িত প্রজা এভাবেই তাদের মনের ক্ষোভ-ঘৃণা-ক্রোধকে রূপায়িত করে তোলে।

জ্যামাইকা

দেশ পরিচয়

নির্ঝরের দেশ জ্যামাইকা। জ্যামাইকা শব্দটির অর্থও তাই। নীল পাহাড়ের এই সুন্দর দেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সম্পদে সমৃদ্ধ।

দেশের চারদিকে বহুদূর বিস্তৃত ক্যারিবিয়ান সাগর। অনেক দূরে উত্তরে কিউবা, সুদূর দক্ষিণে পানামা ও কলম্বিয়া, পশ্চিমে হোন্ডুরাস ও পূর্বে হাইতি।

১৬৫৫ সাল পর্যন্ত জ্যামাইকা ছিল স্পেনের অধিকারে, তারপরে আসে ব্রিটিশের অধীনে। এই দ্বীপ একদিকে ছিল উপনিবেশবাদীদের স্বচ্ছন্দ চারণভূমি আর অন্যদিকে ছিল জলদস্যুদের লুণ্ঠনের স্বর্গভূমি। বর্তমান কিংসটনের পাশে পোর্ট রয়্যাল ছিল জলদস্যুদের সদরদপ্তর। ১৬৯২ সালের ভূমিকম্পে এই স্বর্গভূমি রসাতলে যায়, দেশ জলদস্যুতার হাত থেকে আংশিক রক্ষা পায়।

আফ্রিকা থেকে শত সহস্র ক্রীতদাস এনে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীরা এখানে শোষণের সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। ক্রীতদাসদের ওপরে কি ধরনের অত্যাচার করা হোত সেকথা আজ আর ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু জ্যামাইকায় এই শোষণের মাত্রা বোধহয় সবরকম পদ্ধতিকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তাই হতাশা অত্যাচার ও অনাহারে জর্জরিত ক্রীতদাসদের এক বিরাট অংশ প্রচণ্ড বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং পাহাড়ী এলাকায় পালিয়ে যায়। সেখান থেকে সাহসিক আক্রমণে তারা দীর্ঘদিন দ্বীপের শাসকদের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। ক্রীতদাস প্রথার অবসানের পরেই কেবলমাত্র এই বিদ্রোহীদের সঙ্গে আংশিক সহজ সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

দেশের ব্যাপক অংশ জুড়ে রয়েছে পাহাড়, পূর্বদিকে নীল পর্বত। দক্ষিণ-পূর্বাংশে সুন্দর বন্দর রয়েছে। চিনি কলা সিগার মশলা ও কফি প্রচুর উৎপন্ন হয়। সমুদ্রের কচ্ছপ ও লবন দেশের আর দুটি অন্যতম সম্পদ।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মধ্যে সবচেয়ে বড় দ্বীপ জ্যামাইকা। দেশে রয়েছে স্বায়ত্ত-শাসন। ১৯৫৩ সালে সংবিধান কার্যকর হয়। প্রাপ্তবয়স্ক [illegible] মাধ্যমে নির্বাচিত

প্রতিনিধি-সভা আছে। দেশের আয়তন ৪,৪১১ বর্গ মাইল এবং লোকসংখ্যা ১,৬১৩,১৪৮। লোকসংখ্যার মধ্যে মাত্র হাজার পঁচিশেক শ্বেতাঙ্গ অধিবাসী।

জ্যামাইকার আদি-অধিবাসীরা সংখ্যায় যেমন ছিল অল্প তেমনি তারা স্বাতন্ত্র্য-প্রিয় ও ঐতিহ্যানুসারী। তাই উপনিবেশবাদীরা দেশের সম্পদ নিজেদের কাজে লাগাবার জন্য ক্রীতদাস আনতে শুরু করে। আজকের জ্যামাইকার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ তাই আফ্রিকার আদি-বাসিন্দা। আফ্রিকার বান্টু ইবো আশান্তি হাউসা মানদিনগো মোকো নাগো সোবো কোবোমানতিন প্রভৃতি আদিবাসী-গোষ্ঠীর মানুষ আজকের জ্যামাইকা গড়ে তুলেছে। এরা এসেছে নাইজেরিয়া ওরুবা ঘানা ক্যামেরুন কংগো কালাবার প্রভৃতি অঞ্চল থেকে।

নিজ বাসভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এরা উপনিবেশবাদী শোষণে মাতৃভাষা ভুলেছে, নিজেদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়েছে, দেশজ আচার-আচরণ-সংস্কার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুনভাবে গড়ে উঠেছে। কিন্তু তাদের আদি-সংস্কৃতি ছিল যথেষ্ট উন্নতমানের। ঐতিহ্যকে রক্ষা করবার অন্তর্নিহিত একটি মানবিক তাগিদ থাকে বলেই এইসব উদ্বাস্তু মানুষের গান ও লোককথার মধ্যে তার রেশ খুঁজে পাওয়া যাবে। আজ তাদের ভাষা ভিন্ন, কিন্তু এই ভিন্ন ভাষার শব্দ-চিত্রকল্প-দৃশ্যবর্ণনার মধ্যেও ফুটে ওঠে ছেড়ে-আসা আফ্রিকার নানান ছবি। লোকগল্প তারা বলছে ইংরেজী ভাষায়, কিন্তু রাজারাণী পশু অথবা কৃষকের নাম আদি-ভাষার শব্দ থেকেই নেওয়া। আবার বহু ক্রীতদাস জ্যামাইকায় এসেছে অন্য দেশে অনেককাল কাটিয়ে। সেখানকার স্মৃতিও তারা বয়ে এনেছে। তাই এখানকার গল্পগুলোতে আফ্রিকার বহু গল্পের হুবহু প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়, অন্য দেশের গল্পও ঢুকেছে, আর আদি-অধিবাসীদের গল্প তো রয়েছেই। বিশেষ করে, আফ্রিকার পশুকথাগুলি প্রায় অবিকৃত দেহে জ্যামাইকার মানুষের স্মৃতিতে রয়ে গিয়েছে। আবার গল্পে বিভিন্নতা যে আসেনি তাও নয়। আসাই স্বাভাবিক। সব মিলিয়ে জ্যামাইকার লোককথাগুলিতে নির্যাতিত এবং উৎপীড়িত মানুষের আশা-আকাঙ্খা-বেদনা ও সংগ্রামের চিত্র অত্যন্ত সহজভাবে ফুটে উঠেছে।

শূয়র ও সাদা ইঁদুর

খেতে না পেয়ে পেয়ে কালো শূয়র শুকিয়ে যাচ্ছে। এক সময় কত মোটাসোটা ছিল, থল্‌থল্ করত তার দেহ। আর আজ চামড়ার ওপরে হাড় দেখা যাচ্ছে, পায়ে আগের মত জোর নেই। মনও তাই ভালো থাকে না। দিনে দিনে সব কেমন হয়ে যাচ্ছে।

তাই একদিন শূয়র কাজের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। বাবা-মা বেঁচে থাকতে সে পেটের কথা চিন্তা করেনি। আজ আর সেদিন নেই। এখানে-ওখানে বহু জায়গায় শূয়র কাজের জন্য ঘুরছে, কিন্তু কোথাও কাজ পাচ্ছে না। সবাই বলছে, আমার মাঠে কাজের জন্য লোক আছে। কিন্তু শূয়র যে আর পারে না। তাকে যে কিছু জোগাড় করতেই হবে।

এমনি করে ঘুরতে ঘুরতে শূয়র একদিন হাজির হল এক সাদা ইঁদুরের কাছে। ইঁদুর তাকে বলল, 'তোমার তাহলে নেহাৎই কাজ দরকার। আচ্ছা, আমি তোমায় রাখব। তুমি হবে আমার চৌকিদার। রোজ রাতে তুমি আমার খামার পাহারা দেবে। মনে হচ্ছে, কেউ আমার ফসল চুরি করছে। কি, রাজি তো?' শূয়র আস্তে আস্তে বলল, 'হ্যাঁ রাজি। তা, কি রকম কি খেতে পরতে দেবেন?' শূয়রের মনে ভয়, যদি একথা বলাতে তার কাজ না হয়? তবু মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল কথাগুলো।

ইঁদুর মাথা নেড়ে বলল, 'আরে বাবা, কাজে তো আগে লেগেই পড়। যা দেব, খারাপ দেব না। আর মনে রেখো, কাজের লোকের অভাব নেই। তোমাকে সাড়ে তিন পেনি মাইনে দেব প্রতি সপ্তাহে। থাকার জায়গাও পাবে। তবে খাওয়া-দাওয়াটা তোমার।'

চমকে উঠল শূয়র। সাত দিনে মাত্র সাড়ে তিন পেনি! এর মধ্যেই আমাকে খাওয়া-দাওয়া চালাতে হবে! তা কি করে হবে? সে কাজটা নিতে চাইল না। মাথা নাড়ল। হঠাৎ পেটের মধ্যে কেমন করে উঠল। ভাবল, তাও তো কিছু হচ্ছে, এটা না নিলে একেবারেই তো মৃত্যু। যাক্, এটা পেয়ে পরে ভালোমত কিছু একটা খুঁজে নিলেই হবে। সাত দিন তো করি।

শূয়র রাজি হয়ে গেল। কিন্তু সাত দিনের জন্য। সাদা ইঁদুর হাসল।

সারা রাত জেগে শূয়র খামার পাহারা দেয়। আগে কোনোদিন রাত জাগেনি সে। আরামে ছোট্ট ঘরে ঘুমিয়ে থাকত। আর আজ? রাতে চোখ জড়িয়ে আসে ঘুমে,:সকালে চোখ লাল হয়ে থাকে, দেহ কেমন অবশ। কাজ খোঁজার আর উৎসাহ থাকে না তার। ঘুমিযে ঘুমিয়েই দিন কাটে। তবু রাতে সে কাজ করে চলে।

সাত দিন কেটে গেল। ইঁদুর তাকে সাড়ে তিন পেনি দিল। শূযরের কান্না পেল। মাইনে নিয়ে সে বেরিয়ে এল ইঁদুরের বাড়ি থেকে। পেছনে তাকিযে শূযর দেখে, সাদা ইঁদুর হাসছে।

বাজারের দিকে গেল শূয়র। সেখানে সে কিছু খেল। দেখা হল এক কালো কুকুরের সঙ্গে। কুকুর আপনমনে গান গাইছে,

রারাবুম রারাবুম
জেগে রই, রাত নিঝুম।
রারাবুম রারাবুম
রাতে কাজ দিনে ঘুম।।

গান শুনে অবাক হল শূয়র। আরে। কালো কুকুর কি তার কথাই বলছে? তাকেই ঠাট্টা করছে? কিন্তু, তা কি করে হবে? কুকুর তো তাকে চেনেই না।

গুটি গুটি শূয়র এগোল কুকুরের কাছে। শূযর বলল, 'বন্ধু তুমি কি আমায় চেনো? আমার নামে তুমি গান করছ কেন?'

কুকুর বলল, 'তোমার নামে? কই না তো! আমি যে আমার গান গাইছি। আজ কুড়ি বছর ধরে মনিবের চৌকিদার আমি। আমি তার খামার পাহারা দি। এ গান তো আমার গান।'

শূযর অবাক হল। কুড়ি বছর ধরে রাত জাগা! সে বলল, 'বন্ধু আমিও চৌকিদার, কিন্তু সাত দিন কাজ করে আজ ছেড়ে দিয়ে এসেছি। মাত্র সাড়ে তিন পেনি মাইনে। চলবে কি করে বল? তাই ছেড়ে দিলাম।'

সমস্ত দেহ কাঁপিযে কুকুর হেসে উঠল। বলল, 'সাড়ে তিন পেনি! বাঃ বেশ ভালো মাইনে বলতে হবে। আমি যখন প্রথম কাজে ঢুকি, আমার মাইনে ছিল এক পেনি। আর তুমি প্রথমেই সাড়ে তিন পেনি! জানো, এখন আমি মাইনে পাই পাঁচ পেনি।' কুকুর আবার গান গাইতে লাগল। হঠাৎ গান দিল থামিয়ে। রেগে গিয়ে বলল, 'তুমি কাজটা ছেড়ে দিয়ে এলে? তুমি কি পাগল? যাও, এখন মরগে না

খেয়ে ! কে তোমায় কাজ দেবে ?'

শূয়র বলল, 'বন্ধু, পেট ভরে না, রাত জাগতে পারি না। কি করি বল ?'

চুপ করে রইল কালো কুকুর। একটু পরে মুখ নামিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'বন্ধু, আমারও ঐ রকম হত। কিন্তু আজ সব সয়ে গিয়েছে। দিনে ঘুমোই, রাতে জাগি। আগে খুব খিদে পেত, আজ আর পায় না। আগে কত কি ভাবতাম। এখন অবশ্য আর ভাবি না। যাও ভাই, কাজ কর ; কাজ ছেড়ে দিও না। কোথাও পাবে না।'

আস্তে আস্তে কুকুর চলে গেল। শূয়র দেখল, কুকুরের কোঁচকানো চোখের কোণে জল চিক্‌চিক্ করছে।

শূয়র কিছুক্ষণ ভাবল। শেষকালে রওনা দিল আগের পথে। এগিয়ে আসছে ইঁদুরের বাড়ি। কাছে আসতেই শূয়র দেখল, সাদা ইঁদুর বাড়ির বাগানে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসছে।

শূয়র খাগারে ঢুকে পড়ল মাথা নিচু করে।

অভিপ্রায়

এই শতকের গোড়ার দিকে ওয়ালটার জেকিল নামে একজন লোকসংস্কৃতিবিদ জ্যামাইকার পাহাড়ী এলাকায় দীর্ঘদিন ছিলেন। তিনি লিখেছেন, জ্যামাইকায় প্রচুর কফি ও চকোলেট হয়, কিন্তু এখানকার কৃষক কফি ও চকোলেট খাওয়ার কথা চিন্তা করতে পারে না। তারা সপ্তাহে যা আয় করে তাতে কফি বা চকোলেট কেনা সম্ভব নয়। তারা সাধারণত দুধ-ছাড়া-জলে চিনি এবং লেবু, কমলালেবু, একধরনের ঘাস, দারুচিনি প্রভৃতির পাতা সেদ্ধ করে চায়ের মত খায়।

এই হল জ্যামাইকার কালো মানুষের আর্থিক চিত্র। প্রতিটি উপনিবেশের চিত্রও তাই। দেশের মাটিতে হাড়ভাঙা পরিশ্রমে তারা যা উৎপন্ন করে তার ভালো অংশ থাকে তাদের নাগালের বাইরে। খেটে-খাওয়া মানুষের দিন কাটে চরম অবহেলায়।

বাবা-মা সারা জীবনের মেহনতে ছেলেকে বড় করেন। সংসারের কঠিন বাস্তব অবস্থা তাই অল্পবয়সে কেউ বুঝতে পারে না। কিন্তু দায়িত্ব যখন নিজের ওপরে আসে তখনই মোহভঙ্গ ঘটতে থাকে। শোষণভিত্তিক পৃথিবী যে কি নিষ্ঠুর, এই বোধ ধীরে ধীরে জন্মায়। প্রথমে স্বপ্ন থাকে, কাজ ঠিক মিলে যাবে। কিন্তু তা তো হয় না। শেষকালে যে কাজ পাওয়া যায় তাতে পেট ভরে না, অমানুষিক খাটুনিতে দেহ ভাঙে।

তারপর একদিন সেটাও সয়ে যায়। পরিবেশের অনভিজ্ঞতার ফলে অল্পবয়সের ধর্মে কাজ ছেড়ে কেউ চলেও যায়। আবার অভিজ্ঞ মানুষের পরামর্শে অনন্যোপায় হয়ে পুরনো কাজে ফিরেও আসতে হয়। আলোচ্য পশুকথাটির মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে এই বেদনাময় জীবনের কাহিনী রয়েছে।

কালো শূয়র ও কালো কুকুর জ্যামাইকার নিপীড়িত মানুষের প্রতীক। সাদা ইঁদুর শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশবাদী, তার রয়েছে খামার। দেশের মানুষ জমি ও খামারের মালিক নয়, সে শুধু তার অল্পবেতনের কর্মচারী। শূয়র মাত্র সাত দিনের জন্য কাজ নিয়েছে, পরে ভালো কাজ খুঁজে নেবে। রাত জেগে পাহারার কাজ, কিন্তু উপায় কি ? কাজ ছেড়ে শূয়র যখন চলে যাচ্ছে, সাদা ইঁদুর তখন হাসছে। কেননা, সে জানে শ্রমিককে ফিরতেই হবে। আবার শূযর যখন ফিরছে, তখনও সে হেসে ওঠে। এ তো জানা কথাই। মাথা নিচু করে শূযর খামারে ঢুকে পড়ল। কি নির্মম এবং বাস্তব ছবি এঁকেছে উৎপীড়িত মানুষ !

কালো কুকুর আজ বৃদ্ধ। একই বৃত্তিতে নিযুক্ত থেকে সে জীবন প্রায় শেষ করে এনেছে। অভিজ্ঞতায় বুঝেছে, এ ছাড়া উপায় নেই, একে মেনে নিতেই হবে। ক্লান্ত দেহে সে গানও গায়। কিন্তু সে গানে থাকে কষ্টকর জীবনের মর্মভেদী হাহাকার। জীবনে যা সত্য, খেটে-খাওয়া মানুষের গানে তারই অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে। কুকুর এই জীবনকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিলেও দুঃসহ কষ্টকে সে ভুলবে কেমন করে ? তা কি ভোলা যায় ? তাই শূয়রকে উপদেশ দিযে চলে যাওয়ার সময তার কোঁচকানো চোখে জল চিক্‌চিক্ করে উঠেছে। যদি সম্ভব হত, এ জীবন থেকে সে মুক্তি চেযে অন্য কিছু করত। কিন্তু তার দেশে সেই সময়ে অন্য কিছু করা অসম্ভব।

শূযর যে গান শুনেছে তাতে রয়েছে তারই জীবনের সাত দিনের অভিজ্ঞতার কাহিনী। কিন্তু এ তো কোনো ব্যক্তি-বিশেষের কাহিনী নয। এ যে সমস্ত শোষিত মানুষের জমাট-বাধা ক্ষোভ, মিলিত বেদনা। যে দেশেই সে থাকুক না কেন তার কাহিনী এক। বহু দেশের মানুষ এসেছে জ্যামাইকায়, প্রত্যেকের মিলিত অভিজ্ঞতায় তাদের এই উপলব্ধি হযেছে। শোষণভিত্তিক সমাজে কাল অথবা দেশের তারতম্যে এই অভিজ্ঞতার কোনো হেরফের হয না। জ্যামাইকাতেও হয়নি।

এই পশুকথাটি এত স্পষ্ট যে এর অভিপ্রায় খুঁজতে খুব কষ্ট করতে হয় না। জ্যামাইকার কৃষক জনগণ প্রতিকূলতার মধ্যেও যেমন উচ্ছল থাকতে জানে, তেমনি জীবনের অভিজ্ঞতা স্পষ্ট করে বলে, বলতে ভালবাসে।

বাহামা দ্বীপপুঞ্জ

দেশ পরিচয়

তিন হাজার দ্বীপ ও উপদ্বীপ নিয়ে গড়ে উঠেছে বাহামা দ্বীপপুঞ্জ। বিশাল অতলান্তিক মহাসমুদ্রের মধ্যে ছোট্ট ছোট্ট তারার মত জেগে রয়েছে অসংখ্য দ্বীপ। এর মধ্যে বাহামা অ্যাবাকোল অ্যানড্রস ক্যাট ওয়াটলিং লং নিউপ্রভিডেন্স ক্রুকেড মায়াগুয়ানা একজুমা প্রভৃতি কয়েকটি বড় দ্বীপ। দেশের উত্তরে সমুদ্র,' দক্ষিণে কিউবা হাইতি ডোমিনিকান রিপাবলিক, পশ্চিমে ফ্লোরিডা আর পূর্বে রয়েছে বিস্তৃত সমুদ্র।

বহুকাল থেকে এই দ্বীপপুঞ্জ ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীদের শক্ত ঘাঁটি, জলদস্যুদের স্বচ্ছন্দ বিহারভূমি।

বাহামার সবচেয়ে বড দ্বীপ হল অ্যানড্রস, এর আযতন ষোল শত বর্গ মাইল। দ্বীপপুঞ্জ পাহাড়ী এলাকায় ভরা, জমি অত্যন্ত নিচু। চাষের উন্নত কোনো ব্যবস্থা না থাকায় জমির ফলন মোটেই ভালো হয় না। অবশ্য চাষযোগ্য জমিও বিশেষ বেশি নেই। দেশের মানুষের মূল উপজীবিকা বনভূমিতে কাঠ সংগ্রহ এবং চিংড়ি মাছ ধরা। উন্নত জাতের কাঠ এবং চিংড়ি বিদেশে রপ্তানি হয়।

রাজধানী নাসাউ শীতকালের মনোরম পরিবেশে পর্যটকে ভরে যায়। ইউরোপ আমেরিকা থেকে অসংখ্য পর্যটক এখানে বেড়াতে আসে। তাই এক বিশাল পর্যটন-শিল্প গড়ে উঠেছে। এই পর্যটন-ব্যবস্থা একদিকে যেমন বহু মানুষের রুজি-রোজগারে সাহায্য করছে, অন্যদিকে তেমনি পর্যটকদের উশৃঙ্খল ও উৎকট চরিত্র এখানকার মানুষের নৈতিক অধঃপতন ডেকে এনেছে। পর্যটনকেন্দ্রগুলো আজ উঞ্ছবৃত্তি এবং অনাচারের লীলাক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ব্রিটিশ ডাচ পর্তুগীজ ফরাসী জার্মান স্পেনীয় প্রভৃতি উপনিবেশগুলোর মানুষের যে কাহিনী, বাহামা দ্বীপপুঞ্জ তার ব্যতিক্রম নয়। বরং বলা যেতে পারে, এখানে শোষণ ও অবিচার এবং মানুষের দুঃখকষ্ট আরও বেশি। কেননা অন্যান্য উপনিবেশের তুলনায় এখানকার সম্পদ বড় কম। মানুষের দারিদ্র্য তাই মাত্রাতিরিক্ত।

কুড়িটি দ্বীপে যে এক লক্ষ কুড়ি হাজার কালো মানুষ বসবাস করে, তাদের অধিকাংশই অতীত ক্রীতদাসদের উত্তরপুরুষ। অন্যান্য উপনিবেশে কালো মানুষদের যে

অবস্থার কথা আগে বলেছি, বাহামা দ্বীপপুঞ্জের মানুষদের বিবরণও তাই। জন্মভূমি থেকে উৎখাত হয়ে নিজেদের শিল্প-সংস্কৃতিকে বিসর্জন দিয়ে এক নতুন জনগোষ্ঠীতে পরিণত হতে তারা বাধ্য হয়েছে।

দেশে রয়েছে প্রতিনিধিমূলক সরকার, তার সঙ্গে নির্বাচিত বিধানসভাও আছে।

প্রায়ই সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ে এইসব দ্বীপপুঞ্জের প্রভূত ক্ষতিসাধিত হয়। বৃষ্টিপাত হয় মাঝারি ধরনের।

বাহামা দ্বীপপুঞ্জের আয়তন ৪,৪০৪ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ১৩৬,২২৯ জন।

পশুকথা

রাঙামুখো বানর ও বুনো গোরু

রাঙামুখো বানরের বাবার বিরাট কাঠের বাড়ি, বাড়ি খুব উঁচু, গাছের মাথার সমান। সামনে-পেছনে এদিকে-ওদিকে অনেকটা বাগান। কত গাছ সেই বাগানে।

একদিন বানর বনের পথে রওনা দিল। বাড়িতে বলে গেল, তার ফিরতে দেরি হবে, খুব জরুরী কাজে সে বেরুচ্ছে। তার হাতে এক বিরাট চামড়ার থলে। তার মধ্যে রয়েছে খুব সুমিষ্ট মদ। বানর চলেছে, পিঠে ঝুলছে মদের থলে।

বন ক্রমশ ঘন হচ্ছে। পাহাড়ও এগিয়ে আসছে। পাহাড়ী বনে রাঙামুখো বানর গুনগুন করে গান করতে করতে হাঁটছে। অনেক দূর এসে সে একটা গাছের তলায় বসল।

এমন সময় দেখে পাশের ঝরণায় তিনটে গোরু জল খাচ্ছে। তাকে দেখেই গোরুগুলো পালাতে চেষ্টা করল। পালাতে দেখেই বানর বলল, 'বন্ধু, তোমরা পালাচ্ছ কেন? আমি তো তোমাদের বন্ধু! আমায় ভয় কি? আমার বড্ড তেষ্টা পেয়েছে, আমাকে একটু জল দেবে?'

গোরুগুলো বুনো, তারা সরল। তার ওপরে একজন জল খেতে চেয়েছে, জল না দিলে যে বড় অন্যায় হবে। তাই আর না পালিয়ে তারা বানরকে জল দিয়ে বলল, 'তুমি তো আমাদের মত দেখতে না, তাই আমরা ভয় পেয়েছিলাম।'

অল্প একটু জল খেয়েই মুখ বেঁকিয়ে বানর বলল, 'ইস্, তোমরা এই জল খাও?

এ তো একটুও মিষ্টি নয়! এসো, আমার জল খেয়ে দেখ।'

গোরুরা অবাক হল। জল আবার অন্যরকম হয় নাকি! বানরের দেওয়া জল খেয়ে তারা আরও অবাক হল। এত সুন্দর, এত মিষ্টি! দেহমন ভরে গেল। তারা ঠোঁট-জিভ চাটতে লাগল।

বানর বলল, 'কি, বলিনি? আমার জল মিষ্টি না?'

গোরুরা স্বীকার করল। বানর তাদের আর একবার তার জল খেতে দিল। গোরুরা খাচ্ছে, আমেজে তাদের চোখ বুঁজে আসছে।

এই সময় বানর বলল, 'তোমরা আমার ভাই, আমার বন্ধু। চল না আমাদের বাড়ি, সেখানে এমন মিষ্টি জলের নদী রয়েছে। কত খাবে? চল না আমার সঙ্গে।'

গোরুরা তো সরল, অতশত বোঝে না। তারা বানরের পেছন পেছন রওনা দিল। যেতে যেতে বানর বলল, 'একটা কথা, আমার বাবা খুব বদরাগী। তা সে কিছু না। তোমাদের দু'চার কথা বললেও কানে তুলো না। কিছু করলেও চুপ করে থেকো। দু'দিন পরেই ঠিক সয়ে যাবে। ওরকম তো হয়ই।'

গোরুরা ভয় পেল, আবার অভয়ও পেল। তারা বন পেরিয়ে এগোতে লাগল।

বিরাট বাগানের কাঠের দরজা পেরিয়ে চারজন ঢুকল। গোরুদের দাঁড়াতে বলে বানর বাড়ির মধ্যে চলে গেল।

একটু পরে তিনজন রাঙামুখো বানর বেরিয়ে এল। তাদের হাতে বুনো গাছের লম্বা মোটা লতার দড়ি। তিনজন চলে এল গোরুদের কাছে। তাদের গলায় দড়ির ফাঁস পরিয়ে দিল। তারপরে বেরিয়ে এল তাদের বন্ধু বানর।

গোরুরা বলল, 'বন্ধু, গলায় লতার দড়ি কেন?'

বানর বলল, 'ও কিছু নয়। তোমাদের তো বলেছি, বাবা বদরাগী, ওরকম একটু হবেই। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

গোরুরা বিশ্বাস করল। তাদের টেনে নিয়ে যাওয়া হল বাড়ির পেছনে ভাঙাচোরা একটা ঘরে। বিরাট মোটা কাঠের সঙ্গে তাদের বেঁধে রাখা হল।

একদিন যায়, দু'দিন যায়, বানর আর আসে না। তাদের খেতে দেওয়া হয় দুর্গন্ধ খাবার। কোথায় গেল সেই মিষ্টি জলের নদী? গোরুরা ভাবে, গলার দড়ি দেখে অবাক হয় তাদের। জীবনে তো কাউকে তারা দড়িবাঁধা দেখে নি? কোথায় গেল বানর? এইসব তারা ভাবে।

বেশ কয়েকদিন কেটে যাবার পরে একদিন ভোরবেলা বানর এল। তার হাতে লম্বা মতন একটা দড়ি। বানর এসে বলল, 'তোমরা তো এখন থেকে এখানেই থাকবে।

তা শোন, খাওয়া-দাওয়ার কোনো চিন্তা নেই। এখন তোমাদের আমার সঙ্গে বনে যেতে হবে। ওখানে অনেক কাঠ কেটে সন্ধ্যের সময় বয়ে নিয়ে আসতে হবে। এখন তাহলে গলার বাঁধন খুলে দি, কি বল ?

গোরুরা অবাক হল। এ কি সেই বানর ? আমরা কি তাহলে আর কোনোদিন আমাদের বাড়ি যেতে পারবো না ?

তারা বলল, 'আমরা এখানে থাকতে চাই না। আমাদের ছেড়ে দাও, আমরা বাড়ি চলে যাব। আমাদের কাজ করেও দরকার নেই, খেয়েও কাজ নেই।'

হাঃ হাঃ করে দাঁত বের করে হাসতে লাগল বানর। হাসি থামিয়ে চোখ পাকিয়ে বলল, 'সেটি হচ্ছে না, আর কোনোদিন বাড়ি যেতে পারবে না। এখন কাজে চল।'

'যাব না', গোরুরা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল।

সপাং করে চাবুক এসে পড়ল একজনের চোখে। একি ? এই দড়িতে এত লাগে ? কোনোদিন তো এরকম দেখিনি ? আবার সপাং শব্দ…আবার… আবার। বানর চিৎকার করছে আর মারছে। এমন সময় খুব কাছে আসতেই একটা গোরু শিং দিয়ে মেরেছে এক গুঁতো, ছিটকে পড়ল বানর।

মাটি থেকে উঠেই বানর বেরিয়ে গেল। গোরুরা ভাবছে কি করবে। এ কি হল ? আবার ফিরে এল বানর, তার হাতে মস্ত বড় চক্‌চকে অস্ত্র। বানর ঢুকেই একটা গরুর মাথায় মারল সেই অস্ত্র, বুনো তৎপর গোরু মাথা সরিয়ে নিল। অস্ত্র লাগল কাঠে, পায়ের ওপর ঠিক থাকতে না পেরে বানর গেল পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড লাথি মারল একটা গোরু, ছিট্‌কে পড়ল বানর। সে কাতরাচ্ছে।

সমস্ত শক্তি দিয়ে বাঁধন ছিঁড়তে চেষ্টা করল তারা। পটাং করে দড়ি গেল ছিঁড়ে। বাগানের মধ্যে দিয়ে ছুটে বেড়া ভেঙে তিনজন ছুটে চলল বনের পথে, রাঙামুখো বানরের দিকে একবারও ফিরে তাকাল না।

পাহাড়ী বনে এসে তারা হাঁফ ছাড়ল। অনেক কষ্টে অন্য গোরুরা তাদের গলার দড়ি দাঁত দিয়ে কেটে দিল। সেদিন থেকে তারা সবাই সাবধান হল। রাঙামুখো বানর দেখলেই তারা আরও গভীর পাহাড়ী বনে ঢুকে পড়ত।

অভিপ্রায়

এই পশুকথাটি বাহামার আদি-অধিবাসীদের নিজস্ব গল্প। উদ্বাস্তু হয়ে ক্রীতদাসত্ব বরণ করে এখানে যারা এসেছিল তারা এ পশুকথা সৃষ্টি করে নি। উপনিবেশে আমার পরে

শাসকেরা সেখানকার মানুষকে ধরে এনে কাজে লাগায়। প্রথম দিকে বন্ধুর মত ব্যবহার করে তাদের ফাঁদে ফেলে। পরে বুঝতে পারে, তারা বিদেশী শাসকের ক্রীতদাস ছাড়া আর কিছু নয়। গল্পের শেষে রয়েছে গোরুরা আরও গভীর পাহাড়ী বনে ঢুকে পড়ছে। বহু উপনিবেশের কাহিনী হল, বিদেশী শাসকের অত্যাচারে দেশীয় জনগণকে হটতে হটতে দেশের গভীর প্রত্যন্ত প্রদেশে গিয়ে ঠাঁই নিতে হয়েছে। এখানেও তার আভাস রয়েছে। আর গোরুরা বুনো, রাঙামুখো বানর তাদের মত নয়—এসব স্মৃতির মধ্যেও রয়ে গিয়েছে আদি-অধিবাসীদের কথা। এইরকম উপনিবেশে আদিবাসীদের সংখ্যাল্পতা ও তাদের স্বাতন্ত্র্যবোধ শাসকদের ভাবিয়ে তোলে। যে পরিমাণ শ্রমদাস দরকার তার অভাব, আবার যারা আছে তাদের অনুগত করাও শক্ত। তাই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল অন্য ভূখণ্ড থেকে ক্রীতদাস আমদানীর।

যাই হোক, এই পশুকথাটির বক্তব্যও খুব স্পষ্ট। বুনো গরু এবং তাদের সারল্য, অপরিচিতকে দেখে হতচকিত ভাব, তৃষ্ণার্তের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি প্রভৃতির মধ্যে আদিবাসীদের চিহ্নিত করা হয়েছে। অন্যদিকে বিরাট খামারের মালিক রাঙামুখো বানর উপনিবেশবাদী কোনো খামার-মালিকের প্রতীক। বন থেকে কাঠ কেটে ব্যবসা করাই তার কারবার। একাজে শ্রমিক দরকার, কিন্তু তা জোগাড় করা সহজ নয় বলেই অসাধুতা ও প্রবঞ্চনার আশ্রয় নিতে হয়েছে।

এইসব আদিবাসী মানুষের জীবন নিতান্ত সাধারণ, সরল তাদের মন। কিন্তু অভিজ্ঞতায় তারা বুঝেছে, কিছু অত্যাচারী মানুষ তাদের সরলতা ও দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে লোভ দেখায়। আপাতত তাকে খুব মোহময় মনে হয়, কিংবা পেটের জ্বালা লোভের জালে জড়িয়ে পড়তে সাহায্য করে। যাই হোক না কেন, শেষ পরিণাম বড় তিক্ততায় ভরা।

রাঙামুখো বানর মদের লোভ দেখিয়ে বুনো গোরুদের বশ করেছে। মদের প্রতীকটি বড় সুন্দর। এই মদ মানুষকে তার সহজ সরল জীবন থেকে উৎপাটন করে বড় অসহায় অবস্থায় নিয়ে যায়। তাই শোষকদের কয়েকটি অস্ত্রের মধ্যে অন্যতম হল মদ। যেখানেই গিয়েছে এই উপনিবেশবাদী শক্তি, সেখানেই বাসা বেঁধেছে ব্যাভিচার, কুৎসিত রোগ, সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় বিভেদ এবং দেহক্ষয়কারী মাত্রাতিরিক্ত পানাসক্তি। এখানেও লোভের মাধ্যম হয়েছে মিষ্টি মদ, যার পরিমাণে গোরুদের গলায় পড়েছে ফাঁস, ক্ষুধায় জুটেছে দুর্গন্ধ খাবার, বন্য স্বাধীনতার বিনিময়ে এসেছে আজীবন শ্রমদাসত্ব! আর এই স্বাধীনচেতা মানুষকে ফাঁদে ফেলতে বন্ধু ও ভাইয়ের মত ব্যবহার করতে হয়েছে। কিন্তু হাতের মুঠোয় আসার পরেই বানরের অন্য মূর্তি। খামার-মালিক চরিত্রের আশ্চর্য

প্রতিনিধি। খুব কাছ থেকে না দেখলে এমন চরিত্র আঁকা সম্ভব নয়।

তারা স্বাধীন, অন্যকে পরাধীন করতে শেখেনি। তাই গলার দড়ি দেখে বুনো গোরুরা অবাক হয়, এমন তো কোনোদিন দেখেনি। অন্যদিকে শোষকশক্তির একমাত্র উদ্দেশ্য অন্যকে পরাধীন করা। দুটি ছবিই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে পশুকথাটিতে।

পরাধীনতা ও ক্রীতদাসত্বের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা রয়েছে বলেই এই আদিবাসী মানুষ গল্পের শেষে বানরের ফাঁদ থেকে মুক্তির কথা শোনাতে পেরেছে। রাঙামুখো বানরের বিপর্যস্ত অবস্থার মধ্যে তাদের তীব্র ঘৃণার প্রকাশ ঘটেছে। তারা আরও আরও দূরে, দুর্ভেদ্য অরণ্যে সবে যেতেও রাজি, তবু গলায় বাঁধন পরতে রাজি নয়। সেই পাহাড়ী আরণ্যক পরিবেশে অর্ধাহার-অনাহার হয়তো হবে তাদের নিত্যসঙ্গী, কিন্তু সেটা হলেও তাদের পরমপ্রিয় সহজ স্বাধীনতা তো কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। এই কামনাই রয়েছে পশুকথাটির শেষে।

পশুকথা ঃ

অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ

অস্ট্রেলিয়া/তাসমানিয়া

দেশ পরিচয়

ইউরোপের কোনো দুঃসাহসী দেশ-আবিষ্কারক অভিযাত্রী এই মহাদেশ আবিষ্কার করেন নি। একদল লোভী বণিক মরিচ এবং গরম মশলার খোঁজ করতে করতে সন্ধান পায় অস্ট্রেলিয়ার। সন্ধানীদের মধ্যে ছিল স্পেন পর্তুগাল হল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের অধিবাসীগণ। তবে কে প্রথম এই দেশ দেখেছিল তার হদিস দেওয়া সম্ভব নয়। এই বণিকদল ইচ্ছে করে ভুল মানচিত্র তৈরি করত, তাদের অনুসন্ধান গোপন করে রাখত, সেই আবিষ্কৃত দেশ সম্পর্কে বিদ্‌ঘুটে বীভৎস গল্প রটাত। উদ্দেশ্য খুব স্পষ্ট—লুণ্ঠনের স্বর্গভূমিতে যেন অন্য কেউ ভাগ বসাতে না পারে। তবে অনেকে অনুমান করেন, কোনো পর্তুগীজ কিংবা স্পেনীয় বণিক প্রথম এই দেশ দেখেছে, কেননা ১৫২০ সাল নাগাদ তারা অজানা দক্ষিণ সাগরে প্রবেশ করে। প্রথম মানচিত্রে অস্ট্রেলিয়ার সমুদ্রতীরবর্তী সমস্ত স্থানের নামও রয়েছে পর্তুগীজ ভাষায়।

এইভাবেই চলেছে দেড়শ' বছর। উত্তর ও পশ্চিম তীরে আনাগোনা করল ছোট ছোট জাহাজ। তারপরে মঞ্চে এল ইউরোপের সবচেয়ে ধূর্ত সাম্রাজ্যবাদী দেশ ইংলণ্ড। যে মানুষটির পরিচালনায় এটা ঘটল, তিনি হলেন ক্যাপটেন উইলিয়ম ড্যামপিয়ের। এই বিচিত্র চরিত্রের মানুষটির জন্ম ১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দে এবং মারা গিয়েছেন ১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি ছিলেন মূলত জলদস্যু লুণ্ঠনবাজ কলহপ্রিয় মাতাল ও নৃশংস অত্যাচারী। এই সঙ্গে তার অন্য একটি গুণ অবশ্যই ছিল, তা হল তিনি সত্যিই পণ্ডিত মানুষ ছিলেন। পাণ্ডিত্যের সঙ্গে তার নাকি কবিমনও ছিল। তিনি সামুদ্রিক পাখি দেখে হয়তো বিস্মিত হয়েছেন, পর মুহূর্তে শত্রু জাহাজ আক্রমণ করে পুড়িয়ে তাকে ডুবিয়ে দিয়েছেন। মাটির ওপরে ফুলের গন্ধে বিভোর হয়েছেন, একটু পরেই আদিবাসীদের গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছেন। স্বভাবতই উপনিবেশ প্রসারের ক্ষেত্রে যোগ্যতম ব্যক্তি তিনি। কিন্তু তার সঙ্গে যারা এই নতুন দেশে এলেন তাদের মানবিক বৃত্তিগুলো ড্যামপিয়ের-এর চেয়ে আদৌ উন্নত ছিল না। এই জলদস্যুর দল নতুন উদ্যমে এখানে আসতে লাগল। তারপরে আরও একটি অভিশাপ এই দেশকে গ্রাস করল। অস্ট্রেলিয়া হল ইংলণ্ডের সাগরপারের স্বাভাবিক জেলখানা। ১৭৮৭ সালের ১৩ মে

ইংলণ্ডের বন্দর থেকে ক্যাপটেন আর্থার ফিলিপ ৬টি কিশোর ও ৫টি কিশোরীসহ ৭৭১ জন মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামী নিয়ে রওনা হলেন, অষ্ট্রেলিয়ার তীরভূমিতে পৌঁছলেন ১৭৮৮ সালের ১৮ জানুয়ারী। নতুন দেশে নতুন জীবন শুরু হল।

উপনিবেশবাদীরা নতুন উপনিবেশে গিয়ে সেখানকার আদি-অধিবাসীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করে—এ ইতিহাস সবার জানা। আবার আদি-অধিবাসীরাও অনেক সময় বহুদূরে সরে গিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে জীবন কাটায়, কোথাও ক্রীতদাস হিসেবে বৃহত্তর সমাজের একজন হয়ে শোষণের জোয়াল বইতে থাকে। কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ার অন্য ইতিহাস। শোনা যায়, আফ্রিকার কঙ্গোতে সম্রাট লিওপোল্ড উপনিবেশিক অত্যাচারের এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। নিউজিল্যাণ্ডের মাওরি আদিবাসীদের ওপরেও বীভৎস অত্যাচার করা হয়। কিন্তু সব ইতিহাস তুচ্ছ হয়ে যায় অষ্ট্রেলিয়ার কাছে।

একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। উপনিবেশে এসে নতুন বাসিন্দারা যার যেমন খুশি জমি নিয়ে নিল। সেখানে তারা ফসল বুনল। অষ্ট্রেলিয়ার আদি-অধিবাসীরা একদিন দেখল, মাঠ ভরে ফসল ফলে আছে। তারা ফসলের জমিতে নেমে হয়তো কল খাচ্ছে কিংবা ফসল সংগ্রহ করছে। তারা জানে, জমিতে যা হবে সব মানুষ তা ভাগ করে খাবে। হঠাৎ নতুন বাসিন্দারা এসে গুলি করে সব ফসল-সংগ্রহকারীকে মেরে ফেলল। হাসতে লাগল তারা, উল্লাসে ফেটে পড়ল, এ যেন শত শত ক্যাঙারু শিকারের আনন্দ। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না, তবু অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের জীবনে এ ঘটনা প্রতি মুহূর্তের, প্রতিদিনের।

কিন্তু কেন? অন্য উপনিবেশের মত এখানকার আদিবাসীরাও তো ধীরে ধীরে শ্রমদাস হতে পারত। কিন্তু কেন তা ঘটে নি? বলা হবে, আদিবাসীদের 'বর্বর মানসিকতা' এমনই যে তারা সমাজের একজন হতে চায় নি। একথা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠত যদি আজকে উন্নত অষ্ট্রেলিয়ায় অন্য চিত্র দেখতাম। আজকের অষ্ট্রেলিয়া শিল্পে বানিজ্যে সংস্কৃতিতে যথেষ্ট এগিয়ে গিয়েছে। দেশে খনিজ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ এত প্রচুর পরিমাণে মজুত রয়েছে যে অন্যের মুখাপেক্ষী না হয়েও তারা আরও তিনশো বছর স্বচ্ছন্দে কাটাতে পারে। পৃথিবীর সর্বদেশের মানুষকে তারা আহ্বান জানাচ্ছে, নাগরিক হবার সুযোগ দিচ্ছে, এমন কি কালো এশিয়াবাসীকেও তারা গ্রহণ করছে। কিন্তু যাদের দেশ এরা দখল করেছে, সেই আদি-বাসিন্দারা এখন কেমন আছে অষ্ট্রেলিয়ায়? বস্তুত আদিবাসীরা থাকে বর্তমান সরকারের 'কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে'। আক্ষরিক অর্থে তাই, বরং তার চেয়েও বীভৎস। কেননা এদের হত্যা করা হয় না, ধীরে ধীরে এরা যাতে অবলুপ্ত হয়ে যায়,

পৃথিবীর প্রাচীনতম জনগোষ্ঠী যাতে আবদ্ধ থেকে বিলুপ্তির দিকে এগিয়ে যায় তারই বৈজ্ঞানিক কৌশলী প্রয়াস। আজ তো তাদের সেই 'বর্বর দশা' নেই, কিছু আদিবাসী মহান কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ অস্ট্রেলিয়াবাসীর সাহচর্যে শিক্ষা পেয়েছেন, বড় খেলোয়াড় হয়েছেন, বড় পদে কর্মরত রয়েছেন। অর্থাৎ কালের পরিবর্তনে, পরিবেশের প্রভাবে তারাও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছেন। তবু আজও কেন হাতে গুনতি অল্প কয়েকজন ছাড়া সবাইকে অবলুপ্তির পথে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে? এ হচ্ছে মানসিকতার প্রশ্ন। এটাই সেই উপনিবেশবাদী দম্ভ, যে ঐতিহ্য আজও তারা বহন করে চলেছে।

অস্ট্রেলিয়ার আদি-অধিবাসী কারা? প্রথম উপনিবেশবাদীদের প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, তারা গিয়ে কোনো ফসলের জমি দেখে নি। অর্থাৎ পশু ও মাছ শিকার, বন্য ফল ও গাছের মূল প্রভৃতিই ছিল অস্ট্রেলিয়ার আদি অধিবাসীদের খাদ্য। সেসব প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত, তাই বোধহয় কৃষির প্রতি তাঁদের কোনো আগ্রহ জন্মায় নি।

পৃথিবীতে আদিমতম জনগোষ্ঠীর স্পষ্ট নিদর্শন এরা। অনেকেই বিশ্বাস করেন দশ হাজার বছর আগে এই জনগোষ্ঠী ধীরে ধীরে মালয়ের পথ বেয়ে ভারত থেকে এখানে আসে। বর্তমানে তারা অধিকাংশই উত্তরাংশের অরণ্য এলাকায় বাস করে। ভবঘুরে চরিত্রের অবসান ঘটেছে বর্তমান সরকারের বিধিনিষেধে। অবশ্য বিচ্ছিন্ন হয়ে শোচনীয় অবস্থায় বাস করলেও তাদের নিজস্ব সামাজিক আইনকানুন রয়েছে, নিজের ধর্ম রয়েছে, রয়েছে তাদের লোকনৃত্য ও লোকসাহিত্য। একদিন তাদের সংস্কৃতি উন্নত ছিল, কিন্তু আজ তারা সব কিছুই ভুলতে বসেছে, তাদের ভুলে যেতে বাধ্য করা হচ্ছে। তবু সংহত সমাজ বলেই এখনও তাদের সংস্কৃতির বিলোপ ঘটে নি।

জল থেকে জেগে-ওঠা পৃথিবীর এই প্রাচীনতম ভূখণ্ডের মানুষকে পলিনেশীয় এশিয় মালয়ী নিগ্রো বা অন্য কোনোভাবেই চিহ্নিত করা যাবে না। ভূতাত্ত্বিকেরা বলেন, একসময় নিউ-গিনি অ্যান্টার্কটিকা ও উত্তর আমেরিকার সঙ্গে এই ভূখণ্ডের যোগ ছিল, যদিও দীর্ঘদিন আগেই তা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। তাই আদিমতম সব কিছুরই দেখা পাওয়া যায় এখানে।

অস্ট্রেলিয়ার নিচে একটি দ্বীপ রয়েছে। তাসমানিয়া। ১৮০৩ সালে ব্রিটিশরা এখানে আসে। ১৮৫৬ সালে এখানে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তার আগে নিউ সাউথ ওয়েলসের অধীন ছিল। এখানকার ঔপনিবেশিক কাহিনীও একই।

আজকের অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের লোককথা বিস্মৃতির অতলে, সামান্য কিছু বেঁচে রয়েছে। পশুকথার সংখ্যাও খুব কম। যেভাবে তারা রয়েছে তাতে সংস্কৃতি

বাঁচতে পারে না। 'দুষ্টু এমু ও কাক-বৌ' পশুকথাটি শোনা যাবে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার কিম্‌বারলে, উত্তরের পাহাড়ী বনভূমি এবং দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার হোয়াইআল্লা অঞ্চলের আদিবাসীদের কাছে। আর 'জোট বেঁধে পায়রা ওড়ে' পশুকথাটি তাসমানিয়ার আদিবাসীদের মধ্যে থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

পশুকথা

দুষ্টু এমু ও কাক-বৌ

ওরা তিনজন বেড়াতে বেরিয়েছে। এমু আর তার দুই কাক-বৌ। ওরা বন-নদী-পাহাড় দেখে দেখে ঘুরছে। যত নতুন নতুন জায়গা দেখছে, ততই অবাক হচ্ছে। ওরা আরও এগিয়ে যাচ্ছে।

একদিন তিনজন যাচ্ছে সরু নদীর পাশ দিয়ে। হঠাৎ কালো মেঘ দেখা দিল আকাশের কোণে। মেঘ এগিয়ে আসছে নিচে, আরও নিচে।

এমু চমকে উঠে বলল, 'আরে, বৃষ্টি এল ব'লে। আর তো এগুনো ঠিক হবে না! এখানেই আস্তানা করি। লেগে পড় তাহলে।' কাক বৌ দুজনেই মাথা নেড়ে সায় দিল। কেননা, চারদিক বেশ অন্ধকার হয়ে আসছে, হয়তো এখুনি আকাশ ফুঁড়ে জল নামবে।

এদিক ওদিক থেকে কয়েকটা শুকনো কাঠ আর গাছের বাকল নিয়ে এল তারা। শুকনো কাঠ নরম মাটিতে দিল পুঁতে, তার ওপরে চড়িয়ে দিল গাছের বাকল। বেশ চলনসই একটা ঘরের মত হল। অন্তত, বৃষ্টির হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। আকাশে মেঘের ফাঁকে আলো চম্‌কে যাচ্ছে, ঘন ঘন শব্দ হচ্ছে। বৃষ্টি এল ব'লে।

এমু বৌদের বলল, 'এক কাজ কর। ঘরের চারপাশেও কয়েকটা বাকল দিয়ে দাও, তাহলে পুরোপুরি ঘরও হবে, গায়ে জলও লাগবে না। সেটাই ভালো।' বৌ দুজন মাথা নেড়ে সায় দিল।

ঘর তৈরি সবে শেষ হয়েছে, চড়্‌বড়্‌ করে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামল। ঘরের

পাশ দিয়ে জল বয়ে যেতে লাগল নিচু নদীর দিকে।

কি এক দুষ্টু বুদ্ধি চাপল এমুর মাথায়। অনেকক্ষণ কাজকর্ম না করে সে শুধুই বসে রয়েছে। অনেক দূরের পাহাড়টা আবছা দেখা যাচ্ছে, বৌ দুজন ঘরের ফাঁক দিয়ে তাই দেখছিল। সেই সময় তারা যাতে দেখতে না পায় এমনভাবে এমু একটা কাঠের খুঁটিতে মারল এক লাথি। নরম মাটিতে খুঁটিটা বেঁকে যেতেই বাকলের ঘর একদিকে কাত হয়ে পড়ল। ভয় পেয়ে তারা এমুর দিকে তাকাল। এমু এমন ভাব করল যেন সেও অবাক হয়ে গিয়েছে। কেন এমন হল? এমু চোখ আরও ছোট করে বলল, 'আঃ, কি সর্বনাশ হয়ে গেল। জলের জ্বালায় তো আর পারা যায় না। যাও, যাও, তাড়াতাড়ি খুঁটিটা তুলে ছাদটাকে ঠিক করে ফেল। যাও, দেরি কোর না।'

বৌরা আর কি করবে। তাড়াতাড়ি দুজন বাইরে গিয়ে ভিজে ভিজেই খুঁটি সোজা করতে লেগে গেল। প্রচণ্ড বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজ করা যে কত কষ্টের তা তোমরা বুঝবে। দেহের পালক ভিজে ভারী হয়ে উঠল, চোখে জল বিঁধছে তীরের মত, পা পিছলে পিছলে যাচ্ছে,—তবু কাজ তো করতেই হবে। অনেক কষ্টে ছাদটাকে প্রায় তারা ঠিক করে এনেছে। এমন সময়, ...ঘরের আর একটা পাশ হেলে পড়ল। ভয়ে চমকে উঠল বৌরা। আবার ওদিকটাও ঠিক করতে হবে? আসলে, এপাশের খুঁটি ঠিক হতেই অন্য পাশের খুঁটিতে এমু মেরেছে এক লাথি। বাইরে থেকে বৌরা কিন্তু এমুর শয়তানি কিছুই বুঝতে পারল না। বুঝবেই বা কেমন করে?

তারা এপাশে চলে এল। ঠিক করতে লাগল এধারের কাত-হয়ে-পড়া খুঁটিটা। এদিকে বিকেল শেষ হয়ে অল্প অল্প অন্ধকার নামছে। ভেতরে জমা-করা টুকরো কাঠে আগুন জ্বালিয়েছে এমু। বেশ গরম হয়েছে ভেতরটা। আরামে বসে রইল এমু। আর বাইরে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে ছাদ ঠিক করছে দুই বৌ, তারা ঠক্ঠক্ করে কাঁপছে।

এমনি করে কাক-বৌ দুজন যখন এপাশ ঠিক করে, তখন আর এক দিক কাত হয়ে পড়ে। আবার ওপাশ ঠিক করলে এধারের খুঁটি যায় হেলে। এমনভাবে বহুবার ঠিক করবার পরে বৌদের কোন সন্দেহ হল। অন্য কিছু নয়তো? একইরকম হচ্ছে কেন? এমুও তো কোনো সাড়াশব্দ করছে না। তবে? তারা দুজনে যুক্তি করল। খুব কষ্ট হলেও এইবার একজন খুঁটি ঠিক করবে আর অন্যজন ফাঁক দিয়ে ভেতরে নজর রাখবে। ভেতর থেকে কিছু হচ্ছে কিনা সেটাও দেখা দরকার।

এক কাক-বৌ খুঁটি ঠিক করছে, অন্য কাক-বৌ ঘরের ফাঁকে চোখ লাগিয়ে নজর রাখছে। বৌ দেখল, এমু খুব হাসছে আর মনের খুশিতে ঘরের এদিক থেকে ওদিকে হেঁটে বেড়াচ্ছে। ঐ পাশটা উঁচু হতেই এমু এদিকে এসে একটা সোজা খুঁটিতে মারল

লাথি। লাথি মেরেই তার কি হাসি, দুবার লাফিয়ে নিল, পাখা ঝাপটে নিল। তারপর গিয়ে বসল আগুনের পাশে। এক বৌ যে সব দেখছে তা এমু বুঝতে পারল না। এমু ভাবছে, কি মজা! বৌরা কেমন জলে-শীতে কষ্ট পাচ্ছে, এদিকে তো আমার শুকনো খাবার আগুনে পুড়ে তৈরি হয়ে গেল। একাই খাব।

এই কাণ্ড না দেখে বৌ ছুটে গেল অন্য বৌয়ের কাছে। সব খুলে বলল তাকে। তারা যুক্তি করল, এমুকে এমন সাজা দিতে হবে যাতে সে তার শয়তানী-খেলার মজাটা টের পায়। অন্যকে কষ্ট দেওয়ার শাস্তিটা তাকে ভালভাবে পেতে হবে।

বৌ দুজন মাছের মত ঢুকে পড়ল ঘরে। দুটো শুকনো বাকলে তুলে নিল কাঠের গনগনে আগুন। এমু দেখতে পায়নি। সে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়েছিল। শুয়ে শুয়েই দেহ কাঁপিয়ে হাসছে। বৌ দুজন সোজা চলে এল এমুর পাশে।

পাশে দাঁড়িয়েই তারা চেঁচিয়ে উঠল, 'এইবার? এইবার কোথায় যাবে? বাইরে বৃষ্টিতে শীতে আমরা যেমন কষ্ট পেয়েছি, তুমি এইবার গরমে তেমনি কষ্ট পাবে। ছাখো মজা।' এই না বলে তারা একসঙ্গে বাকল ভরা কাঠকয়লা ঢেলে দিল এমুর গায়ে। ভয়ে-যন্ত্রণায় এমু লাফিয়ে উঠল, চিৎকার করে আবার শুয়ে পড়ল, পালক পুড়ে কয়লা দেহের এখানে-ওখানে বসে গেল. ব্যথায় কঁকিয়ে উঠে সে দু'পায়ের ফাঁকে লেজ ঢুকিয়ে কয়েকবার পাক খেল। শেষকালে মুখ ব্যাজার করে গলাটাকে লম্বা করে বর্শার মত সুড়ুৎ করে দৌড় দিল বাইরে ঝম্‌ঝম্‌ বৃষ্টির মধ্যে। তার পালাবার ভঙ্গি দেখে বৌ দুজন হেসেই কুটিকুটি।

অভিপ্রায়

যাযাবর পশুপালক জনগোষ্ঠী তখনই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পেরেছে যখন তারা কৃষিকাজ করতে শিখল। কিন্তু কৃষিকাজ জানা সত্ত্বেও অনুর্বর মাটির জন্য ও বৃষ্টির অভাবে কৃষকসমাজকেও যাযাবরের মত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরতে হয়েছে। এইরকম গোষ্ঠী কিছুটা পশুপালক কিছুটা পশুশিকারী, যদিও মূলত তাদের সমাজ কৃষিভিত্তিক।

আলোচ্য পশুকথাটিতে এই অবস্থার স্মৃতি রয়ে গিয়েছে। এমু চলেছে তার সংসার নিয়ে। নিষ্ঠুর প্রকৃতি কিংবা ঊষর মাটির প্রতি তাদের সহজাত টান থাকতে পারে না,

পেটের ক্ষুধা তাদের উদ্বাস্তু হতে বাধ্য করেছে। তাই অচেনা-অজানা পথে না গিয়ে উপায় কি ?

কত সাধারণ তাদের জীবনযাত্রা! সামান্য আস্তানা গড়েই তারা সুখী। অষ্ট্রেলিয়ার নিদারুণ পরিবেশে আদিবাসীরা এভাবেই বৃহত্তর সমাজ থেকে দূরে কষ্টকর দিনযাপন করে। বিশেষ করে শতাব্দীকাল থেকে উপনিবেশবাদীদের পাশবিক অবিচারে তারা হটতে হটতে সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্থানে গিয়ে ঠেকতে বাধ্য হয়েছে।

পুরুষের দৈহিক শক্তি পুরুষশাসিত সমাজে স্ত্রীদের অনুগত হতেই বাধ্য করেছে। কাক-বৌ দুজন অনুগত ক্রীতদাসীর মত এমুর শাসন মেনে চলছে। আর এমু? বৃষ্টিতে শীতে যখন বৌরা কাজ করছে, তখন সে দিব্যি আরামে রয়েছে ঘরের মধ্যে। কোনোরকম সাহায্য করতে সে এগিয়ে আসেনি। বহু আদিবাসী সমাজে স্ত্রীদের এই হাড়ভাঙা খাটুনি ও পুরুষের আরামপ্রিয়তার সন্ধান মিলবে।

যে পরিশ্রম করে না, যে অকর্মণ্য হয়ে বসে থাকে ও অন্যের শ্রমের অন্নে জীবন কাটায় সে সাধারণত দুষ্টবুদ্ধির মানুষ হয়। আর এইসব মানুষ তাদের অধীনস্থ অনুগতদের ওপর অকারণে নির্যাতন করতে ভালোবাসে। বোধহয় অলস চিন্তার ফলে মানুষের মনস্তত্ত্বে এই প্রবণতা জন্মায়। আদিবাসী মানুষ জটিল মনস্তত্ত্ব নিয়ে হয়তো গভীরভাবে চিন্তা করে না, কিন্তু অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তারা এসব জেনেছে।

আরামে থাকতে থাকতে এমুর মধ্যেও এই প্রবণতা জন্মেছে। সে অকারণে অত্যাচার শুরু করল। অন্যকে কষ্ট দেওয়ার মধ্যে এমু এক বীভৎস আনন্দের খোরাক পেয়ে গেল। একদিকে কাক-বৌদের কষ্ট ও অন্যদিকে এমুর বীভৎস আনন্দ-উচ্ছলতা সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে এই পশুকথাটিতে। যারা খাটে আর যারা খাটায় তাদের চরিত্র স্পষ্ট হয়েছে।

কিন্তু পশুকথাটির শেষাংশে আমরা অন্য চিত্র পাই। এইখানেই গল্পটির বিষয়-বস্তুতে অন্য সুর। দৃঢ় সংঘবদ্ধ কৃষিভিত্তিক সমাজে নারীর প্রতি পুরুষের শাসন ও অবিচার এবং সামন্ততান্ত্রিক শোষণ অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক থাকে। কেননা, উৎপাদন ও ফসল উৎপন্নের মূল দায়িত্ব থাকে পুরুষের হাতে। কিন্তু আধা-পশুপালক ও আধা-কৃষকসমাজে পুরুষের শাসন নারী মেনে চললেও খাদ্যসংগ্রহে তারও কিছু ভূমিকা রয়েছে বলে সে তার ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়। পুরুষের অবিচার সে সহ্য করে কিন্তু তা যদি সীমা ছাড়ায় কিংবা অকারণ অত্যাচার বারংবার ঘটে তবে অন্য পক্ষ থেকে বাধাও আসে। বিশেষ করে যে নারী গায়ে-গতরে খেটে পুরুষকে বাঁচিয়ে রেখেছে, তেমন নারী যদি এই পুরুষকে ছেড়েও যায় তবে অন্য পুরুষ তাকে তার শ্রমশক্তির

জন্যই গ্রহণ করবে। এই বিকল্প পথ রয়েছে বলেই বৌরা এমুর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে পেরেছে।

যারা অত্যাচারিত তারা সবসময় অত্যাচারীর বিরুদ্ধে জোট বাঁধে। শত্রুর বিরুদ্ধে একতা ছাড়া লড়াই করা যায় না। কাক-বৌ দুজন তাই সহজ ও স্বাভাবিক বুদ্ধিতে জোট বেঁধেছে। আর অত্যাচারী যখন হেরে গিয়ে পালায় তখন এই নিপীড়িতদের উচ্ছ্বাস দেখবার মত। তারা হেসেই কুটিকুটি। দুষ্টু এমুর লাঞ্ছনার মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটা তাচ্ছিল্যও প্রকাশ পেয়েছে। মনপ্রাণ দিয়ে তারা যে এটাই চায়।

পশুকথা

জোট বেঁধে পায়রা ওড়ে

মা আর দিদিকে নিয়ে ছোট্ট বাড়িতে থাকে এক পায়রা। মা ও দিদি তাকে আদর করে গুলাহ্‌য়ুলিল বলে ডাকে। বয়স তার অল্প, সংসারে তাই তার মোটেই মন নেই। তিড়িং-বিড়িং করে লাফিয়েই তার দিন কাটে। খেলায় পাগল গুলাহ্‌য়ুলিল।

কিন্তু এমনি করে তো আর দিন যায় না! মা-দিদির বয়স হয়েছে, আর দু'দিন পরে তারা কেমন করে খাবার খুঁজতে যাবে? তাই এখন থেকেই ভাইয়ের উচিত তাদের জন্য খাবার খুঁজে আনা। এখন থেকেই এসব শেখা দরকার। গুলাহ্‌য়ুলিল রাজি হয়ে যায়, আর প্রতিদিন সকালে খাবার আনতেও বেরোয়। শিকার করে আনবে, একথা বলেই সে বেরিয়ে পড়ে।

বাড়িতে বসে বসে মা ও দিদি ভাবে, আজ হয়তো গুলাহ্‌য়ুলিল নিশ্চয়ই একটা ক্যাঙারু কিংবা এমু মেরে আনবেই। কিন্তু প্রত্যেক দিন সে খালি হাতে বাড়ি ফেরে, একদিনও মাংস আনতে পারে না।

এমনি করে দিন যায়। একদিন তার দিদি রেগেমেগে বলে উঠল, 'তুমি সারাদিন ঝোপের মধ্যে কি কর? তোমার তো দেখছি শিকারের দিকে একেবারেই মন নেই। তবে এতক্ষণ বাইরে বাইরে কি কর?'

গুলাহ্‌য়ুলিল উত্তর দেয়, 'আমি শিকার করতে পারি না। আমার এসব ভালোও লাগে না।'

মা-দিদি শুধোয়, 'তার মানে? তুমি কি আমাদের জন্য কিছুই আনবে না?'

অভিমানের স্বরে সে জবাব দেয়, 'আমি কি করব? আমি যার পেছনেই তাড়া করে ছুটে যাই তাকে আর ধরতে পারি না। আমি যখন কোনো ক্যাঙারু কিংবা এমুকে দেখি তখনই চিৎকার করতে করতে তার পেছনে ছুটে যাই। তোমরা কি আমার সে চিৎকার কোনোদিন শোননি?'

'হ্যাঁ, এটা ঠিক। প্রতিদিন তোমার চিৎকার শুনে আমরা বুঝতে পারি কিছু একটা তুমি দেখেছো। তক্ষুনি আমরা আনন্দে আগুন জ্বালাতে শুরু করি। আশা করে থাকি তুমি মাংস নিয়ে ফিরবে। সারাদিন খিদের জ্বালায় তোমার পথ চেয়ে বসে থাকি। কিন্তু কোনোদিন তুমি কিছুই আনতে পার না।' দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মা বলে।

একটু চুপ করে থেকে গুলাহ্‌য়ুলিল বলল, 'আচ্ছা, ঠিক আছে। কালকে ঠিক আমি কিছু ধরে আনব। দেখো, তোমরা আর আমাকে কিছু বলতে পারবে না। তোমাদের হাসি ফুটবেই। এই আমি বলছি, কালকে একটা ক্যাঙারু ধরে আনবই আনব।'

গুলাহ্‌য়ুলিল কিন্তু কোনোদিনই শিকার করতে যায় না। বনের আড়ালে একটা সুন্দর ছায়াঘেরা ঝোপ রয়েছে। সে বসে বসে গাছের আঠা দিয়ে খেলনার ক্যাঙারু বানায়। খুব মন দিয়ে ক্যাঙারুর মোটা লম্বা লেজ কান ডাগর-চোখ আর পেটের থলি নিখুঁতভাবে তৈরি করে। একেবারে সত্যিকার লাফারু ক্যাঙারুর মত। নিজের তৈরি খেলনা দেখে নিজেরই অবাক লাগে। ভাবে, সত্যিই কি এটা আমি তৈরি করেছি? আহা, এর যদি প্রাণ থাকত, এ যদি লাফাত! সে ভাবে আর অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। এমনি করে দিন কাটে, সূর্য ডুবে যায়। খালি হাতেই সে বাড়ি ফেরে। মা-দিদি কিছুই বুঝতে পারে না।

সেদিন সে কথা দিল। কিন্তু মোটেই শিকারের খোঁজে গেল না। ওসব তার মোটে ভালো লাগে না। চলে গেল ছায়াঘেরা সুন্দর ঝোপে। সারাদিন বসে তৈরি করল সুন্দর একটা খেলনার ক্যাঙারু। আশ্চর্য, আজকেরটা অন্যদিনের চেয়েও অনেক ভালো হয়েছে। কি আর করে! তাকে পিঠে নিয়েই রওনা দিল বাড়ির পথে। আস্তে আস্তে চলছে সে, একে ক্যাঙারুর ওজন, তার ওপরে একটু একটু ভয়।

দূর থেকে তাকে আসতে দেখেই মা-দিদি বাড়ির বাইরে এগিয়ে এল; দেখল, পিঠে তার ঝোলানো সুন্দর একটা ক্যাঙারু। মা দিদিকে বলল, 'আজ আমাদের

গুলাহ্‌য়ুলিল সত্যিই কথা রেখেছে। ছেলের মত ছেলে! আমরা সারাদিন কিছু না খেয়ে বসে আছি, তাই ও ক্যাঙারু আনছে। এমন ছেলে হয় না! যা, তাড়াতাড়ি আগুন ঠিকঠাক কর্‌। বেশ কয়েকদিন পরে আজ রাতে ভালোভাবে মাংস খাওয়া যাবে। যা, যা, দেরি করিস না।'

বাড়ির বেশ কাছাকাছি আসতেই গুলাহ্‌য়ুলিল খেলনার ক্যাঙারুকে পিঠ থেকে নামিয়ে বালিতে বসিয়ে দিল। খালি হাতে বাড়ি ঢুকল।

তার মা অবাক হয়ে বলল, 'তুমি যে ক্যাঙারুটা পিঠে করে নিয়ে আসছিলে, সেটা কোথায় গেল? তাকে কোথায় রেখে এলে?'

'ঐ ওদিকে।' সে যেখানে খেলনার ক্যাঙারু বসিয়ে রেখে এসেছিল সেদিকে আঙুল তুলে দেখাল।

দিদি বাইরে বেরিয়ে ক্যাঙারু আনতে ছুটল। কিন্তু তক্ষুনি ফিরে এসে বলল, 'কোথায় ক্যাঙারু? আমি তো কিছুই দেখতে পেলাম না?'

'ঐ তো ওখানে।' সে আবার একই জায়গা দেখাল।

দিদি রেগে বলল, 'কোথায় ক্যাঙারু? ওখানে তো মস্ত এক দলা আঠা পড়ে আছে।'

'বাঃ রে! আমি কি অন্যকিছু বলেছি? আমি তো প্রথমেই বলেছি, ওটা একতাল আঠা। ক্যাঙারু বলেছি?' ছেলেমানুষের সুরে সে বলে উঠল।

'না কখনই নয়। তুমি বলেছিলে, ওটা ক্যাঙারু।' মা ও দিদি একসঙ্গে বলে উঠল।

'হ্যাঁ, তাই তো। ওটা তো ক্যাঙারুই। কেমন চমৎকার সুন্দর একটা ক্যাঙারু। আর জানো ওটা কে বানিয়েছে? আমিই বানিয়েছি। কি সুন্দর তাই না? বল মা, ভালো হয়নি?' এমনভাবে সে কথা বলল যেন এমন ক্যাঙারু কেউ তৈরি করতে পারবে না।

মা ও দিদি হাসবে কি কাঁদবে বুঝতে পারল না। খিদেতে তাদের মাথা ঘুরছে, সারাদিন আশা করে থেকে এই হবে কে জানত! রাগে কাঁপতে লাগল মা-দিদি। গুলাহ্‌য়ুলিলকে ধরে ভীষণ মারতে লাগল তারা। খিদের সময় এইভাবে ঠকে গিয়ে তারা কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলল। অল্পক্ষণ পরেই তারা ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ল।

কোনোরকমে রাত কাটল। পরের দিন ভোরবেলায় মা গুলাহ্‌য়ুলিলকে বলল, 'আর কখনো তোমাকে একা শিকার করতে যেতে হবে না। অনেক হয়েছে। শিকার তো তুমি করই না, বরং সারাদিন খেলনা বানিয়ে কাটাও। খেলে খেলে বেড়াও। তুমি

বুঝতে পার না, আমরা না খেয়ে বাড়িতে বসে আছি। খালি হাতে ফিরতে তোমার লজ্জা করে না? এখনও কি বড় হও নি? আজ থেকে তোমার একা যাওয়া বন্ধ।'

সেইদিন থেকে গুলাহ্‌য়ুলিলকে শিকার খুঁজতে যেতে হত মা ও দিদির সঙ্গে।

আর তাই, আজও পায়রারা কখনও একা একা খাবারের খোঁজে যায় না। সব সময়ে ঝাঁক বেঁধে দল ভারী করে চলে। খাবার খোঁজার সময়ে সকলে মিলে তখন এক পরিবার।

অভিপ্রায়

তাসমানিয়ার অধিকাংশ মানুষই খুব গরিব। ফসল সঞ্চয় করে নিশ্চিন্তে দিন কাটাবার উপায় নেই তাদের। তারা দিন আনে, দিন খায়। সেইরকম একটি হত-দরিদ্র ঘরের ছবি এই পশুকথাটিতে ব্যক্ত করা হয়েছে। গোষ্ঠীবদ্ধ আদিবাসী সমাজে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসবাস করার উপায় নেই। একাকীত্ব মানেই মৃত্যু, প্রয়োজনের তাগিদেই তারা জোট বেঁধে বাস করে। এই জোটবদ্ধ সমাজের প্রতি তাদের যেমন আন্তরিক আনুগত্য রয়েছে, তেমনি রয়েছে মমত্ববোধ। তাই গোষ্ঠীজীবনের প্রতি ভালোবাসাও ব্যক্ত হয়েছে গল্পটির মধ্যে। গার্হস্থ্য জীবনের নিখুঁত ছবি রয়েছে এতে।

ছেলেরা যখন অল্পবয়সী থাকে, তখন দায়িত্ববোধ তেমন গড়ে উঠতে পারে না। জীবনে অভিজ্ঞতা কম থাকার জন্যই সংসার নির্বাহের চিন্তা তেমন দানা বেঁধে ওঠে না। বয়স্করা তাদের ধীরে ধীরে দায়িত্বসচেতন করে তোলেন, সংসারের উপযুক্ত করে তৈরি করেন।

গুলাহ্‌য়ুলিল বয়সে কাঁচা। এখন তো তার খেলে বেড়াবারই সময়। প্রকৃতির বিমল আনন্দে ঘুরে বেড়াবার বয়স। বিশেষ করে, এই ছেলে যখন কিছুটা শিল্পীমনের মানুষ। তই খিদের খাবার সংগ্রহ করার একঘেয়েমি ও পরিশ্রম থেকে রেহাই পেতে মনের আনন্দে সে খেলনা বানায়। মা-দিদি রয়েছে, খিদের অন্ন তো তারাই জোগাবে। প্রতিটি পরিবারেই এমন ছেলে রয়েছে। এবং কিশোর মনের এই প্রবণতাই তো স্বাভাবিক। প্রতিটি ছেলেমানুষ তার নিজের সৃষ্টিকে অপূর্ব ভাবে, বিস্মিত হয়। ক্যাঙারু তৈরি করে সেও অবাক হয়েছে। এমনটি বোধহয় কেউ বানাতে পারবে না!

কিন্তু সমর্থ-পুরুষহীন সংসারে দারিদ্র্য নিত্যসঙ্গী। সেখানে তো ছোটদেরও খেলায় মেতে থাকলে চলে না। কিশোরদেরও অন্নের জন্য রোজগার করতে হয়, আর বয়সের পক্ষে যুক্তিযুক্ত না হলেও খাদ্য-সংগ্রহে শ্রমশক্তি নিয়োগ করতে হয়। পৃথিবীর

দেশে দেশে দরিদ্র সংসারের লক্ষ-কোটি কিশোর শ্রমিকের তাই দেখা মিলবে। মা ও দিদি বাধ্য হয়েই গুলাহ্ যুলিলকে পাঠিয়েছে শিকার ধরে আনতে।

বাইরে যখন কেউ রোজগার করতে যায়, তখন বাড়ির অবস্থা কেমন থাকে? দরিদ্র পরিবারে তো মজুত কিছু থাকে না। সেই সন্ধ্যাবেলা বাবা-দাদা-ভাই কিছু আনবে, তবেই খাওয়া। সারাদিন পথ চেয়ে বসে থাকা। মা বলেছে, 'সারাদিন খিদের জ্বালায় তোমার পথ চেয়ে বসে থাকি।' আমাদের গরিব সংসারে এ ঘটনা নির্মমভাবে সত্য, আর আদিবাসী সমাজে আরও সত্য, বিশেষ করে পশুশিকার যাদের মূল উপজীবিকা। পুরুষেরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পাহাড়-অরণ্যে যায়, গ্রামে নারী-শিশু-বৃদ্ধেরা তাদের ফিরে আসার পথ চেয়ে বসে থাকে। কি অনবদ্য বাস্তব চিত্র পশুকথাটির মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে!

ক্ষুধা মানুষকে অস্বাভাবিক করে তোলে। ক্ষুধায় মানুষ মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলে। এর বীভৎস যাতনা ও নির্মম কষ্ট ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ উপলব্ধি করতে পারবে না। কয়েকদিনের অনাহার মানুষকে পশু করে তুলতে পারে, তার কাণ্ডজ্ঞান হারাতে বাধ্য করে। মা ও দিদি ঠিক সেইমুহূর্তে রাগে সমস্ত যুক্তি চিন্তা হারিয়ে ফেলেছে; কেননা, খিদেতে মাথা ঘুরছে। এই সময়ে সামান্য কিছু অপরাধও সহ্য করা সম্ভব হয় না। খিদের যাতনায় মা ও দিদি কিশোরের কচি বয়সের কথা ভুলে গিয়েছে। সে যে তাদের ঠকিয়েছে সেটাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। তারা তাকে আঘাত করেছে। গরিব সংসারে এ তো প্রতিদিনের ছবি।

বয়স্করা ছোটদের নিজের পাশে পাশে রেখে তাকে অভিজ্ঞ করে তোলেন। সে যাতে কাজেকর্মে ফাঁকি দিতে না পারে তার ব্যবস্থা করেন। এখানেও গুলাহ্ যুলিল সংসারে অভিজ্ঞ হতে মা ও দিদির সঙ্গেই বাইরে বেরিয়েছে।

নারীরা ঘরের মধ্যে থেকেই বাঁচতে চায়। অনেক সংস্কার ও সামাজিক বাধা তাদের বাইরে বেরুতে দেয় না। কিন্তু অনাহার যখন প্রতিদিনের সঙ্গী হয়, তখন জড়তা ত্যাগ করে খাদ্যের সন্ধানে বাইরে যেতেই হয়। মা ও দিদি ঘরে থাকতেই চেষ্টা করেছে, কিন্তু নির্মম সমাজ তাদের পথে নামিয়েছে। উপার্জনক্ষম পুরুষের অভাবে এই তো ঘটে থাকে আমাদের সমাজে।

পশু পরিচয়

['লোকসমাজ ও পশুকথা' গ্রন্থটিতে শুধুমাত্র পশুদের নিয়ে যেসব লোককথা ছড়িয়ে রয়েছে তাই সংগ্রহ সংকলন এবং বিশ্লেষণ করেছি। এখানে কোনো মানব চরিত্র নেই। আগেই বলেছি, এসব লোককথায় আবির্ভূত পশু চরিত্রগুলি সকলেই মানুষের প্রতিনিধি। গ্রন্থে উল্লিখিত পশুরা দুনিয়ার পশুকথায় কিভাবে স্থান নিয়ে আছে এবং কোন্ কোন্ দেশের গল্পে তাদের প্রাধান্য রয়েছে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল। বিশেষ দেশের লোকসমাজের সঙ্গে বিশেষ বিশেষ পশু অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে রয়েছে। আলোচিত বিভিন্ন পশুর পরিচয়ের মাধ্যমে একটা সাধারণ ধারণা গড়ে উঠবে বলে মনে করি।]

কচ্ছপ

দু'একটি পশুকথায় ছাড়া কচ্ছপ সর্বত্র নির্বুদ্ধিতার প্রতীক। কুৎসিত ও শ্লথগতি এই প্রাণীটি বোধহয় মানুষের রসিক মনকে আকৃষ্ট করেছে। উভচর প্রাণীটি তাই মজার মজার গল্পের খোরাক জুগিয়েছে। কচ্ছপ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি গল্প পাওয়া যায় নাইজেরিয়ার য়োরুবা আদিবাসীদের মধ্যে। গল্পগুলো অত্যন্ত উচ্চমানের। পশ্চিম আফ্রিকার গিনি তীরভূমির দেশগুলি ও দাহোমেতে কচ্ছপ বিষয়ক প্রচুর গল্প রয়েছে। এখান থেকেই ক্রীতদাসদের মাধ্যমে নয়া-দুনিয়ার নিগ্রো পশুকথায় কচ্ছপ সম্পর্কিত অনেক গল্প বিস্তৃতি লাভ করেছে। নাইজেরিয়ার পশুকথায় শূয়রকে ধার শোধ না দেওয়ার গল্পটি কচ্ছপের অপরূপ বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। পাখির মুখের লাঠিকে আঁকড়ে ধরে পাহাড় পেরিয়ে যাওয়া এবং খরগোশ ও কচ্ছপের দৌড় বিষয়ক গল্পটি খুব ব্যাপকভাবে পরিচিত হয়েছে।

কুকুর

আদিম মানুষ প্রথম যে পশুকে পোষ মানালো, সে হল কুকুর। এই গৃহপালিত আদরের পশুটি সেই প্রাচীনকাল থেকে মানুষের অতি কাছের অতি বিশ্বস্ত সহচর। প্রতিটি দেশেই কুকুরকে ঘিরে নানান ধরনের বিচিত্র পশুকথার উদ্ভব হয়েছে। তবু 'কুকুর স্বামী' লোককথাটির বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। এই 'কুকুর স্বামী' লোককথাগুলি পশ্চিম আফ্রিকার কংগো নদীর উত্তরে বসবাসকারী আদি-জনগোষ্ঠী, আমেরিকার আদিবাসী, এস্কিমো, সাইবেরিয়ার অধিবাসী, উত্তর আমেরিকার সব

অঞ্চলের মানুষদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয়। এগুলোর প্রাচীনত্ব সকলেই স্বীকার করেছেন। পঞ্চতন্ত্র এবং ঈশপের গল্পেও কুকুর একটি প্রধান ও বিশেষ চরিত্র।

খরগোস

পশুকথার সবচেয়ে জনপ্রিয় পশু। সবচেয়ে বেশি গল্প এই খরগোশকে নিয়ে গড়ে উঠেছে। ওজিবাওয়ে এবং মেনোমিনি আদিবাসীদের মধ্যে যেসব প্রতারক-খরগোশের পশুকথা রয়েছে তা অনবদ্য। এখানে খরগোশ মানুষের মত নায়ক বীর এবং ধূর্ত। তার নাম নানাবোজহো। এরা চার ভাই। নানাবোজহো হল বড় ভাই। ভারত আফ্রিকা উত্তর-আমেরিকা সোভিয়েত ইউনিয়ন গ্রীস দক্ষিণ-ক্যারোলিনা সাগরের দ্বীপপুঞ্জ মালয় অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে খরগোশের গল্পের ছড়াছড়ি। দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া ক্ষুদ্রদেহী এই শক্তিহীন পশুটি প্রায় সবক্ষেত্রেই বুদ্ধিতে জয়ী হয়েছে, ধূর্ত বুদ্ধিতে অন্যকে প্রতারণা করেছে।

খেঁকশেয়াল

বিচিত্র মজাদার অজস্র পশুকথা গড়ে উঠেছে খেঁকশেয়ালকে ঘিরে। অধিকাংশ গল্পে খেঁকশেয়াল তার অবমাননার প্রতিশোধ নিয়েছে। এই ধরনের গল্প চীন জাপান এবং কোরিয়ায় খুব বেশি দেখা যায়। একাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে 'রেনার্ড দি ফক্স'-এর গল্পগুচ্ছ গড়ে ওঠে এবং চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে জনপ্রিয়তার শীর্ষে ওঠে। এগুলো অজানা লেখকদের দ্বারা সংগ্রহিত, কিন্তু তার মূল উৎস ছিল লৌকিক মৌখিক পশুকথা। গ্রীনল্যাণ্ড, ল্যাব্রাডার, বেরিং সাগরের তীরভূমি এলাকায় ও আমেরিকার পুয়েবলো ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে এই পশুটিকে নিয়ে অনুপম সব গল্প ছড়িয়ে রয়েছে। এস্কিমোদের মধ্যে 'মানবী খেঁকশেয়াল' বিষয়ক গল্পগুলো খুব জনপ্রিয়। পঞ্চতন্ত্র এবং ঈশপেও খেঁকশেয়াল খুব উপভোগ্য চরিত্র।

গোরু/গাভী

আজ শুধুমাত্র ভারতের গোঁড়া অবৈজ্ঞানিক মনের যুক্তিশূন্য হিন্দুদের কাছেই গোরু পবিত্র, সে গোমাতা, সে দেবী। কিন্তু প্রাচীন মিশরীয় ও গ্রীকো-রোমান মানুষদের কাছেও গোরু অসাধারণ স্থান দখল করেছিল। অনেকে মনে করেন, ভারতের গোরু সম্পর্কিত ধর্মমতের চেয়েও মিশরের গোরু সম্পর্কিত ধর্মমত

অনেক প্রাচীন। ভারত মিশর গ্রীস ইতালি স্পেন ও আফ্রিকার কিছু অংশে এবং পুয়েবলো ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে গোরু সম্পর্কে অনেক পশুকথা রয়েছে। এসব পশুকথায় গোরু শান্ত ভীরু সহনশীল ও অত্যাচারিত হিসাবে চিত্রিত হয়েছে। অধিকাংশ সময়ে গোরু অসীম নির্যাতন সহ্য করেও কোনো প্রতিবাদ করতে পারেনি। গৃহপালিত এই শান্ত উপকারী পশুটি সমাজের সহানুভূতি কেড়ে নিতে পেরেছে।

ছাগল

গ্রীস ও ইতালিতে ছাগল সম্পর্কে বিচিত্র ধরনের পশুকথা আছে। প্রাচীন গ্রীসে পূজার্চনায় ছাগল উৎসর্গ করা হত। ম্যারাথনে বিজয়ের জন্য পাঁচশো ছাগল বলি দেওয়া হয়েছিল। ভারতে হিন্দুদের মধ্যে ছাগলকে দেবতার কাছে উৎসর্গের রীতি আজও প্রচলিত। বার্মা ভারত ইজরায়েল নাইজিরিয়ায় এবং নয়া-দুনিয়ার নিগ্রোদের মধ্যে ছাগলের গল্প খুব জনপ্রিয়। আফ্রিকার হাউসা আদিবাসীদের গল্পে রয়েছে এক ছাগল কেমন করে সিংহ ও হায়েনার মতন হিংস্র জন্তুকে বোকা বানিয়েছে। য়োরুবা আদিবাসীদের পশুকথায় আছে এক ছাগল চিতাকে বুদ্ধিতে হারিয়েছিল। বুলগেরিয়ায় ছাগল সম্পর্কে কয়েকটি মজার পশুকথা পাওয়া গিয়েছে।

হরিণ

পশুকথার আর একটি প্রিয় প্রাণী হল হরিণ। উত্তর আমেরিকার পশ্চিমাঞ্চলের বহু আদিবাসীদের পুরাকথায় হরিণ একটি প্রধান চরিত্র। হরিণ-মানবীর উপকথাটি এইসব লোকসমাজে অত্যন্ত জনপ্রিয়। মানুষের সঙ্গে হরিণ-স্ত্রীর বিয়ের গল্পও এদের মধ্যে রয়েছে। পুয়েবলো ইণ্ডিয়ানদের টেওয়া আদিবাসীদের মধ্যে পরিত্যক্ত হরিণ-বালকের একটি অপূর্ব গল্প পাওয়া যায়। ভারত ও গ্রীসের পশুকথায় অসংখ্য হরিণের গল্প আছে। অস্ট্রেলিয়া ও তাসমানিয়ার কয়েকটি গল্পেও হরিণের কিছু উল্লেখ রয়েছে।

আফ্রিকার পশুকথা হরিণ-সম্পর্কিত গল্পে সমৃদ্ধ। হরিণ এসব গল্পে শান্ত বোকা অথচ আত্ম-অহংকারী। অধিকাংশ গল্পেই হরিণ শুধু ঠকেছে এবং নির্বুদ্ধিতার খেসারত দিতে মারা পড়েছে।

নেকড়ে

অধিকাংশ দেশেই নেকড়ের গল্প রয়েছে, কিন্তু এই পশুটিকে কোথাও শ্রদ্ধেয় চরিত্রে আঁকা হয়নি। অবশ্য পুরাকথায় নেকড়ে-মায়ের সন্তানপালনের কথা রয়েছে। পশুকথায় নেকড়ে ধূর্ত শয়তান প্রতিশোধ-পরায়ণ এবং নিচ। ভারত এবং আফ্রিকার সমস্ত দেশ, উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, উত্তর-অতলান্তিক তীরভূমির দেশগুলি এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের এশীয় দেশগুলিতে নেকড়ে বিষয়ক অগুণতি পশুকথা ছড়িয়ে রয়েছে। পুয়েবলো ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে ছোট্ট প্রবঞ্চক নেকড়ের অসাধারণ বুদ্ধিদীপ্ত পশুকথা রয়েছে।

পায়রা

লাতিন আমেরিকার দেশগুলোতে পায়রার কিছু সুন্দর উপকথা রয়েছে। এই ভূখণ্ডের ইণ্ডিয়ান আদিবাসীদের মধ্যে 'পায়রা-নৃত্য' একটি সামাজিক প্রথা। সেনেকা কায়ুগা ইরোকুওইস্ আদিবাসী এবং মেক্সিকোর আদি-বাসিন্দাদের মধ্যে পায়রার গল্পগুলো খুব জনপ্রিয়। সমবেত প্রচেষ্টায় শিকারীর জালসমেত এক ঝাঁক পায়রার উড়ে যাওয়ার গল্পটি পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন লোকসমাজে প্রচার লাভ করেছে।

বাদুড়

নিশাচর এই প্রাণীটির আকৃতিগত ও স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য মানুষের অশেষ কৌতূহল জাগিয়েছে। পাখির মত ওড়ে অথচ ডানায় পালক নেই, দাঁত আছে আর বাচ্চা পাড়ে। দেহ পশুর মত অথচ ডানার মত ওড়ার অঙ্গ রয়েছে। পশু ও পাখির এই মিলন মানুষ উপভোগ করেছে, তাই মজার মজার গল্পও তৈরি হয়েছে। অধিকাংশ দেশেই বাদুড় অশুভের প্রতীক, কিন্তু চীন পোল্যাণ্ড প্রভৃতি কয়েকটি দেশে বাদুড় শুভ-সংকেত বয়ে আনে। ফিলিপাইন আফ্রিকা আমেরিকা ইউরোপ এবং আরব দুনিয়ায় বাদুড়কে মুখ্য চরিত্র করে সুন্দর সুন্দর পশুকথা গড়ে উঠেছে। পশু ও পাখিদের দ্বন্দ্বে বাদুড় কোন পক্ষে যোগ দেবে তা নিয়ে অপরূপ সব পশুকথা আছে। বিশেষ করে তার সুবিধাবাদী চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এইসব গল্পের মাধ্যমে।

বানর

মানুষের ভাষা ছাড়া বানর প্রায় মানুষেরই প্রতিরূপ। তাই তার সম্পর্কে আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। বিভিন্ন অঞ্চলে বানর বিভিন্ন গুণ নিয়ে গল্পে এসেছে। কোথাও অত্যন্ত চতুর, কোথাও প্রতারক, আবার কোথাও বা অত্যন্ত বোকা। ইন্দোনেশিয়া পশ্চিম-আফ্রিকা রোডেশিয়া জাপান চীন ভারত এবং দক্ষিণ-আফ্রিকার জুলু আদিবাসীদের মধ্যে বানর সম্পর্কিত প্রচুর পশুকথা প্রচলিত রয়েছে। ফিলিপিনো লোককথায় 'বানর রাজপুত্র' গল্পটি জনপ্রিয় ও বৈচিত্র্যে-ভরা।

ভালুক

অধিকাংশ আদিবাসীদের কাছে ভালুক দেবতা, মানুষের পূর্বপুরুষ, টোটেম, পবিত্র পশু, অভিভাবক, রোগ-নিবারক এবং দ্বিতীয় আত্মার ধারক ও বাহক। এইসব বিশ্বাস থেকে ভালুক সম্পর্কে অনেক পশুকথার জন্ম হয়েছে। ভালুক সম্পর্কে একটি লোকবিশ্বাস রয়েছে, বনের পথে পথিক যদি ভালুকের মুখোমুখী হয় এবং সে যদি নিঃশ্বাস বন্ধ করে মৃতের মত পড়ে থাকে, তবে ভালুক তাকে মৃত ভেবে কোনো ক্ষতি করবে না। এই বিশ্বাস থেকে একটি লোককথা জন্ম নিয়েছে এবং তা পৃথিবীর বহু এলাকায় প্রায়-অবিকৃত অবস্থায় বর্তমান রয়েছে। ভালুকের লেজ কেন ছোট তা নিয়েও মজার গল্প রয়েছে ইউরোপের বাল্টিক দেশগুলো, আফ্রিকা ও আমেরিকায়। হারিয়ে-যাওয়া মানব-শিশুকে ভালুক মা হিসেবে প্রতিপালন করেছে—এরকম কিছু কিছু সুন্দর গল্প রয়েছে কলাম্বিয়া ও উত্তর আমেরিকার আদিবাসীদের মধ্যে এবং মোনটানার কুটেনাই ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে।

শেয়াল

পশুকথায় সবচেয়ে বেশি উল্লেখ রয়েছে শেয়ালের। দু'একটি গল্প ছাড়া প্রায় প্রত্যেকটি গল্পে শেয়ালকে ধূর্ত হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। সে নিজে কখনও শিকার করে না, অন্যকে শিকারে প্ররোচিত করে এবং অন্যের শিকার করা পশুর মাংস খায়। পরোক্ষভাবে শেয়ালকে ভীরু হিসেবেও দেখানো হয়েছে। হাউসা পশুকথায় শেয়ালকে বলা হয়েছে 'বনভূমির সবচেয়ে পণ্ডিত বিচারক'। ভারতে শেয়াল হল 'পণ্ডিত' ও 'রাজার মন্ত্রী'। 'শেয়ালের গল্পকথা সবচেয়ে বেশি ও

সুন্দরভাবে পাওয়া যায় আফ্রিকার হটেনটট্ আদিবাসীদের মধ্যে। এদের কাছে শেয়াল হল প্রবঞ্চক। বুশম্যানদের পশুকথায়ও শেয়াল অত্যন্ত জনপ্রিয় চরিত্র।

শূয়র

প্রাচীন নরগোষ্ঠীর মধ্যে শূয়র সম্পর্কে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। কোনো সমাজে শূয়র অত্যন্ত আদরের, আবার কোনো সমাজ অপবিত্র শূয়রকে পরিত্যাজ্য জ্ঞান করেছে। তাই শূয়র সম্পর্কে পশুকথাগুলির মধ্যে এই দুই মানসিকতাই কাজ করেছে। মিশরীয়রা শূয়রকে ঘৃণা করত, আবার গ্রীক নারীরা দেবী বসুন্ধরার উদ্দেশ্যে পবিত্র শূয়র উৎসর্গ করেছে। জুলু আদিবাসী এই কুরূপ পশুকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করে, অন্যদিকে উত্তর সেলিবিসের মানুষ বিশ্বাস করে শূয়রের রক্ত পান করলে দেহে অতিলৌকিক শক্তি সঞ্চিত হবে। এই প্রাণীটি সম্পর্কে খুব প্রাচীন সব পশুকথা পাওয়া যায় ইহুদীদের মধ্যে। গ্রীস নাইজেরিয়া দক্ষিণ-আফ্রিকা ওয়েলস কংগো সিরিয়া প্রভৃতি দেশে শূয়রকে কেন্দ্র করে মিশ্র মনোভাবের প্রচুর পশুকথা রয়েছে।

ষাঁড়

এই প্রাণীটি সম্পর্কে খুব প্রাচীন এবং ব্যাপক লোকবিশ্বাস গড়ে উঠেছিল ভারত, স্পেন, নিকট মধ্য ও দূর প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে এবং জুলুদের মধ্যে। প্রাচীন পারস্য ও ভারতে ষাঁড় দেবতার স্থান দখল করেছিল। ব্যাপক পুজো হত ষাঁড়ের। ষাঁড়ের অসাধারণ প্রজনন ক্ষমতায় ও অপরিসীম শক্তিতে মানুষের শ্রদ্ধা স্বাভাবিকভাবেই জাগরূক হয়েছিল। ষাঁড় বাইসন হাতি ও হনুমানের সমাজে এক পুরুষের আধিপত্যকে নিয়ে বহু পশুকথার সৃষ্টি হয়েছে। প্রাচীন মিশরে ষাঁড় দেবতা ও রাজার প্রতিনিধি, প্রাচীন গ্রীসে নতুন রাজা পোসিডনের উদ্দেশ্যে ষাঁড় উৎসর্গ করা হত। ষাঁড় সম্পর্কে পশুকথা কম হলেও এইসব গল্পে বীর্য সাহস ও শক্তিমত্তার পরিচয় ফুটে উঠেছে।

সিংহ

বহু দেশেই সিংহ কোনোকালে পাওয়া যেত না, অথচ পরিচিত এই সম্ভ্রান্ত পশুরাজকে নিয়ে খুব সুন্দর সব পশুকথা গড়ে উঠেছে। সিংহ ও খরগোশের

গল্পটি তো আন্তর্জাতিক পশুকথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রায় প্রতিদেশেই সিংহ শক্তি ও রাজকীয় মহিমার পরিচায়ক। বৌদ্ধদের কাছে সিংহ শুভ-ভবিষ্যৎ উদারতা ও ভদ্রতার প্রতীক। চীনদেশে নতুন বছরের উৎসবে সিংহ বিশেষ ভূমিকা নেয়। আফ্রিকায় সিংহ টোটেম ও অতিলৌকিক আত্মার প্রতিভূ। আফ্রিকার গল্পগুলোতে সিংহ অনেক সময় খরগোশ শেয়াল ও নেউলের কাছে বোকা বনেছে। ভারত তিব্বত গ্রীস জর্জিয়ায়ও এরকম গল্প রয়েছে। সিংহ মহানুভব এ ধারণাই সচরাচর দেখা যায়, কিন্তু শিকারভাগের সময়ে তার নিচ ও লোভী চরিত্র ফুটে ওঠার কয়েকটি গল্প রয়েছে। শিকারীর ফাঁদে-পড়া সিংহকে ইঁদুর উদ্ধার করেছে —এই নীতিগল্পটিও নানাদেশে খুব পরিচিত।